সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৮শ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

[বা]ঙ্গলা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

পুরাতন বাঙ্গলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক গ্রন্থ অত্যন্ত বিরল এবং যে কয়টি ঐতিহাসিক কাব্যের, অর্থাৎ ঐতিহাসিক ঘটনাবিষয়ক কবিতাকারে লিখিত গ্রন্থের নাম জানা যায়, তাহাদের নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ বাঙ্গলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসে নাই। স্থানীয় ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া আমরা কতিপয় গ্রন্থের বিবরণ যথাসম্ভব বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে সংগ্রহ করার চেষ্টা করিয়াছিলাম। বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়ের উপকরণ তন্মধ্যে পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া ঐ বিবরণের সারাংশ লিপিবদ্ধ হইল।

১। রাজমালা (ত্রিপুরার ইতিহাস)

বাঙ্গলা সাহিত্যের এই প্রাচীনতম ইতিহাস-গ্রন্থের উপর গত ১২৫ বৎসর ধরিয়া যত অত্যাচার সাধিত হইয়াছে, তাহার তুলনা হয় না। ফলে, মূল গ্রন্থটিকে বিলুপ্ত করার চেষ্টা প্রায় সফল হইয়াছিল। কিন্তু সত্যের বীজ কথনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না—প্রাচীন হস্তলিখিত রাজমালার একটি সম্পূর্ণ প্রতিলিপি আমাদের নিকট সুপ্রাপ্য এবং তাহা সম্যক্ পরীক্ষা করার সুযোগ পাওয়ায় আমরা 'রাজমালা' গ্রন্থটি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে পারিয়াছি। ইহার প্রথমাংশ ১৫ পাতায় সম্পূর্ণ। আরম্ভ যথা,

সরস্বতি দেবিপদ করিয়া বন্দন।
দ্বিতীয়ে শ্রীহরি বন্দি নন্দের নন্দন॥
তৃতীয়ে সঙ্কর বন্দি সহিতে বনিতা।
জগতের পতি শিব জগত বিধাতা॥
আর যত দেবদেবি আছে ত্রিভুবন।
অসেস প্রণাম মোর তান শ্রীচরণ॥
ভক্তিতে প্রণাম করি চন্দ্রের চরণে।
জাহার বংসের কিছু করিব রচনে॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য নাম ত্রিপুরচূড়ামণি।
দানধর্ম্মে শুচরিত্রে রাজসিরোমণি॥

* * *

সেই রাজা একদিন বসি সিংহাসনে।
আপনা বংসের কথা হইয়া গেল মনে॥

আপনার সভাসদ ব্রাহ্মণকুমার।
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিত্যাতে অপার॥
ইন্দ্রের সভাতে জেন বৃহস্পতি গণি।
নানা শাস্ত্র জানেন বিক্ষ্যাত চূড়ামণি॥
আর দুর্ল্লভেন্দ্র নাম চোন্তাই প্রধান।
রাজবংশকথাতে বড়ই সাবধান॥
চতুর্দ্দস দেবপূজা হইয়াছে পয়োধি।
তাহাতে ডুবিল রাজবংস কথা বিধি॥
সেই বিধিবর পাইয়া চোন্তাই বটে।
সে জেই কথা জানে অন্তেতে না ঘটে॥
চতুর্দ্দস দেবতা পুজাতে কথা আছে।
কুলক্রমে জানিআছে অসেস বিসেষে॥

শেষ যথা,

এহিরূপে মহারাজা শ্রীধর্ম্মমাণিক্য।
করিল জতে(ক) ধর্ম্ম কহিতে অসক্ষ॥
পুর্ব্বে জত লিখীছিল ত্রিপুরভাসাতে।
পয়ার করিল গাথা সকলে বুঝিতে॥
সভাসাতে ধর্ম্মরাজা রাজমালা কৈল।
পুর্ব্বপুরুষের নাম পুস্তকে লিখীল॥ (১৫।২)

এ স্থলে সরল সত্য কথাই লিখিত হইয়াছে যে, রাজমালার এই খণ্ডে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা "সাবধান" দুর্ল্লভেন্দ্র চোন্তাই সাগরসদৃশ চতুর্দ্দশ দেবপূজাবিধি হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; কারণ, তিনি কুলক্রমে সকল কথা জ্ঞাত ছিলেন। পরে যে প্রাচীন প্রমাণ-গ্রন্থের নামোল্লেখ আছে—রাজমালিকা, যোগিনীমালিকা, লক্ষণমালিকা ও হরগৌরীসম্বাদ—তাহা অধুনা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং কোনটাই ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নহে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, "হরগৌরীসম্বাদ" নামে একটি গ্রন্থের প্রতিলিপি অদ্যাপি কামরূপ অঞ্চলে পাওয়া যায়। *আমরা একটি প্রতিলিপি নবদ্বীপ পাঠাগারে দেখিয়াছি (পত্রসংখ্যা ৮০,* আধুনিক আসামী অক্ষরছাঁদে লিখিত)—দিগ্বিজয়প্রকাশ ও দেশাবলীবিবৃতির ন্যায় কল্পিত কথায় পরিপূর্ণ অতি তুচ্ছ ও নগণ্য গ্রন্থ। অথচ গভর্মেণ্ট ট্রাবিলিং পণ্ডিত তারকচন্দ্র চূড়ামণি ইহা মূল্যবান্ বোধে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দুই একটি আজগুবি কথা নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল। ভোজ নৃপতির সম্বন্ধে আছে:—

গ্রহাম্বররসে শাকে ম্লেচ্ছান্ জিত্বা বিনাস্ত্রতঃ।
ডিল্লীশনগরে স্বাম্যং করিষ্যতি স ভূপতিঃ॥
আসীৎ ত্রেতাযুগে কশ্চিৎ ডীল্লীশো নাম দৈত্যরাট্। ইত্যাদি (৬।২ পত্র)

দেশাবলীবিবৃতির স্থায় ইহাতে কল্যব্দের শূন্যান্ত স্থূল তারিখের উল্লেখ নাই—একেবারে সঠিক শকাব্দ—দিল্লীর ভোজরাজার তারিখ হইল ৬০৯ শকাব্দ (৬৮৭-৮ খ্রীঃ) !! এইরূপ শকাব্দের ছড়াছড়ি গ্রন্থমধ্যে রহিয়াছে। ভগদত্তের পুত্র ধর্ম্মপাল ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন—তিনিই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। নরকবংশীয় রাজাদের আদ্যাক্ষর-সূচি উদ্ধারযোগ্য—

জ-স-ন-শ-ভ-বা-তা-ম-ব-জ-হা-প-থ-দা-চ-লাঃ।
অ-মা-স-স্তো-ম-ভূ-গো-মাঃ স্ববংশে নরকান্বয়ে॥

ইহাদের মোট রাজত্বকাল ১০০৫ বৎসর (৮।২ পত্র)। এই খণ্ডেও 'কোটিলিঙ্গসমাকুল' 'শিবরাজ্য' ত্রিপুরার বিবরণ আছে (৪।১ প্রভৃতি)। এক স্থলে (৩৯ পত্রে) মোগল কর্ত্তৃক ত্রিপুরাবিজয়ের উল্লেখ আছে :—

যবনৈর্দ্দূয়মানা তু ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।
রাজশূন্যা ভবেদ্দেবি যাবৎ ত্রিবর্ষমাহবে॥
কস্যাপি তত্র ভূপস্য মরণাদিকমীক্ষতি।
তস্য পুত্রাশ্চ চত্বারো যবনৈরর্থিতে অপি। ইত্যাদি।

ইহা যশোমাণিক্যের (জন্মাব্দ ১৫০১ শক, অভিষেকমুদ্রা ১৫২২ শক) সময়ের ঘটনা। তাহার বহু পরে (ইংরাজ অধিকারের আরম্ভসময়ে) এই গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। রাজমালার উপজীব্য "হরগৌরীসম্বাদ" এই গ্রন্থ অবশ্যই নহে—কিন্তু ইহারই পূর্ব্বপুরুষ বটে! রাজমালায় লিখিত আছে যে, ধর্ম্মমাণিক্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন :

ত্রিলোচন নামে রাজা ত্রিপুরের কুলে।
হবেনি তেমত রাজা দেখ সাস্ত্রবলে॥
বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর দুই দ্বিজবর।
রাজাকথা যুনি তারা দিলেক উত্তর॥
জে বলিলা নৃপমণি কহি সাস্ত্রবলে।
এক মহারাজা হবে ত্রিপুরার কুলে॥
হরগৌরীসংবাদেত কহিছে সঙ্করে।
রাজমালিকাতে আছে যুন নৃপবরে॥
ই বলিয়া দুই দ্বিজে পুস্তক আনিল।
হরগৌরীসম্বাদেত প্রমাণ জানাইল॥ (১৫।১ পত্র)

আমরা অন্য পুথি হইতে এই অতিবিস্ময়কর প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অথ শ্লোকঃ। ঈশ্বর উবাচ :—

বর্ষান্তে তু গতে ভূপে ক্রোধস্যাব্দো ভবিষ্যতি।
সসাধ্যগ্রহযুগ্মাব্দং ততোঽসৌ ন ভবিষ্যতি।

রাজবংশের আদিপুরুষ ত্রিলোচন শিবের বরে "তিন চক্ষু" (৪।১ পত্রে) হইয়া জন্মিয়াছিলেন। শ্লোকানুসারে অতিরিক্ত চক্ষুটি (ক্রোধস্থাক্ষঃ) পুরুষানুক্রমে "বর্ম্মান্ত" রাজা পর্য্যন্ত ২৯১৩ বৎসর ধরিয়া (অঙ্কস্য বামা গতিঃ হইলে, নতুবা ১৩৯২ বৎসর হয়) থাকিবে, পরে লোপ পাইবে। কল্যাণমাণিক্যের পুত্র গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে ১৫৯১ শকে রাজমালার দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধনকালে কোন মোসাহেব শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিলেন, 'ক্রোধস্থাক্ষঃ' অর্থ কল্যাণ-মাণিক্য এবং ধর্ম্মমাণিক্যের সভায় শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বরের মুখ হইতে ভবিষ্যদুক্তিরূপে ঐ ব্যাখ্যা প্রচার করাইলেন। শ্লোকটির অশুদ্ধ পাঠ নানারূপ পাওয়া যায় 'সর্ম্মান্তান্তে···ক্রোধিসাক্ষো' প্রভৃতি। বোধ হয় এইরূপ কোন অশুদ্ধ পাঠ অথবা স্বকপোলকল্পিত বিশুদ্ধি (ধর্ম্মাখ্যে তু) অবলম্বন করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক কৈলাসচন্দ্র সিংহ (১২৫৮-১৩২১ সাল) ব্যাখ্যা করিলেন, শ্লোকটিতে ধর্ম্মমাণিক্যের অভিষেকশকাঙ্ক ১৩২৯ (?) লিপিবদ্ধ আছে (রাজমালা, ১৩০৩ সনে মুদ্রিত, পৃ. ৩৮ ; ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, ১৮৭৬ খ্রী. পৃ. ১৩)। তাহাই বিনা বিচারে প্রায় সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। রাজমালায় ধর্ম্মমাণিক্যপ্রদত্ত অধুনালুপ্ত এক তাম্রপট্টের মূল পাঠ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, তাহার কালনির্দ্দেশটি ১৩৮০ শক মেষসংক্রান্তি, শুক্লা ত্রয়োদশী. সোম বার—অভ্রান্ত সত্য ; গণনায় পাওয়া যায় ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ মার্চ চৈত্রসংক্রান্তি দিন বস্তুতই শুক্লা ত্রয়োদশী ও সোম বার ছিল। এইরূপ গণনাশুদ্ধ অভ্রান্ত বস্তু কৃত্রিমরচনাকারীর লেখনী হইতে কখনও বাহির হয় না। মূল রাজমালা ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরে ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের অর্থাৎ পরবর্ত্তী রাজা ধন্যমাণিক্যের অভিষেকশকাঙ্কের কিছু কাল পূর্ব্বে ১৪৭০-৮০ খ্রী মধ্যে রচিত হইয়াছিল। সুতরাং রাজমালা বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিম যুগের একটি মূল্যবান্ গ্রন্থ। আমরা বাহুল্য-বোধে "ত্রিপুর-বংশাবলী" প্রভৃতি অত্যন্ত অপ্রামাণিক গ্রন্থের লেখা এবং তদনুযায়ী অভিমত (শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, পৃ. ৮১-৮২) খণ্ডন করিলাম না। এই গ্রন্থের প্রাচীন রূপ বর্ত্তমানে আবিষ্কৃত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই—কালে কালে সংযোজিত পরবর্ত্তী অংশের সহিত একসঙ্গে ইহা গ্রথিত হইয়া আছে এবং তাহার মূল ভাষার উপর হস্তক্ষেপ হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভাগদ্বয়ের সারাংশ আমরা প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ করিয়াছি (প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৪, পৃ. ৪৯৫-৬)।

১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে (অর্থাৎ ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে) মহারাজ কাশীচন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৬-৩০ খ্রী) দুর্গামণি উজীর সমগ্র রাজমালা সংশোধন করিয়া প্রাচীন রাজমালার অন্ত্যেষ্টিবিধান করেন। কারণ দুর্গামণির ভাষায়ই লিখিত হইল :—

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত,
প্রসঙ্গেতে অলঙ্ঘিক ভাষা যে কুৎসিৎ।
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পরে পর পূর্ব্বে কত,
সেইত কারণে লোকে নাহি বুঝে যত।

ত্রিপুরা রাজ্যের নাম ত্রিপুর যেমতে,
ত্রিপুর রাজার প্রমাণ না লিখিছে তাতে।
বার শ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি,
তাহাকে সুধিল পুনি উজীর দুর্গামণি।
মহাভারতাদি তন্ত্র করি অন্বেষণ,
প্রমাণ লিখিল তার বেদনিরূপণ।
এহাতে দ্বিরুক্তি যদি কাহার জন্ময়,
পুরাণাদি দর্শিলে যে ঘুচিবে সংশয়।
(রাজমালা, অপ্রকাশিত মুদ্রিত সংস্করণ, পৃ. ২৭১)

অর্থাৎ মহাভারতের সভাপর্ব্ব ও ভীষ্মপর্ব্বের শ্লোকে 'ত্রিপুর' ও 'ত্রৈপুর' শব্দের উল্লেখ এবং পীঠমালাতন্ত্রের বচন সংযোজন করিয়া বংশের আভিজাত্য কৃত্রিম উপায়ে বর্দ্ধিত করা হইল। আর, 'দ্রুহ্যবংশে দৈত্যরাজা' কথাটা যোজনা করিয়া দ্রুহ্যুও আদিপুরুষরূপে কল্পিত হইল। তদ্ব্যতীত গ্রন্থমধ্যেও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্গামণি দুইটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কাশীচন্দ্রমাণিক্য পর্য্যন্ত ত্রিপুররাজবংশ শূদ্রাচারে মাসাশৌচ পালন করিতেন, গোত্র বলা হইত "কাশ্যপ"। কৃষ্ণকিশোরমাণিক্যের সময়ে (১৮৩০-৪৯ খ্রী.) ক্ষত্রিয়াচার প্রবর্ত্তিত হয় এবং গোত্র বলা হয় "বৈয়াঘ্রপদ্য"। দুর্গামণি মাসাশৌচ বিধানের কথা প্রাচীন রাজমালা অবলম্বন করিয়া প্রথমতঃ গোপন করেন নাই :—

বর্ণসঙ্কর হইলেক রাজা ত্রিলোচন,
কলিযুগে ক্ষত্রি জাতি না রবে কারণ।
বেদ বেদান্ত তন্ত্রে দ্বিজে বিধি দিল,
তদবধি মাসাশৌচ ত্রিলোচনের হৈল ॥ (ঐ, দক্ষিণ খণ্ড, পৃ. ৩১)

প্রাচীন রাজমালার পাঠ যথা,

বর্ণসংক(র) বলিয়া রাজা ত্রিলোচন।
কলিতে ক্ষত্রিয় জাতি না রবে কারণ ॥
বেদবেদাঙ্গ জানে দ্বিজে বিধি দিল।
সেই হতে এক মাষ অযুচ আচরিল ॥ (৯।১ পত্র)

কিন্তু পরে এই দুইটি পয়ার তুলিয়া দেওয়া হয় (ঐ, প্রথম লহর, পৃ. ৩৪)। দ্বিতীয়তঃ, দ্রুহ্যু হইতে দৈত্য পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের নাম দুর্গামণি পান নাই। সংস্কৃত রাজমালা গ্রন্থের সংশোধনকালে ১৮১০ শকাব্দে (১৮৮৮ খ্রীঃ) পুরাণ হইতে অধস্তন ১০ পুরুষের নাম (শতধর্ম্মা পর্য্যন্ত) সংযোজিত হয় (সংস্কৃত রাজমালার আধুনিক প্রতিলিপি, পৃ. ৮-৯)। ১৮৮২ খ্রীঃ ত্রিপুরার বিখ্যাত সামাজিক আন্দোলনের পর এদিকে রাজবংশের দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল বুঝা যায়। ১৩০৫ ত্রিপুরাব্দে (১৮৯৫ খ্রীঃ) "রাজরত্নাকর" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পূর্ব্ববিভাগ (১২-সর্গাত্মক ১২৭ পৃ.—দ্রুহ্যু হইতে প্রতর্দ্দন পর্য্যন্ত ২৬ পুরুষের বিবরণ)

ত্রিপুররাজধানী হইতে মুদ্রিত হয়। প্রচার করা হয়, ইহাই শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বররচিত মূল গ্রন্থ :—

"শুক্রবাণেশ্বরৌ তচ্চ তনুতাং দেবভাষয়া।" (১।২৫ শ্লোক)

এইরূপ কৃত্রিম রচনার উদাহরণ বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যে দ্বিতীয়টি আর পাওয়া যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে যে পণ্ডিত দ্বারা এই গ্রন্থ ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে রচনা করান হইয়াছিল, তাঁহার নাম অনেকের নিকট অজ্ঞাত নহে। সৌভাগ্যের বিষয়, মূল রাজমালার ঘটনাংশ এই গ্রন্থ দ্বারা ব্যাহত হয় নাই।

রাজমালার পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির পরিচয় অতি সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল। "দুর্জ্জয়খণ্ড" নামক দ্বিতীয় খণ্ড অমরমাণিক্যের সময়ে (১৪৯৯-১৫০৮ শকাব্দ) রচিত হইয়াছিল। যথা,

অমরমাণিক্য নাম নৃপতি আছিল।
ত্রিপুরবংশের কথা তৎপর যুনিল॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য ছিল ত্রিপুরসন্ততি।
রাজবংস বিস্তারিছে রাজমালা পুথী॥
পুস্তক লিখাইছে তেনি পুর্ব্বরাজার কথা।
তান পরে রাজা সব না হইছে গাঁথ'॥
অমরমাণিক্য রাজা স্থির করি মন।
জিজ্ঞাসা উচিত রণচতুরনারায়ণ॥
এক সত পঞ্চ বর্ষ বয়স ওহার।
স্থিরমতি গুণবন্ত ধর্ম্মতা অপার॥
শুন২ বলি রণচতুরনারায়ণ।
রাজবংসকথা কিছু কহত আপন॥
বয়সে বিসিষ্ট বট ত্রিপুরসন্ততি।
তোমি জান ভাল পুর্ব্বরাজাগণ নিতি॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্যপরে জত রাজা হৈল।
জে রূপে সে রাজা সবে প্রজাকে পালিল॥
কোন রাজা কিবা কর্ম্ম করিল তখন।
কহত সে শব কথা যুনিব অখন॥
নৃপতির বচনে কহন্ত সেনাপতি।
পুর্ব্বের প্রসঙ্গ বলি যুন মহামতি॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্যাবধি জত রাজা হৈল।
অনুক্রমে সেনাপতি সকল কহিল॥ (১৫-১৬ পত্র)

দুর্গামণি এই মূল্যবান্ বিবরণ ৪ পয়ারে সংক্ষিপ্ত করিয়া এ স্থলে রাজমালার সংশোধনকার্য্য করিয়াছেন (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ৮৫ ; দ্বিতীয় লহর, পৃ. ১)। গ্রন্থমধ্যেও বহুল

পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহার কষ্টসাধ্য বিশ্লেষণ ব্যতীত প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে না। প্রাচীন রাজমালার এই খণ্ড উদয়মাণিক্যের বিবরণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। গ্রন্থশেষ যথা,

এত জদি রণচতুরনারায়ণে কৈল।
অমরমাণিক্য রাজা সন্তোস হইল॥
পুর্ব্ব২ নৃপতির যুনিলেক কথা।
"দত্যখণ্ড" পুথি তবে করিলেক গাঁথা॥
"দুর্য্যখণ্ড" বলিয়া পুস্তক নাম রাখে।
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হতে রাজা তাতে লিখে॥
সেই পুস্তক পরে গোবিন্দদেবে পাইল।
তাহার পরে রাজা পুস্তক গাঁথিল॥
ইতি দুর্য্যখণ্ড সমাপ্ত॥ (৩৩।১ পত্র)

এই মূল্যবান্ নির্দ্দেশের দুইটি প্রধান কথা দুর্গামণি বাদ দিয়াছেন—এই খণ্ডের নাম "দুর্জ্জয়খণ্ড" এবং গোবিন্দমাণিক্যকর্তৃক গ্রন্থপ্রাপ্তি।

তৃতীয় খণ্ডের নাম "উত্তর দুর্জ্জয়খণ্ড"। যথা,

ইতি উত্তরদুর্য্যখণ্ডে কল্যাণমাণিক্য স্বর্গারোহণ (৫৬।১ পত্র)

ইহা গোবিন্দমাণিক্যের সময় লিখিত হইয়াছিল। যথা,

গোবিন্দমাণিক্য রাজা বড় পুণ্যবান।
পুর্ব্ব২ রাজা সবের যুনিয়া বাখান॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য রাজা পুর্ব্বে জিজ্ঞাসিল।
দুল্লভেন্দ্র চন্তাই তাহাতে কহিল॥
তার পরে অমরমাণিক্যে জিজ্ঞাসিল।
রণচতুরনারায়ণে তাহাতে কহিল॥
পুর্ব্বরাজাগুণগানে পুস্তক লিখীল।
অমরমাণিক্য হতে রাজা না লিখীল॥
তার পরে জে জে রাজা হইল ত্রিপুরে।
কেবা কোন কর্ম্ম কৈল কহ "মন্ত্রিবরে"॥ (৩৩।২ পত্র)

এ স্থলে মন্ত্রিবরের নাম লিখিত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, দুর্গামণির মতে এই খণ্ড রামমাণিক্যের সময়ে "দ্বারপণ্ডিত" সিদ্ধান্তবাগীশকর্তৃক রচিত হইয়াছিল (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ১৭৭ ও ২৭০)। ইহা সম্ভবপর বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তুলাপুরুষ দান উপলক্ষ্যে কল্যাণমাণিক্য উক্ত সিদ্ধান্তবাগীশকে প্রচুর দানাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়াছিলেন। যথা,

ভট্টাচার্য্য সিদ্ধান্তবাগীষ মহামতি।
বহুল সম্মান তানে করিল নৃপতি॥

সোনার কুণ্ডল আদি জত অভরণ।
নরপতি তারে দিয়া করিল ভুসন ॥
এক হস্তি দিল তানে যুসর্ষ্য করিয়া
মেহেরকুলেত গ্রাম দিল উৎসর্গিত ॥ (৫৩।২ পত্র)

এই বর্ণনা সিদ্ধান্তবাগীশের স্বরচিত হওয়া সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রাচান রাজমালার ১১৭৫ ত্রিপুরাব্দে লিখিত একটি প্রতিলিপির আধুনিক অনুলিপি আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম। তাহাতে স্পষ্ট লিখিত আছে,

শ্রীশ্রীযুত গোবিন্দমাণিক্য নরপতি।
দৈবযোগে আপনে পাইলো সেই পুথি ॥
শ্রীধর্ম্মমাণিক্য হনে যত রাজা হৈল।
দৈত্যখণ্ড পুস্তকেত নাম গাথা হৈল ॥
শ্লোক ॥ ১৫৯১ ॥
একাধিকনবত্যব্দে শাকে পঞ্চদশে তথা।
শ্রীশ্রীযুতগোবিন্দদেবেন লিখ্যয়াস (?) যত্নতঃ ॥

রাজমালার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ত্রিপুরার ইতিহাসের সুবর্ণযুগের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে তাহা গবেষিত ও লিখিত হয় নাই।

রাজমালার চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিক্যের অনুরোধে জয়দেব উজীর লিখাইয়াছিলেন। যথা,

কৃষ্ণমাণিক্য রাজা ধর্ম্মপরায়ণ।
একদিন বসিআছে লইয়া পাত্রগণ ॥
পুনরুক্তি উজিরেত জিজ্ঞাসে রাজন।
রাজমালা প্রস্তাব হইল স্মরণ ॥
উজিরে কহেন রাজা করি নিবেদন।
গোবিন্দমাণিক্য ছিল ধর্ম্মপরায়ণ ॥
জয়ধ্যা বিবরণ পুর্ব্বের লিখন।
তার পরে লিখাইব সার বিবরণ ॥
বৃর্দ্ধেত আছয়ে জে বিশ্বাসনারায়ণ।
বিদ্বান হএ জানে আইদ্দ বিবরণ ॥
রাজআজ্ঞা হইলেক ডাকে মন্ত্রিবর।
গোবিন্দমাণিক্য লিখ সার আবান্তর ॥ (৫৭ পত্র)

বিশ্বাসনারায়ণলিখিত এই খণ্ডে জয়মাণিক্য পর্য্যন্ত রাজাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে (৬৫।২ পত্রে গ্রন্থ শেষ)। দুর্গামণির গ্রন্থে কিন্তু বিশ্বাসনারায়ণের নাম নাই। বহু পরবর্ত্তী রাজা রামগঙ্গামাণিক্যের সময়ে বৃদ্ধ জয়দেব উজীরের আদেশে জয়দেবের পুত্র স্বয়ং দুর্গামণি গোবিন্দমাণিক্যাবধি পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাহাই ক্রমশঃ পরবর্ত্তী রাজার

বৃত্তান্ত সহযোগে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে (রাজমালা, অপ্রকাশিত সং, পৃ. ২৭২-৩, ৩২৯, ৩৪২, ৪০৭)। রাজমালার যে মূল্যবান্ প্রতিলিপির সাহায্যে এই বিবরণ লিখিত হইল, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ২২৫৯ সংখ্যক বাঙ্গলা পুথি।

২। কৃষ্ণমালা

রাজা কৃষ্ণমাণিক্যের অতিবিস্তৃত জীবনকাহিনী। দুর্গামণির রাজমালায় লিখিত আছে :—

উজীর বলে বিজয়মাণিক্য অভ্যন্তরে।
কৃষ্ণমাণিক্য মহারাজা হৈল তার পরে॥
তান কীর্ত্তি রাজধরমাণিক্য আদেশে।
জয়ন্ত চন্তাই পূর্ব্বে বলিছে বিশেষে॥
কৃষ্ণমালা নাম পুস্তক বিস্তার কাহিনী।
রামগঙ্গা বিশারদ রচিল তখনি॥
রাজমালা মধ্যাবৃত কৃষ্ণমালা হয়।
বিস্তার দেখিয়া লোক শুনিতে সংশয়॥ (পৃ. ৩২৯)

স্বর্গত কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়ের সৌজন্যে এই বৃহৎ গ্রন্থের একটি আধুনিক প্রতিলিপি পরীক্ষা করিতে পারিয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। বাঙ্গলার ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা তমসাচ্ছন্ন যুগের একজন সাক্ষাদ্দর্শীর উৎকৃষ্ট বিবরণ এই গ্রন্থমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ কৃষ্ণমণির রোমাঞ্চকর ভ্রমণকাহিনী এবং অন্যান্য বহু ঘটনার অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ইহাতে পাওয়া যায়, যাহা অন্যত্র পাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। ত্রিপুরার পূর্ব্বতন রাজতন্ত্র সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যে দুর্গামণিসংশোধিত রাজমালার অসমাপ্ত সংস্করণ করিয়াছেন, অল্প ব্যয়ে কৃষ্ণমালার মূল মাত্র মুদ্রিত করিয়া তাঁহারা ধন্য হইতে পারিতেন। বাঙ্গালার একটি জাতীয় সম্পদ্রূপে গ্রন্থটি রক্ষিত এবং মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। ১৭০৭ শকাব্দ হইতে ১৭২৪ শকাব্দের মধ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। আমরা একটি মাত্র অনুচ্ছেদ নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছি। চাটিগ্রামের প্রথম ইংরাজ শাসক ছিলেন বিখ্যাত Harry Verelst সাহেব (১৭৬১-৬৪ খ্রী.)। তাঁহার কাছাড় অভিযান অদ্যাপি রহস্যাবৃত রহিয়াছে। তৎসম্বন্ধে কৃষ্ণমালার বর্ণনা (পৃ.৩৮৫-৯২) এই :—

তার পরে নরপতি আসিল কসবায়। পুরীতে রহিল আসি উপর কিল্লায়॥
হেম কালে সৈন্য সমে চাটিগ্রাম হতে। "হাড়ি বিলিস" সাহেব আসিল কসবাতে॥
ব্রহ্মার দেশেতে গিয়া করিতে বিজয়। শক্ত হইয়া চলিছিল লইয়া সৈন্যচয়॥
"মুল টিন্" সাহেব আসিল কাপ্তান্। লপ্টিন্ "ইষ্টবিল" সহিতে তাহান॥
আটজন ইংরাজ এসব প্রভৃতি। কসবায় আসিল যথায় নরপতি॥

"গকুল ঘোষাল" সাহেবের দেওয়ান। তাসবার সঙ্গে ছিল ব্রাহ্মণপ্রধান ॥
কতগুলি ঘোরা আর কতেক সিপাই। চলিছে সাহেব সঙ্গে লেখা যোখা নাই ॥
হাড়ি বিলিস সাহেব এসব সঙ্গে করি। উপস্থিত হইল যদি কসবা নগরী ॥
রাজা আসি সাহেবের সহিতে মিলিল। নৃপতিকে দেখিয়া সাহেব সম্ভাষিল ॥
ইষ্টালাপ পরস্পরে ছিল বহুতর। তার পরে গেল রাজা আপনার ঘর ॥
আনাইয়া ভক্ষণ সামগ্রী বহুতর। সাহেব নিকটে পাঠাইল নৃপবর ॥
দোলযাত্রা উপস্থিত হইল তখন। করিলেক নৃপতি তাহার আয়োজন ॥
বিধিমত দোলযাত্রা করি সমাপন। পাঠাইল সাহেব নিকটে নিমন্ত্রণ ॥
ইংরাজ সকলে পাইয়া নিমন্ত্রণ। রাজপুরে গেল হুলি খেলার কারণ ॥
সভাতে বসিল গিয়া রাজার বিদিত। আতর গোলাপগন্ধে সভা আমোদিত ॥
সুগন্ধি আবিরচূর্ণ আনি ভারে ভার। পুঞ্জ পুঞ্জ করি রাখে সভার মাঝার ॥
পাত্রগণ সহিতে বসিল মহারাজ। হাড়ী বিলিস সাহেব প্রভৃতি ইংরাজ ॥

... ...

এই মতে হুলিখেলা যত নির্ব্বাহিল। নরপতিপাষে তবে সাহেবএ কহিল ॥
ব্রহ্মার দেশেতে আমি করিব গমন। লইব যে সেই রাজ্য করিয়া দমন ॥
আমার সহিতে যদি চলহ আপনে। অবশ্য জিনিব রণে লয় মোর মনে ॥
অতএব মোর সঙ্গে চল নরপতি। শুনিয়া নৃপতি কহে সাহেবের প্রতি ॥
রাজ্যকার্য্য ছাড়ি আমি না পারি যাইতে। মুখ্য এক পাত্র দিব তোমার সহিতে ॥

... ...

আমার দক্ষিণ বাহু জয়দেব রায়। তাহাকে সহিতে নেও দিলাম তোমায় ॥
ভাল বলি তুষ্ট হৈয়া কহিল সাহেবে। তা সবের সহিতে চলিল জয়দেবে ॥
তান সঙ্গে চলে লুচিদর্পনারায়ণ। প্রণমিয়া নৃপতিকে চলে দুই জন ॥
ফাল্গুনের আটাইশ দিনে তথা হতে। চলিলেক দুই জন সাহেব সহিতে ॥
হিড়িম্ব দেশেতে গিয়া উপস্থিত হইল। শুনি রাজা রাজ্য ছাড়ি পলাইয়া গেল ॥
খাস্পুরে নিজপুরী আপনী পুড়িয়া। পরিবার সমে বনে গেলেন ছাড়িয়া ॥
হাড়ী বিলিস সাহেব রহিল সেই দেশে। জয়দেব ঠাকুর রহিল তান পাশে ॥

কসবানগরে রাজার সহিত বাঙলার ভাবী শাসনকর্ত্তা Harry Verelst হুলি খেলিয়াছিলেন, ইহা একটী কৌতুকজনক ঘটনা বটে। দুর্গামণির রাজমালায় (পৃ. ৩৩৫) ৩ পয়ারে এই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। সমকালীন বহু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। মির কাসীমের দেওয়ান বৃন্দাবনকর্তৃক ঢাকা সহর লুট (পৃ. ৩৯৪), সমসের ডাকাইত কর্তৃক রাজ্যলাভ, হিড়িম্বাবিজয় প্রভৃতি! কৃষ্ণমাণিক্যের নিজের বিবরণ অতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং তন্মধ্যে স্থানীয় ইতিহাসের বহু উপকরণ পুঞ্জীভূত হইয়া আছে।

৩। গাজিনামা বা সমসের গাজির গান

সেখ মনোহর-রচিত এই গ্রাম্য গীতিকা অধুনা অপ্রসিদ্ধ নহে। যে জীবনকাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, বাঙ্গলার ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। সমসের গাজি অতি নিঃস্ব প্রজার ঘর হইতে গ্রাম্য কবির ভাষায় "ভাটী বাঙ্গলার ছানি নবাব" হইয়াছিলেন; তাহার চমকপ্রদ ইতিহাস রবিন হুডের গল্পের মত চিত্তাকর্ষক ও আশ্চর্য্যজনক। কিন্তু এ যাবৎ তাহা যথোচিত সংগৃহীত ও আলোচিত হয় নাই। কৈলাসচন্দ্র সিংহ-রচিত রাজমালা গ্রন্থে (পৃ. ১১৯-২৭) গাজিনামা অবলম্বন করিয়া যে বিবরণী প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের অন্যান্য অংশের ন্যায় তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ ও প্রমাদবহুল। ১৩২০ সনে নোয়াখালীর সিরিস্তাদার মৌলবী লোতফল খবির সাহেব সেখ মনোহরের গান মুদ্রিত করিয়াছিলেন এবং তদবলম্বনে ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন Folk Literature of Bengal (1920) গ্রন্থে (পৃ.১৩৬-৫০) ও বৃহদ্বঙ্গ গ্রন্থে (পৃ. ১০৩৮-৪২) নাতিদীর্ঘ বিবরণী দিয়াছেন। যথোচিত যত্ন ও সাবধানতা অবলম্বিত না হওয়ায় এই সকল লেখা ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে। মুদ্রিত সংস্করণে মূল গ্রন্থের অনেক অংশ পরিত্যক্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশেষতঃ গ্রন্থকারের বহুতর ভণিতার মধ্যে মাত্র একটী মুদ্রিত হওয়ায় (পৃ. ৮০) এবং গ্রাম্য কবির কুলপরিচয় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের কালনির্ণয় ও প্রামাণিকতা বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ কৈলাসচন্দ্র সিংহের সংগৃহীত পুথির আদ্যন্ত খণ্ডিত অংশ (পৃ. ১৮-১৫৪) আমাদের হস্তগত হওয়ায় এই সকল ভ্রমপ্রমাদ এখন সংশোধন করা সম্ভব। সমসের গাজি ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৭৪৬-৫৮ খ্রী.) এবং শেষ ৫ বৎসর (১৭৫ -৫৮) বিদ্রোহীরূপে রাজ্যের অংশবিশেষ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের বহু প্রামাণিক বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়াছি—তাহা এ প্রবন্ধের বিষয় নহে। গ্রাম্য কবি সেখ মনোহরের কিঞ্চিৎ বিবরণ মাত্র এ স্থলে প্রকাশ করিতেছি। এক স্থলে (পৃ. ১৩১-৩৩) তিনি বিস্তৃতভাবে "নিজ করছি বিবরণ" অর্থাৎ উর্দ্ধতন বংশাবলী লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে জানা যায়, তাঁহার উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ "মাহাম্মদ নাছির" ভুলুয়ার তালুকদার ছিলেন। তাঁহার পৌত্র "সেক গাজি"—

ছাড়িয়া ভুলুয়া দেস "দক্ষিণ সিকে" প্রবেস,
স্থান কল্য "পাদুয়া" মকাম।

এই দক্ষিণশিক পরগণাই সমসেরের জন্মস্থান ও লীলাভূমি। সেক গাজির কনিষ্ঠ পুত্র "সাদক মাহাম্মদ"ই কবির পিতামহ। কবির মাতামহকুল,

"হুগলির বন্দর" ছাড়ি, দক্ষিণসীকে কল্য বাড়ি,
নিবাসি উত্তর পাদুয়াতে। (পৃ. ১৩২)

কবির প্রমাতামহ "তাহির উকিল" সমসের গাজির প্রতিনিধিরূপে

মরসুদাবাদেত রঙ্গে, ডোমন দেওান সঙ্গে,
নওাবেরে বুজায়েন্ত দায়। (ঐ)

বহুতর ভণিতায় কবি তাঁহার তিন জন গুরুর বন্দনা করিয়াছেন :—

ছৈয়দ মেহেন্দি পির, ছৈয়দ হাচন ধির,
মহাম্মদ সরিফ পদে। (পৃ. ১৫৪)

এক স্থলে কবি লিখিয়াছেন, তিনি নিজ পিতামহের নিকট শুনিয়া গ্রন্থের উপকরণরাজি সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—

কহে সেক মনুহরে পাঞ্চালি রচিয়া।
পীতামোহমুখে বাক্য সকল শুনিয়া॥ (পৃ. ৮৩)

সমসের গাজি নানা স্থানে যে সকল "কারক" (কর্ম্মচারী) নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে একজন সেক মনুহরও ছিল :—

সেক মনুহরে করে মেহারকুল কাম (পৃ. ১০৩)

তিনি বর্ত্তমান গ্রাম্য কবি নহেন—তাঁহাকে অভিন্ন ধরিয়া কেহ কেহ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কবির প্রমাতামহ ও পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাছির মাহাম্মদ সমসের গাজির অনুগ্রহভাজন ছিলেন। সুতরাং তাঁহার গীতিকা অনুমান ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়া থাকিবে, তৎপূর্ব্বে নহে। অর্থাৎ সমসেরের শোচনীয় মৃত্যুর প্রায় ৬০ বৎসর পরে ইহা রচিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সঙ্কলন করা অতীব দুরূহ। পল্লীকবির জ্ঞানের পরিসর অতি ক্ষুদ্র ছিল। "জগৎচন্দ্র" ও কৃষ্ণমাণিক্য ব্যতীত অন্য কোন ত্রিপুররাজের নাম তাঁহার জানা ছিল না। সমসেরের জন্মের বহু পূর্ব্বে দক্ষিণশিক পরগণার এক দরিদ্র ব্যক্তি "ইমন সাহেদা" দৈবক্রমে মাটি খুঁড়িতে গিয়া পর্ব্বতক্রোড়ে "সোনার সেওরা পায় মোতি ডোরে ডোরে" এবং এই মুক্তাখচিত শেখর মহারাজা "জগৎচন্দ্র"কে উপহার দিয়া পরগণার জমিদারী লাভ করে। বস্তুতঃ তৎকালীন ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন রত্নমাণিক্য (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী.) কিম্বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী রামমাণিক্য (১৬৭৩-৮৫ খ্রী.)। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে গ্রন্থটি এইরূপ ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহাতে পারিবারিক এবং স্থানীয় যে সকল ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা রহিয়াছে, তাহার মূল্য উপেক্ষণীয় নহে। পল্লীকবির রচনার নিদর্শনস্বরূপ সমসের-নির্ম্মিত 'মুতিঘরে'র (মুক্তাগারের) বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

একাবলি ছন্দ

এক তোলা ঘরসোভা। মুনীগণ মোনলোভা॥
জেহেন অমরাপুরি। সভানের মোনহারি॥
দেখীতে নিয়াছন্দা। জেন সত চন্দ্র বান্দা॥
ঝলকে তারকগণ। চারি পাসে অভরণ॥
সেইসে ঘরের ঝরা। গুতিত মুতির ছরা॥
জেহেন চামর দোলে। সুবর্ণ মুতির জলে॥
বিন্দু বিন্দু বারি মোহে। গ্রীষ্ম উষ্ম নাহি রহে॥
আনন্দে পুলকে চিত। কামের সবাবে নিত॥

সুগন্ধি চামর তায়। নিতি ভৎসে কামরায়॥
সুকের সাগরে মনা। নিতি প্রতি করে থানা॥
আনন্দ সানন্দ মন। জেন শ্রীবৃন্দাবন॥
রাধিকার কোরে কানু। জেন বৈসে জোগভানু॥ (পৃ. ১০৭)

৪। চম্পকবিজয়

১৩৪০ সনে এই গ্রন্থের একটী আধুনিক প্রতিলিপি ত্রিপুররাজধানী আগরতলার রাজগ্রন্থাগারে রক্ষিত মূল্যবান্ গ্রন্থরাজির মধ্যে পাইয়া আমরা পাঠ করিয়া দেখিয়াছি। এই গ্রন্থের বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রচনা 'রাজমালা' কিম্বা 'কৃষ্ণমালা'কেও নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ দ্বিতীয় রত্নমাণিক্যের (১৬৮৫-১৭১০ খ্রী.) রাজত্বের প্রথম দশ বৎসরের ঘটনাবলী ইহাতে যথাযথ বিবৃত হইয়াছে—কবিজনসুলভ অত্যুক্তি কিম্বা অতিরঞ্জন একান্তভাবে বর্জ্জিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রধান ঘটনা হইল রাজা নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ ও রত্নমাণিক্যের সাময়িক রাজ্যচ্যুতি (১৬৯৩-৯৪ খ্রী.)। যে সকল প্রধান সেনাপতি ও রাজপুরুষের সাহায্যে রত্নমাণিক্য রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন "শ্রীমির খাঁ গাজি" এবং তাঁহার একজন পারিষদ "সেখ মহদ্দি" তাঁহারই আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দুইটী ভণিতা উদ্ধৃত হইল :—

হীন মহদ্দিয়ে কহে মিরখাঁ আদেশে।
সমসের ভারত পুথি রচিনু বিশেষে॥ (পৃ. ১২)
শ্রীযুত মিরখাঁ প্রতাপে ভাস্কর।
কহে হীন মহদ্দিয়ে তান আজ্ঞাপর॥ (পৃ. ৬১)

এই গ্রন্থ রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল। যথা,

শ্রীরত্নমাণিক্য রাজা গুণে অনুপাম।
তান পদতলে করি সহস্র প্রণাম॥ (পৃ. ৬)

সুতরাং ইহা একখানি অপূর্ব্ব সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাব্য। যে কারণে এই গ্রন্থের নাম "চম্পকবিজয়" রাখা হইয়াছে, তাহার রহস্য উদ্ঘাটন করা আবশ্যক। এই গ্রন্থানুসারে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে শিশু রত্নদেবকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার মাতুল বলিভীমনারায়ণ "যুবরাজ" হইলেন। রত্নদেবের বয়স্ক (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতা অমরসিংহ, শক্রসিংহনারায়ণ প্রভৃতিকে বলিভীম পূর্ব্বেই হত্যা করিয়াছিলেন। অত্যাচারী বলিভীমের অধিকারকালে রাজবংশীয়গণ পলায়নপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তন্মধ্যে প্রধান ছিলেন রত্নদেবের পিতৃব্য জগন্নাথ-পুত্র "চম্পকরায়"—সে কালে চম্পকরায় আছিল লুকাই। (পৃ. ২০)

গ্রন্থের প্রথম ভাগে বলিভীমের পতন পর্য্যন্ত বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে—"ইতি চম্পকবিজয়ে বলিভীমনারায়ণ বন্দি :" (পৃ. ৬৩)। ঢাকা হইতে—

শাস্তা খাঁ নবাব যদি তৈগির হইল।
খান বাহাদুর তবে বাঙ্গালাতে আইল॥
সর্ব্বদেশের জমিদার আসিয়া মিলিল।
ত্রিপুরনৃপতি তবে গরহাজির হৈল॥ (পৃ. ২৩)

'পঞ্চশত অশ্ববার সংহতি করিয়া' লালা কেশবদাস নামক সেনাপতি ত্রিপুরা আক্রমণ করে এবং বলিভীমের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া অবশেষে "সংরাইসের গড়" হইতে তিনি ধৃত হন —"মত্ত গজে ধরি যেন সিংহ লইয়া যায়" (পৃ. ৫৯)।

বলিভীম চলি গেল সাহা বিদ্যমান।
অপরাধি জানিয়া হৈল মুসলমান॥ (পৃ. ৬২)

দ্বিতীয় ভাগে রত্নমাণিক্যের রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ার বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বলিভীমের নিষ্কাসনের পর, "জগন্নাথের বংশ সব হইল প্রধান" (পৃ. ৬৪)। সূর্য্যপ্রতাপনারায়ণ উজির হইল এবং "দেওয়ান মুনসী হইল চাম্পা রায় ঠাকুর" (পৃ. ৬৭)। এই সময়েই,

মিরখাঁরে আনি তবে উকিল করিল।
মোগল বুঝাইতে তবে তানে নিয়োজিল॥

রত্নমাণিক্যের পিতৃব্যপুত্র "দ্বারিকা ঠাকুর" রামমাণিক্যের রাজত্বকালেই কিছু দিনের জন্য বিদ্রোহী হইয়া "নরেন্দ্রমাণিক্য" নামে রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। তিনি এইবার নানারূপ চক্রান্ত করিয়া "রাজা দলসিংহ" নামক রাজপুরুষের সাহায্য লাভ করিয়া পুনঃ রাজা হওয়ার চেষ্টায় রহিলেন। ইতিমধ্যে, "খান বিরাহিম হৈল বঙ্গ অধিপতি" (পৃ. ৮৬) এবং নরেন্দ্রদেব উজীর ও নেব উজীরকে গোপনে হত্যা করাইয়া দলসিংহের রাজপুত সৈন্য সহ মেহেরকুলের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া রাজধানী উদয়পুর অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় বার রাজা হইয়া বসেন। রত্নমাণিক্য, চম্পক রায় প্রভৃতি দ্বারা পরিরক্ষিত হইয়া অরণ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা এবং চম্পক রায়ের পরিক্রমকাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। রত্নমাণিক্যের প্রধান সেনাপতি ইদিল খাঁ প্রভৃতি, ঢাকায় মীর খাঁ ও কুমার দুর্জ্জয়সিংহনারায়ণের (যিনি পরে ধর্ম্মমাণিক্য নামে রাজা হইয়াছিলেন) সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে চম্পকরায় ও অনন্তরাম দুই জনে চাটিগ্রামে সেথ সাহাদি নামক এক ফকিরের আশ্রয়ে দীনভাবে কালযাপন করিয়া, ভুলুয়া হইয়া ঢাকায় আসিলেন। সেখানে সকলের সমবেত চেষ্টায় এবং "হীরানন্দসুত শ্রীযুত মাণিক্যসাহা"র (অর্থাৎ জগৎশেঠ মাণিকচাঁদের) অর্থসাহায্যে (পৃ. ১৭৭-৮) যুদ্ধের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। নরেন্দ্রমাণিক্যের আত্মরক্ষার্থ বিপুল আয়োজনের বর্ণনামধ্যে গ্রন্থখানির আবিষ্কৃত প্রতিলিপি হঠাৎ শেষ হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে গ্রহারম্ভে বিষয়সূচি হইতে অবশিষ্ট অংশের মূল সূত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। রত্নমাণিক্য পুনঃ রাজ্যপ্রাপ্ত হইলে

মহাসত্ব চম্পক রায় হইল যুবরাজ।
অনন্তরাম উজির হইল পাইল রাজকাজ॥ (পৃ. ১৭)

গ্রন্থরচনাকালে চম্পকরায়ই রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন; তাঁহার এবং কবির পৃষ্ঠপোষক

যশবন্ত রসকীর্ত্তি সাহা মির খাঁন।
চম্পক রায়ের প্রিয় প্রাণের সমান ॥ (পৃ. ৩৪)

উভয়েরই প্রচুর প্রশংসা গ্রন্থের নানা স্থানে পাওয়া যায়।

তজবিজ দিয়াছে প্রভু চম্পক রায় পরে ॥
জগন্নাথসুত যদি যুবরাজ না হৈত ॥
রাজার রাজ্যের পরে অনর্থ পড়িত ॥ (পৃ. ৯)

সুতরাং কবি তাঁহার নামানুসারেই কাব্যের নাম রাখিয়াছেন "চম্পকবিজয়"। চতুর্থ ভাগের শেষ যথা—

চম্পকবিজয় কথা মধুরসবাণী।
সেক মহদ্দিয়ে কহে যুদ্ধের কাহিনী ॥
এ হেন অপূর্ব্ব কথা শুনে যেই জনে।
বুদ্ধি সাহস তার বাড়ে সেই ক্ষণে ॥

মূল পুথির শেষে ছিল—"পুস্তক শ্রীরামজয় ঠাকুর স্বাক্ষর শ্রীরামনারায়ণ দেব…সন ১২০৬ তারিখ ১৮ই বৈশাখ।" (এখানে উল্লেখযোগ্য, পরিষদের রাজমালা পুথির লেখকও এই "রামনারায়ণ দেব"—৪৯।২ ও ৫৫।২ পত্র দ্রষ্টব্য)।

এই গ্রন্থে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ ভাগে বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী ঢাকা নগরীর কথা প্রসঙ্গক্রমে বহু স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে এবং রাজনীতির তাৎকালিক একটা অবিকল চিত্র ইহাতে অঙ্কিত পাওয়া যায়। নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহের প্রকৃত বিবরণ ও কালনির্ণয় (ইব্রাহিম খাঁর অধিকার ১৬৯০-৯৭ খ্রী. মধ্যে) এই প্রামাণিক গ্রন্থে আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু ভ্রান্ত মত সংশোধিত হয় এবং নরেন্দ্রমাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ সমর্থিত হয়। চট্টগ্রামে চাকমা রাজবাড়ীতে একটি সুবর্ণ-মুদ্রা আমরা পরীক্ষা করিয়াছিলাম—এক দিকে লেখা "হরিহরপ/দপদ্মমধুপ / শ্রীশ্রীযুত নরে/ন্দ্রমাণিক্যদেব" এবং অপর দিকে "শক ১৬১৫" (=১৬৯৩ খ্রী.)। চম্পকবিজয়ে ত্রিপুরার বহুতর দুর্গ ও গড়ের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরা আক্রমণের দুইটি পথই প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত ছিল—মেহেরকুলের পথ ও কৈলাগড়ের পথ। এ গ্রন্থে দক্ষিণ দিকে চৌদ্দগ্রামের পথ নূতন দৃষ্ট হয়—এই পথ ধরিয়াই মির খাঁ ব্যূহদ্বার ভেদ করিয়া উদয়পুর নিয়াছিল (পৃ. ১৩)।

রত্নমাণিক্যের অভিষেকমুদ্রার শকাঙ্ক ১৬০৭ এবং ঐ শকাব্দেই তিনি তাম্রশাসনদ্বারা ভূমিদান করিয়াছিলেন—এই তাম্রপট্ট আমরা পরীক্ষা করিয়াছি। তৎকালে ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর অধিকার ছিল। বলিভীমের পতন হয় বাহাদুর খাঁর সময়ে (১৬৮৮-৯০ খ্রী:)—এ স্থলে দুর্গামণির রাজমালা (পৃ. ২৯৩) সংশোধনীয়। নরেন্দ্রমাণিক্যের রাজত্ব ২ বৎসরের বেশী স্থায়ী হয় নাই—১৬৯৫ খ্রী: রত্নমাণিক্যই রাজা ছিলেন প্রমাণ আছে। সুতরাং বলিভীমের পতন ১৬৮৯ খ্রী: হইতে অন্ততঃ ১৭০৬ খ্রী: পর্য্যন্ত দীর্ঘ ১৫ বৎসর চম্পক রায়ই ত্রিপুরারাজ্যের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

চম্পক রায়ের শোচনীয় পতনের কথা দুর্গামণির রাজমালায় (পৃ. ২৯৬) নাই। আমরা প্রাচীন রাজমালা হইতে তাহা লিখিতেছি। তিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যসকল রত্নমাণিক্যের পক্ষে থাকায় তিনি নিহত হন :—

বিধাতা বিপক্ষ হৈলে বোদ্ধি হএ নাষ।
রাজা হইতে মনে তার হইল প্রর্ত্তাষ॥
রাজসজ্ঞ সব জত রাজাদিগে হইল।
ইসব দেখিয়া তবে চিন্তাজুক্ত হইল॥
জত সব পরিবার রাখীয়া দেসেতে।
প্রাণভয় পলাইয়া গেলেক বনেতে॥
রাজসঙ্গে বন হতে ধরিয়া আনিল।
অপরাধি জানি তারে সংহার করিল॥ (৬১।২ পত্রে)

চম্পক রায় প্রকৃতই যে রাজা হইতে চাহিয়াছিলেন অথবা কিয়ৎকাল রাজা হইয়াছিলেন, তাহার বিস্ময়কর একটি প্রমাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। চম্পকবিজয়ের প্রারম্ভে লিখিত আছে :—

লক্ষ হোম পূজা যে করিল মহামতি।
আপনে আসিয়া ব্রহ্মা দিলেক আহুতি॥
তুষ্ট হৈয়া বর তবে দিল ভস্মময়।
সর্ব্বত্রে কল্যাণ হৈব রিপু হৌক ক্ষয়॥ (পৃ. ১১)

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়, চম্পক রায় তন্ত্রমতে লক্ষ হোম সম্পাদন করিয়াছিলেন। এবং অনুমান করা যায়, ইহা রাজ্যলাভ প্রত্যাশার ফলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কালীপক্ষীয় টীকার একটি পুথি আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। রচয়িতার পরিচয়াদি শেষ পত্র (১০৭) হইতে উদ্ধৃত হইল।

আস্তে শ্রীগুপ্তপল্লী সুরবরসরিৎতীরদেশে সুধন্যা
তত্র শ্রীগোমুখাখ্যো নিবসতি সততং দণ্ডিনামগ্রগণ্যঃ।
তচ্ছাত্রশ্চন্দ্রচূড়-স্ত্রিপুরনরপতিং শ্রীযুতং চম্পকাখ্যং
দৈবাৎ তৎকৃত্যে টীকান্তদনুমতিবশাৎ ব্যারচৎ ব্রহ্মচারী॥
মহাভূপকল্যাণদেবস্য পৌত্রং, সুতং সজ্জগন্নাথবীরস্য বীরং।
গুরোর্বাসরে মাসি মাঘে চ ধন্যে, শকে সপ্তযুগ্মারি-রাত্রীশগণ্যে॥ (কুলকং)

তৎপর তিনটি প্রশস্তি-শ্লোকে গ্রন্থসমাপ্তির পর পুষ্পিকা যথা,

ইতিশ্রীযুতমহারাজাধিরাজচম্পকমহীনাথ-নিদেশিত-শ্রীচন্দ্রচূড়-
ব্রহ্মচারিবিরচিতা কালীপক্ষীয়া বিদ্যাসুন্দরকাব্যটীকা সংপূর্ণা ॥০॥
শকাব্দাঃ ১৬২৭ ॥ শ্রী × × দাসশর্ম্মণঃ স্বাক্ষরং পুস্তকঞ্চ ওঁ হরিঃ ॥

এই লেখা হইতে সন্দেহ থাকে না যে, চম্পক রায় ঘোরতর শাক্ত ছিলেন এবং ১৬২৭ শকাব্দের মাঘ মাসে (১৭০৬ খ্রীঃ) "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। ঐ সনেই তাঁহার নিধন ঘটিয়াছিল ধরা যায় এবং চম্পকবিজয়ের রচনাকাল অব্যবহিত পূর্ব্বে ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুমান করা যায়।

গ্রন্থরসিক রাজনারায়ণ

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

'পুথির শেষ কথা' প্রবন্ধে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৭শ ভাগ, পৃ. ৫২-৫৮) বলিয়াছিলাম—'লেখক বা মালিক হিসাবে পুথির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।...বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন পুথির সন্ধান করিয়া যেমন একজন গ্রন্থকারের পূর্ণ পরিচয় সংকলিত হয়, সেইরূপ ভাবে এক এক জন সংগ্রহকর্তার সংগ্রহেরও বিস্তৃত বিবরণ সংকলিত হইতে পারে এবং অনেক অজ্ঞাত পুথিশালার সন্ধান মিলিতে পারে।' সম্প্রতি এইরূপ একজন বিশিষ্ট পুথির মালিক ও তাঁহার কয়েকখানি পুথির সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। তাঁহার পূর্ণ পরিচয় ও তাঁহার পুথিশালার সন্ধানে ইহা অণুমাত্র সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বছর কুড়ি পূর্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর-শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে মেদিনীপুরে যাইয়া, শাখা কর্তৃক সংগৃহীত পুথিগুলি নাড়াচাড়া করিতে করিতে রাজনারায়ণ নামক স্থানীয় এক ভূস্বামীর চারিখানি পুথির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মূল-পরিষদের প্রধান কর্মচারী সদ্যঃ পরলোকগত সুহৃদ্ রামকমল সিংহ মহাশয়ের সহযোগিতায় পুথিগুলির শেষাংশ টুকিয়া লই। পুথিগুলি সবই সংস্কৃত পুরাণশাস্ত্রের। প্রতি পুথির শেষের দিকে লেখক নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—পরিচয় বিশেষ কিছু দেন নাই। এইটুকু মাত্র জানা যায় যে, তিনি পুথির স্বত্বাধিকারী রাজনারায়ণের সভাসদ্ এবং একজন কবি ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল রঘুনাথ দেবশর্মা। তবে তাঁহার কবিত্বের বা পাণ্ডিত্যের কোন নিদর্শন পুথির মধ্যে নাই। পুথি কয়খানির নকলের তারিখ ১৬৯৮, ১৬৯৯ ও ১৭০৫ শকাব্দ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদের গোড়ার দিক্। গ্রন্থাধিকারীকে বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। যথা, মহারাজাধিরাজ, প্রবল-প্রতাপান্বিত রাজাধিরাজ, দোর্দণ্ডপ্রবলপ্রতাপপরম, রাজনীতিবিদ্, শিবদুর্গাপরায়ণ, মহাদেবপ্রিয়। সভাসদের ব্যবহৃত বিশেষণের মধ্যে কতটুকু বাস্তব, কতটুকু অতিরঞ্জন, নির্ণয় করা অসম্ভব। তবে রাজনারায়ণ যে একজন শক্তিশালী জমিদার ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।* হয় ত তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ ছিল এবং পুথি নকল করাইয়া সংগ্রহ করার দিকেও একটা ঝোঁক ছিল। তবে তাহা কেবল কয়েকখানি পুরাণ-গ্রন্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কি না, বলিবার উপায় নাই।

* ইনি ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাশীজোড়ার 'রামতুল্য রাজা' রাজনারায়ণ অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। রাজা রাজনারায়ণের সভাসদ্ নিত্যানন্দ স্বরচিত শীতলামঙ্গল কাব্যে পৃষ্ঠপোষকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন (শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৬৬৭)।

পুথিগুলিতে লেখক, লেখনকাল ও গ্রন্থাধিকারী সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, এইবার অবিকল তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ—ব্রহ্মখণ্ড—৩০ অধ্যায়।

যস্যার্থে লিখিতং চেদং পুরাণং শিবসুন্দরি।
তস্য দেহস্য গেহস্য নিত্যং ভবতু মঙ্গলম্॥
দোর্দ্দণ্ডপ্রবলপ্রতাপপরমশ্রীরাজনারায়ণস্যৈব
শ্রীলমহাশয়স্য মহতো গ্রন্থোঽতিভব্যপ্রদঃ।
ব্যালেখি রঘুনাথনামকবিনা ভো ব্রহ্মখণ্ডো মুদা
বিপ্রেণ প্রথমে দিনেঽপি দশমাসস্য প্রযত্নাদ্রুতম্॥
নাগাঙ্কর্তু শশাঙ্কেষুশাকে মাসি তপাখ্যকে
দ্বিতীয়ায়াং শনৌ শুক্লে শ্রবণায়াং সমাপনম্।
অম্বুক্যোগে দিবা যুগ্মপ্রহরাভ্যন্তরেধুনা
মেদিন্যাঞ্চ স্থিতিং কৃত্বা লিখনন্তু সুশোভনম্॥

২। প্রকৃতিখণ্ড—৬৩ অধ্যায়।

শ্রীমচ্ছিবদুর্গাপরায়ণপ্রবলপ্রতাপান্বিতরাজাধিরাজশ্রীরাজনারায়ণমহাশয়স্য পুস্তকমিদম্। তৎসভাসদাস্যেন শ্রীরঘুনাথদেবশর্ম্মণা লিপিরয়ম্।

শাকে নাগাঙ্কষট্‌চন্দ্রে মধুমাসেঽসিতে গুরৌ
শিবদুর্গাপ্রসাদেন লিখনন্তু সমাপনম্।
যস্যার্থে লিখিতং দুর্গে পুরাণং সুন্দরং শুভং
তস্যাপত্যস্য গেহস্য নিত্যং ভবতু মঙ্গলম্॥

৩। গণেশখণ্ড—৪৭ অধ্যায়।

মহারাজাধিরাজস্য মহাদেবপ্রিয়স্য চ
মহারাজস্য শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণস্য চ।
বিঘ্ননিঘ্নকরঃ খণ্ডো গণেশস্য প্রযত্নতঃ
ব্যালেখি রঘুনাথেন দ্বিজেন চপলং মুদা॥
শকাব্দা ১৬৯৯॥ ২। ১৪॥

৪। বৃহন্নারদীয় পুরাণ—

রাজনীতিবিদঃ শ্রীল রাজনারায়ণস্য চ।
পুরাণং নারদীয়াখ্যং লিখিতং রঘুশর্ম্মণা॥
শকাব্দা ১৭০৫ তাং ১৪ আশ্বিনস্য।

একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

পুরাণ বাংলায় বিচিত্র ধরণের যে সব দলিলপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিঞ্চিদধিক এক শত বৎসর হইতে সোয়া দুই শত বৎসর পূর্বের মনুষ্যবিক্রয়পত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য[১]। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ও কিছু কিছু আলোচিত হইয়াছে। তবে সামগ্রিক ভাবে ইহাদের সম্বন্ধে তেমন কোন আলোচনা এখন পর্যন্ত হয় নাই। অথচ ইহাদের মধ্যে সামাজিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান্ ও কৌতুককর উপাদান বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এইগুলি হইতে আমরা জানিতে পারি—মানুষ ঋণের দায়ে বা দুর্ভিক্ষের চাপে অন্নাভাবে নিজেকে একক বা সপরিবারে, নিজ পুত্র কন্যা দাস দাসীকে অপ্রত্যাশিত স্বল্প মূল্যে চিরদিনের জন্য বা দীর্ঘ মেয়াদে বিক্রয় করিয়াছে—ক্রেতার দাস-পুত্রের সহিত বিবাহের উদ্দেশ্যে কেহ কেহ নিজের দাস-কন্যা বিক্রয় করিয়াছে। দ্রব্যবিনিময়ে বিক্রীতের মুক্তির সর্তের উল্লেখ কোন কোন দলিলে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমার জ্ঞাত প্রকাশিত দলিলগুলির একটি কালানুক্রমিক বিবরণযুক্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ (বঙ্গাব্দ)	বিষয়বিবরণ	বিক্রয়মূল্য[২]	প্রকাশ-স্থান
১।	১১২৫	এগার বৎসরের কন্যা[৩] বিক্রয়	৩৲	শিবরতন মিত্রকৃত Types of Early Bengali Prose, পৃ: ৮৬ .
২।	১১৩৩	আত্মবিক্রয় (স্বামী, স্ত্রী ও এক পুত্র)	২১৲	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকৃত বিক্রমপুরের ইতিহাস, (১ম সং), পৃ: ৩২৮

১। এই প্রসঙ্গে দুইখানি জয়পত্র (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩০৬, পৃ. ২৯৭-৩০১ ; ১৩০৮, পৃ. ৮-১০) একখানি শালগ্রাম বন্ধকের দলিল (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, পৃ. ৪০) ও একখানি পিরত্তর পত্রেরও (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৩৫, পৃ. ২০) উল্লেখ করা যাইতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আসামে দাস ক্রয়-বিক্রয়প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। উচ্চ জাতির বয়স্ক পুরুষের মূল্য কুড়ি টাকা হইতে নিম্নশ্রেণীর বালিকার মূল্য তিন টাকা পর্যন্ত ছিল [গেট—A History of Assam, পৃ. ২৩৯), অথচ রূপকথা পাঠে জানা যায়, রাজকুমারী লক্ষ টাকা দিয়া কাঞ্চনমালাকে ক্রয় করিয়াছিলেন (Eastern Bengal Ballads—II. 2. পৃ. ১০১।

২। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বিভিন্ন দলিলে বিভিন্ন ধরণের মুদ্রা ও তাহার আদানপ্রদানপদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছে—পুরওজন (৫, ৭, ১০), বাদশাহী তঙ্কা (৪), সিক্কা (১২, ১৩, ১৪), বেয়াজি বা বেওয়াজি (১, ১০)। কোন কোন দলিলে আবার বিশেষ কোন ধরণের উল্লেখ নাই।

৩। মেয়াদ ৭০ বৎসর। দশ মণ তামা দিলে পূর্বে খালাস পাইবার সর্ত উল্লিখিত হইয়াছে।

ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ (বঙ্গাব্দ)	বিষয়বিবরণ	বিক্রয়মূল্য	প্রকাশ-স্থান
৩।	১১৩৪	আত্মবিক্রয় (স্বামী, স্ত্রী, পুত্র কন্যা চারিটি)	১১৲	মিত্র—Types…পৃ: ৮৮
৪।	১১৪২	আট বৎসরের পুত্র বিক্রয়	৭৲	প্রবর্তক (১৩২৮, ফাল্গুন, পৃ: ৮৯-৯৭)।
৫।	১১৬১	আত্মবিক্রয় (পাঁচ জনের পরিবার)	২১৲	মিত্র—Types…পৃ: ৮৮
৬।	১১৭৭	আত্মবিক্রয়		ঐ, পৃ: ৮৯
৭।	১১৯১	আত্মবিক্রয় (দুই জন স্ত্রীলোক ও দুইটি শিশু)	২৫৲	যোগেন্দ্র গুপ্ত—বিক্রম-পুরের ইতিহাস, পৃ: ৩২৮
৮।	১১৯৫	কন্যা সহ মাতার আত্মবিক্রয়[৪]	৩৲	সাহিত্য (১৩২০, ভাদ্র, পৃ: ৪৩৫-৪১)
৯।	১১৯৫ (?)	দুর্ভিক্ষজন্য নিজ ক্রীতদাসকে বিক্রয়	১২৲	প্রবাসী (১৩২৯, জ্যৈষ্ঠ, পৃ: ১৮৭-৯০)
১০।	১১*৭	ছয় বৎসরের কন্যা বিক্রয়	৩৲	মিত্র—Types…পৃ: ৮৭
১১।	১২১২	বিবাহোদ্দেশ্যে দাসকন্যা বিক্রয়	৩৲	মিত্র—Types…পৃ: ১০১
১২।	১২২৬	বার বৎসরের দাসীকন্যা বিক্রয়	৪৫৲	ভারতবর্ষ (১৩৩৭, বৈশাখ, পৃ: ৮৪২)
১৩।	১২৪২	পঁচিশ বৎসরের পুরুষের আত্মবিক্রয়	১৬৲	মিত্র—Types…পৃ: ১১১
১৪।	১২৪৩	বিবাহোদ্দেশ্যে দাসীকন্যা বিক্রয়	১৬৲ + ১৸০	ঐ পৃ: ১১২

কিছু দিন পূর্বে আমি একখানি সংস্কৃত পুথির মধ্যে পুথির পত্রাকারে পত্রের অর্ধাংশে লিখিত একখানি মনুষ্যবিক্রয়পত্র পাইয়াছি[৬]। ইহাতে ১১৭৭ বঙ্গাব্দে ঋণ পরিশোধার্থ পঞ্চত্রিংশ বর্ষবয়স্কা বিনী দাসীর পনর টাকায় আত্মবিক্রয়ের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দলিলের নকল প্রকাশ করিতেছি :—

৪। মেয়াদ ৭০ বৎসর। সোয়া মণ হলুদের সিধা দিয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

৫। মূল দলিলখানি বর্তমানে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

৬। পুথির মধ্যে নানা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখিয়া দেওয়া হইত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একখানি পুথির মধ্যে প্রাপ্ত শালগ্রাম বন্ধকের দলিল ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে (পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৪০, পৃ. ৪০)। আলোচ্য দলিলখানি বর্তমানে পরিষদের চিত্রশালায় আছে।

ইয়াদি আত্মবিক্রয়পত্রমিদং শ্রীনীলকণ্ঠ সার্বভৌম মহাশয়েষু [।] শ্রীবিনী দাসী ধনিরাম দেএর স্ত্রী যোগিরাম মাঝির কন্যা বয়স ৩৫ পাঁচ তিস বৎসর কস্য লিখনং আগে [।] আমার শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ কর্জ্জ মাহাজনের ১৫ পণর রূপাইয়া ছিল [।] এ বিধায় ঋণানু উপহতি এ[৭] নগদ মূল্য পাঁচ মিল দশমাসী পুরোজন[৮] ১৫ পণর রূপাইয়া পাইয়া আপন স্বেচ্ছায় মহাশয়ের স্থানে আত্মবিক্রয় হইয়া শ্রীজয়নারায়ণের মারফৎ আদায় মাহাজনের হইলাম [।] লওয়াজীমা খোরাক পোষাক দিয়া দানবিক্রেয়াধিকারী হইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দাসীকর্ম করাইতে রহ [।] ইতি সন ১১৭৭ সাৎসত্বের বাংগলা সন[৯] ৫৬৮ পাচ সয় আটষৈট্ট তেঁ ৭ সাতৈ জ্যৈষ্ঠ ঃ

ডান দিকের উর্ধ্ব কোণে

শ্রীবিনী দাস্যাঃ

ডান পাশে

নিশান সহী

উলটা পিঠে

ইশাদি

শ্রীরাম রায়	শ্রীলক্ষ্মীকান্ত	শ্রীহরিহর
শর্ম্মা	শর্ম্মা সাঁ চন্দ্রদ্বীপ ঃ	শর্ম্মা ঘটক ঃ
	শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ	
	শর্ম্মা সাঁ কার্ত্তিকপুর	
	শ্রীজয়নারায়ণ	
	দেব সাঁ টংগিবাড়ী	

৭। অন্ন রিণ উপহতিক্রেমে—পূর্বের তালিকায় ৩ ও ৫ সংখ্যক দলিল। অর্না ও রিণ উপহতি—তালিকার ২ সংখ্যক দলিল। অন্ন´ রিণ উপহতিক্রম—তালিকার ১২ সংখ্যক দলিলের মূল।

৮। পুরওজন দহমাসি—পূর্বের তালিকায় ৫, ৭ ও ৯ সংখ্যক দলিল। পুরওজন সহ দাসী—তালিকার ১০ সংখ্যক দলিল। পুরোওজন দহমাসী—তালিকার ৮ সংখ্যক দলিল।

৯। পরগণাতি সন—পূর্বের তালিকায় ২ সংখ্যক দলিল। এই সন সম্বন্ধে আলোচনা—আনন্দলাল রায়, 'ভারতবর্ষ', কার্তিক ১৩২১, পৃঃ ৭৭৯-৮১।

বাংলা সাময়িক-পত্র

১২৯১-১২৯৪ সাল (এপ্রিল ১৮৮৪—এপ্রিল ১৮৮৮)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১২৭৫ হইতে ১২৯০ সালের মধ্যে যে-সকল বাংলা পত্র-পত্রিকা জন্মলাভ করিয়াছিল, ৫৪শ ৫৭শ বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।* এক্ষণে পরবর্তী দশ বৎসরে (১২৯১-১৩০০) যে-সকল বাংলা সাময়িক-পত্রের আবির্ভাব ঘটে, সংক্ষেপে সেগুলির পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। উপযুক্ত উপকরণের অভাবে এই বিবরণে হয়ত অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইবে, তবুও বহু কষ্টে যেটুকু সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া ভাল।

বৌদ্ধ বন্ধু (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১ (এপ্রিল ১৮৮৪)।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী—কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দী। পরমায়ু—এক বৎসর। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য ছিল।

"১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশহিতৈষী কর্ম্মবীর স্বর্গীয় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা পুনঃপ্রচারিত হয়। তাঁহার আদেশে কালীকিঙ্কর বাবু সে সময়েও উহার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি নিজে উহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। উক্ত বৎসর নবেম্বর মাসে কোনও সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া কালীকিঙ্কর বাবু পদত্যাগ করিলে ৺কৃষ্ণ বাবু নিজেই ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সম্পাদকত্বে বৎসরাবধি 'বৌদ্ধ বন্ধু' প্রকাশিত হইলে পর আবার তাহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।...১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সম্পাদক ডাক্তার ৺ভগীরথ বড়ুয়ার উদ্যোগে আর এক বার 'বৌদ্ধ বন্ধু' সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কাল প্রকাশিত হওয়ার পর কার্য্যকারকের অভাবে সে বারেও ইহাঁর প্রচার বন্ধ হইয়া যায়।"

* ১২৯০ সালের বিবরণে আমরা তিনখানি পত্রিকার নামোল্লেখ করিতে ভুলিয়াছি ; উহা :—

সুনীতি (পাক্ষিক)। ১ কার্ত্তিক ১৮০৫ শক।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন (কৃষ্ণানন্দ স্বামী)-প্রতিষ্ঠিত 'ধর্ম্মপ্রচারক' পত্রের আশ্রয়ে ও বারাণসী সুনীতিসঞ্চারিণী সভার উৎসাহে, বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয় হইতে এই পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ভূধর চট্টোপাধ্যায় (পরে 'বেদব্যাস'-সম্পাদক) পত্রিকাখানি পরিচালন করিতেন। "বালক ও যুবকবৃন্দের হৃদয়ে আর্য্যরীতিনীতির প্রবর্ত্তনা ও আর্য্যভাবের উদ্দীপনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।" ইহা এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তিন বৎসর পরে, ১২৯৩ সালের কার্ত্তিক (?) মাসে ইহা 'সুনীতি ও সংবাদ' নামে পুনঃপ্রকাশিত হয়।

সচিত্র পারস্য কুসুম (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৯০। সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

রহস্য সংগ্রহ (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৯০। প্রকাশক—রাজেন্দ্রলাল দাস ঘোষ, টালা।

অনেক দিন পরে—১৩২২ সালের বৈশাখ মাসে পূর্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদকত্বে আদি বৌদ্ধ পত্র 'বৌদ্ধ বন্ধু'র নব পর্য্যায় প্রচারিত হইয়াছিল।

সোহাগিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

সম্পাদিকা—কৃষ্ণরঙ্গিনী বসু ও শ্যামাঙ্গিনী দে। ১ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট হইতে হৃদয়লাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তপস্বিনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

জীবনচন্দ্র ভক্ত কর্ত্তৃক চিৎপুর হইতে প্রকাশিত।

কুসুমমালা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

সম্পাদক—দেবেন্দ্রনাথ বসু।

চিকিৎসা-সম্মিলনী (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর বিশেষ উদ্যোগে চিকিৎসা-বিষয়ক এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক—ডাঃ অন্নদাচরণ খাস্তগির্ ও কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন। পত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম সংখ্যার "ভূমিকা"য় প্রকাশ :—"প্রচলিত চিকিৎসা-সমূহের মধ্যে কোন্‌টি দ্বারা কোন্ রোগের বিশেষ উপকার হয়, দৃষ্টফলানুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিতে কলিকাতাস্থ লব্ধনামা ও কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণের সাহায্যে 'চিকিৎসা-সম্মিলনী' নামক অর্থাৎ কবিরাজী ও ডাক্তারী এই উভয়বিধ চিকিৎসার মধ্যে আমাদের দেশে কোন্ কোন্ রোগে কোন্ কোন্ চিকিৎসা বিশেষরূপে উপযোগী, অস্ত্রচিকিৎসা ও পিচকারী দেওয়া প্রভৃতি আশু ফলদায়ক ক্রিয়াগুলি ঐ উভয়বিধ চিকিৎসার কাহার মধ্যে কত দূর উৎকৃষ্ট এবং রোগপরীক্ষা, দ্রব্যগুণতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি চিকিৎসকের অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলিই বা কোন্ মতে কত দূর শ্রেষ্ঠ; তদ্বিষয়ক আলোচনাপূর্ণ একখানি পত্রিকা প্রচার করিতে উদ্যোগ করিলাম।"

ব্রাহ্মজীবন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

"ব্রাহ্মজীবন নামে একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। যাহাতে ব্রাহ্মগণ উপাসনাশীল হন এবং পারিবারিক সমস্ত কার্য্য ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুসারে সম্পন্ন করেন ইহাই এই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য।...ধর্ম্মবন্ধু কার্য্যালয়—১৯ নং ব্রজনাথ দত্তের লেন।"—'ধর্ম্ম বন্ধু,' ১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।

সৎসঙ্গ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯১।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার ২য় ভাগ প্রকাশিত হয়—১৩০১ সালের বৈশাখ মাসে।

ভুষণ্ডী কাকের নক্‌শা (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

বিদ্রূপাত্মক পত্র। প্রকাশক—অম্বিকাচরণ মোদক।

রত্নাকর (পাক্ষিক)। আষাঢ় ১২৯১।

হিন্দুধর্ম্মপ্রচারক পত্রিকা। প্রকাশক—বংশীনাথ বসাক, ঢাকা শীতল প্রেস।

ভুত (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

এই সচিত্র পত্রিকায় কেবল ব্যঙ্গ রচনাই স্থান পাইত।

জাহ্নবী (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯১।

"সর্ব্বথা আজ মানব পশুভাবাপন্ন বা পশু হইতেও নিকৃষ্ট, সুতরাং পতিত। পতিত উদ্ধার করিবার জন্যই জাহ্নবীর অবতারণা।" সম্পাদক—বীরেশ্বর পাঁড়ে।

নবজীবন (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯১।

উচ্চাঙ্গের মাসিকপত্র; সম্পাদন করিতেন—'সাধারণী'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। 'নবজীবনে'র পরমায়ু ৫ বৎসর; শেষ সংখ্যা—৫ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৬। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, চন্দ্রনাথ বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রমুখ মহারথীদের রচনা ইহার পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিত। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর হাতে খড়ি এই 'নবজীবনে'; তাঁহার প্রথম রচনা—"মহাশক্তি" ১ম বর্ষের পৌষ-সংখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছিল।

প্রচার (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯১।

জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে পুরোভাগে রাখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ষুদ্র মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। তিনি লিখিয়াছেন:—"নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম্ম—যে হিন্দুধর্ম্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম।" এই 'প্রচারে'ই বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' প্রথমে মুদ্রিত হইয়াছিল। 'প্রচার' চারি বৎসর (১২৯৫ পর্য্যন্ত) চলিয়া বিলুপ্ত হয়।

কালভৈরব (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯১।

বিদ্রূপাত্মক পত্র। সম্পাদক—মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

গৃহস্থালী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯১।

সম্পাদক—বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—ডাঃ হরনাথ বসু। পত্রিকার মলাটে এই শ্লোকাংশ মুদ্রিত হইত:—"চতুর্ণামাশ্রমাণাং হি গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমাশ্রমম্।"

আলোচনা (মাসিক)। ১৫ ভাদ্র ১৮০৬ শক।

ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ক উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—গগনচন্দ্র হোম। গগনচন্দ্র 'জীবন-স্মৃতি'তে বলিয়াছেন:—"বন্ধুবর বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে আমরাও 'আলোচনা' প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই মাসিক পত্রিকার পরিচালনাভার ছিল আমার উপর।" 'আলোচনা'র পরমায়ু দুই বৎসর।

আর্য্যবন্ধু (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯১।

শান্তিপুর হইতে শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। হিন্দুধর্ম্মের প্রসারকল্পে প্রতিষ্ঠিত কাল্না সভার মুখপত্র।

বয়স্য (মাসিক) আশ্বিন ১২৯১।

সম্পাদক—বিপিনবিহারী দত্ত। চুঁচুড়া অরুণ প্রেস হইতে প্রকাশিত।

পতাকা (সাপ্তাহিক)। কার্ত্তিক (?) ১২৯১।

১২৯১ সালের কার্ত্তিক-সংখ্যা 'ভারতী'তে ১ম সংখ্যা সমালোচিত। 'পতাকা' সম্পাদন করিতেন—ভূতপূর্ব্ব 'বঙ্গবাসী'-সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, এম. এ., বি. এল.। ইহা বছর-দুই সগৌরবে চলিবার পর 'সুরভি' পত্রিকার সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

সমাজ সংস্কার (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৯১।

সম্পাদক—বিহারীলাল দাসগুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ (?) ১২৯১।

"আয়ুর্ব্বেদীয়-চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্র এবং সমালোচন।" কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের অনুমতি অনুসারে কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন এবং কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেনের তত্ত্বাবধানে কবিরাজ ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও হরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ১৭ নং কুমারটুলী হইতে প্রকাশিত।

ভোজবাজী (মাসিক)। মাঘ ১২৯১।

বালকদিগের পাঠোপযোগী ইন্দ্রজাল, রসায়ন ও ম্যাজিক সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—অমৃতলাল বসু।

ভারত (মাসিক)। মাঘ ১২৯১।

প্রকাশক—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাগবাজার বান্ধব-পাঠ-সমাজ, ১৯ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর ষ্ট্রীট। প্রতি সংখ্যার মূল্য /১০।

রাজ চিকিৎসক (মাসিক)। ফাল্গুন (?) ১২৯১।

চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র। সম্পাদক—রামচন্দ্র মল্লিক। প্রাপ্তিস্থান— ২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, চন্দ্রকিশোর সেনের আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

পরিণাম (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৯১।

সম্পাদক—কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

প্রসূতিশিক্ষা নাটক (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯২।

নাটকীয় সংলাপে লিখিত। সম্পাদক—প্রমথনাথ দাস, এম. বি.।

বালক (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯২।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহধর্ম্মিণী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় এই সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখিয়াছেন :—

"বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করার জন্য মেজবউঠাকুরাণীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালকগণ এই কাগজে আপন আপন রচনা প্রকাশ করে। কিন্তু শুদ্ধমাত্র তাহাদের লেখায় চলিতে পারে না জানিয়া, তিনি সম্পাদক হইয়া আমাকেও রচনার ভার গ্রহণ করিতে বলেন।"

'বালক' এক বৎসর সগৌরবে চলিবার পর 'ভারতী'র সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়।

ভারতবাসী (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৯২।

"এই বৃহদাকার পত্রখানি বৈশাখ মাস হইতে প্রকাশিত হইতেছে। সম্পাদকীয় কার্য্য অতি গুরুতর, সে ভার বাবু হরিদাস গড়গড়ীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। হরিদাস বাবু সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত।...এখানি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী পি. এম. সুর কোম্পানির যত্নে প্রচারিত হইতেছে।...নগদ মূল্য দুই পয়সা।" ('আদরিণী,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)

দৈনিক (প্রাত্যহিক)। বৈশাখ ১২৯২।

"বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীগণ দিন দিন সুলভ মূল্যের সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া সাধারণের ধন্যবাদভাজন হইতেছেন, ও স্বদেশের মহোপকার করিতেছেন। দৈনিক সপ্তাহে পাঁচ দিন প্রকাশিত হয়, বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা মাত্র।...নগদ মূল্য এক পয়সা।" ('আদরিণী,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)

'দৈনিক' কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। অল্প দিন অন্য হস্তে থাকিয়া ইহা প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

কৃষি গেজেট (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯২।

"কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা।" সম্পাদক—'বঙ্গবাসী' কলেজের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র বসু।

সীতা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯২।

সম্পাদক—ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়।

শিল্প কৃষি পত্রিকা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

তাহিরপুর হইতে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত। পরিচালক—কুমার শশিশেখরেশ্বর রায়।

কুশদহ (সাপ্তাহিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

ইহা পরবর্ত্তী শ্রাবণ মাস হইতে 'ভেরি' পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস হইতে 'কুশদহ ও ভেরি' আবার 'সুলভ সমাচারে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' নাম ধারণ করে। ১২৯৪, ২৮এ শ্রাবণ তারিখের 'সুলভ সমাচার ও কুশদহে' প্রকাশিত সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষ অটলবিহারী দত্তের বিজ্ঞাপনে প্রকাশ :—

"১২৯২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে 'কুশদহ' নামে যে পত্রিকা বাহির হয় তাহা কিছু দিন পরে ভেরির সহিত মিলিত হইয়াছিল। পরে বিগত ১২৯৩ সালের ভাদ্র মাস

হইতে 'সুলভে'র সহিত মিলিত হইয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছিল। তাহাতে নানা প্রকার কার্য্যের অসুবিধা ও সময়ে বাহির না হওয়ায় আমরা আমাদের "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেস" মঙ্গলগঞ্জে আনাইয়া, এই 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' পত্রিকা যথানিয়মে এখান হইতে বাহির করিতেছি।"

সমাজ-দীপিকা (মাসিক)। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

"হিন্দুধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধিকরণ, হিন্দুসমাজের পুনঃসংস্কার, উহাদিগের আবিল রীতিনীতি, আচার, ব্যবহারের পরিবৃর্ত্তি-সাধন এই সকল বিষয়েই পত্রিকার বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে।"

চতুর্থ সংখ্যা (১৫ ভাদ্র) হইতে সম্পাদক-রূপে অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদের নাম মুদ্রিত হইতে থাকে। ইহা ৪৯ নং মেছুয়া বাজার রোড হইতে প্রকাশিত হইত।

দিনাজপুর পত্রিকা (মাসিক)। জ্যৈষ্ঠ ১২৯২।

দিনাজপুর হইতে প্রকাশিত। "উদ্দেশ্য।...কৃষিই এদেশের এক মাত্র জীবনোপায়। জীবনসর্ব্বস্ব সেই কৃষিকার্য্য, কি প্রণালীতে পরিচালিত হইলে কার্য্যের উৎকর্ষতা বর্দ্ধিত হইতে পারে, সেই সমস্ত বিষয়ই আমাদের প্রধান আলোচ্য ; সুতরাং কৃষিবিষয়ক ঘটনাবলি লইয়াই আমরা ক্রমে পর্য্যালোচনা করিব ; কিন্তু তাহা বলিয়া যে অন্য কোন বিষয়ই এ পত্রিকার আলোচ্য বিষয় নহে, এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় দিনাজপুর পত্রিকা আবদ্ধ নহে।"

সম্পাদক—ব্রজেশচন্দ্র সিংহ চৌধুরি, বি-এ, বি-এল। পত্রিকাখানি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

শিল্পপুষ্পাঞ্জলি (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯২।

শিল্প, সাহিত্য, সরল বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন। সম্পাদক—অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভারতে হরিধ্বনি (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯২।

রাজা রাধাকান্ত দেবের বাটী হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবচন্দ্র বসু ও কালীকুমার ঘোষ।

বিজলী (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯২।

বেরা, ফরিদপুর, পাবনা হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্যামাচরণ মজুমদার।

তত্ত্ব-মঞ্জরী (মাসিক)। ১ শ্রাবণ ১৮০৭ শক।

সম্পাদক—রামচন্দ্র দত্ত। "নীতি ধর্ম্ম এবং সমাজসম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা।" পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশাবলী প্রচারকল্পেই ইহার আবির্ভাব। পরমায়ু—দুই বৎসর।

১৩০৪ সালের বৈশাখ মাস হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণাশ্রিত সেবকমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ইহা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ইহা ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই লিখিত হইত।

নব-নলিনী (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯২।

সম্পাদক—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—রামনৃসিংহ চট্টোপাধ্যায়, আন্দুল-বাড়িয়া (নদীয়া)।

নির্ঝর (মাসিক)। ভাদ্র ১২৯২।

বহরমপুর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—হরিকিশোর রায়।

পল্লীগ্রাম (মাসিক)। ভাদ্র (?) ১২৯২।

রাণাঘাট হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ডাঃ যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।

ত্রৈমাসিক হোমিওপ্যাথিক বার্ত্তাবহ। ভাদ্র (?) ১২৯২।

সম্পাদক—অক্ষয়প্রসাদ দত্ত। প্রকাশক—কে. দত্ত. এণ্ড কোম্পানী।

বৈষ্ণব (মাসিক)। আশ্বিন, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০০।

সম্পাদক—কালিদাস নাথ। বৈষ্ণব জগতের হিতসাধনার্থ ইহার আবির্ভাব। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

রসং প্রশংসন্তু কবিত্বনিষ্ঠাঃ।
ব্রহ্মামৃতং বেদশিরোনিবিষ্টাঃ॥
বয়ন্তু গুঞ্জা কলিতাবতংসং।
গৃহীতবংশং কমপি শ্রয়ামহঃ॥

শ্রীমন্ত সওদাগর (পাক্ষিক)। কার্ত্তিক (?) ১২৯২।

৩ নং আহিরিটোলা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রবন্ধ, উপন্যাস, সংবাদ, বাজার-দর প্রভৃতি স্থান পাইত। সম্পাদক—চন্দ্রকিশোর রায়। ১২৯৩ সালের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বিশ্বকর্ম্মা' পত্রে ইহার ২য় বর্ষ, ৫য় সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার আছে।

হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৯২।

ঢাকা গিরিশযন্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।

বঙ্গবালা (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৯২।

সম্পাদক—কালীচরণ বসু।

বিবিধ তত্ত্ব (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৯২।

চিকিৎসা, শিল্প, পাকবিদ্যা ও ইন্দ্রজালাদি বিষয়ক মাসিক পত্র। ৩৭ নং হরিতকী বাগান লেন হইতে রামকুমার নাথ সরকার কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৯২।

সম্পাদক—জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী ও বিপিনবিহারী মৈত্র, এম. বি.। ১৫ নং কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ-বিক্রেতা ও প্রকাশক লাহিড়ী এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভারত শ্রমজীবী (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৯২।

ইহা পূর্ব্বতন 'ভারত শ্রমজীবী'র "দ্বিতীয় কল্প" ও "প্রধানতঃ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র।" সম্পাদক—শশিভূষণ বিশ্বাস।

মহাবিদ্যা (মাসিক)। অগ্রহায়ণ ১২৯২।

তত্ত্ববিদ্যা, অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ও আর্য্যশাস্ত্র-প্রচারক মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক—কুঞ্জবিহারী

ভট্টাচার্য্য, এফ. টি. এস। ঢাকা গিরিশযন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা ১২৯৪ সালে স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র 'গরীবে'র সহিত সম্মিলিত হইয়া 'গরীব ও মহাবিদ্যা' নাম ধারণ করে।

* * *

১৮৮৫ সনে আরও কয়েকখানি সাময়িক-পত্রের অস্তিত্বের পরিচয় পাইতেছি ; এগুলি সম্ভবতঃ ১৮৮৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল :—

১। সুধাপান ; ২। কুমারী পত্রিকা (সাপ্তাহিক) ; ৩। ভারতমিহির (মাসিক, ৪৬ পঞ্চাননতলা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত) ; ৪। পূর্ব্ববঙ্গবাসী (সাপ্তাহিক)।

ঢাকা গেজেট (সাপ্তাহিক)। ইং ১৮৮৬ (?)

ঢাকা হইতে প্রকাশিত, ইংরেজী-বাংলা সাপ্তাহিক পত্র। সম্পাদক—শশিভূষণ রায়, ভূতপূর্ব্ব 'ঈষ্ট'-সম্পাদক। ১২৯৩, অগ্রহায়ণ-সংখ্যা 'বিশ্বকর্ম্মা' পত্রে সমালোচিত।

বিদূষক (মাসিক)। মাঘ ১২৯২।

সম্পাদক—কালীকিঙ্কর আর্য্যরত্ন।

ধূমকেতু (সাপ্তাহিক)। ৪ বৈশাখ ১২৯৩।

চন্দননগর হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শিবকৃষ্ণ মিত্র। পত্রিকার কণ্ঠে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

"চিন্তয়ত্যশুভং যোহি অশুভং তস্য সংভবেৎ।"

'ধূমকেতু'র ২য় বর্ষ ১৬শ সংখ্যার প্রকাশকাল—১৪ শ্রাবণ ১২৯৪, শুক্রবার (২৯-৭-১৮৮৭)।

বেদব্যাস (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৩।

"হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মহিমাকীর্ত্তনই বেদব্যাসের উদ্দেশ্য।" সম্পাদক—ভূধর চট্টোপাধ্যায়। শশধর তর্কচূড়ামণি এই পত্রিকার সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৩।

"যোগ, জ্যোতিষ, শিল্প, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, সঙ্গীত, বাদ্য, রন্ধন, কারুকার্য্য, চিত্র, মুষ্টিযোগ, ম্যাজিক, ইন্দ্রজাল, প্রভৃতি মানবের আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়" সম্বন্ধে সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক—অমৃতলাল বসু, নদীয়ার অন্তর্গত নকাসিপাড়া থানার পুলিস সব-ইনস্পেক্টর।

গ্রামবাসী (পাক্ষিক…)। বৈশাখ ১২৯৩ (?)

উলুবেড়িয়া হইতে প্রকাশিত ; স্থানীয় গ্রামবাসীকে রাজনীতি-বিষয়ক শিক্ষা দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ১২৯৬, বৈশাখ হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

আর্য্যপ্রতিভা (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৯৩ (?)

হালিশহর হইতে প্রকাশিত।

বাণিজ্য ভাণ্ডার (মাসিক)। বৈশাখ (?) ১২৯৩ সাল।

'সুলভ সমাচার ও কুশদহে' (১২ ভাদ্র ১২৯৩) ইহার বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইয়াছে।

বঙ্গরবি (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯৩।

পরিচালক—ঈশানচন্দ্র সাবুই।

আহমদী (পাক্ষিক)। শ্রাবণ ১২৯৩।

ময়মনসিংহ টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—আবদুল হামিদ খান্ আহমদী ইউসুফজয়ী। এই পত্রিকা সম্বন্ধে 'সুলভ সমাচার ও কুশদহ' (৯ ভাদ্র ১২৯৫) লেখেন :—"আহমদী নামক পাক্ষিক পত্রের ৩য় খণ্ডের ১ম ও ২য় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া আমরা সুখী হইলাম।...প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শ মুসলমান মহিলা মাননীয়া শ্রীমতী করিমন্নেছা খানম চৌধুরাণীর সংশ্রবেই 'আহমদী' চলিতেছে। মুসলমানদিগের কয়েকখানি সংবাদপত্র কলিকাতায় কিছু দিন পূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু 'আখ্‌বারে এস্‌লামিয়া' ভিন্ন আর সকলগুলিই লুপ্ত হইয়াছে। 'আহমদী' মুসলমান সম্প্রদায়ের গৌরবস্বরূপ। ইহার অসাম্প্রদায়িকতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইলাম।" ১২৯৬ সালে ইহার নাম 'আহমদী ও নবরত্ন' পাইতেছি। সম্ভবতঃ 'নবরত্ন' নামে কোন স্থানীয় পত্র ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে।

কারিকর দর্পণ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

"মেশিন, ইঞ্জিন প্রভৃতি প্রস্তুত প্রণালী বিশেষরূপে প্রচার করিবার জন্য প্রত্যেক মেশিন প্রভৃতির প্রতিকৃতি সহ" ইহা প্রকাশিত হইত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

বিশ্বকর্ম্মা বা বিজ্ঞান রহস্য (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং শিল্প শিক্ষোপযোগী প্রবন্ধমালা বিবিধ ভাষার সংবাদপত্র এবং পুস্তক হইতে বাংলা ভাষায় অনূদিত হইয়া এই সচিত্র মাসিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করিত। সম্পাদক—বিহারীলাল ঘোষ।

ভিষক্-বন্ধু (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

সম্পাদক—ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী।

পল্লীপ্রকাশ (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৩।

কুচবিহার হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়।

উপন্যাসলহরী (মাসিক)। কার্ত্তিক ১২৯৩।

সম্পাদক—তারকনাথ বিশ্বাস।

দ্বৈভাষিকী (মাসিক)। ১৮ ফাল্গুন ১২৯৩।

'সদ্ভাবশতকে'র কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার যশোহর জিলা-স্কুলে শিক্ষকতাকালে এই দ্বিভাষিক—সংস্কৃত-বাংলা পত্রিকা প্রকাশ করেন। "ইহাতে রাজনীতি, উপাখ্যান ও সংবাদ বিনা গদ্যপদ্যে বিবিধ হিতকর বিষয় লিখিত" হইত। পত্রিকার শিরোভাগে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইত :—

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচ-মূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥"

'দ্বৈভাষিকী'র পরমায়ু এক বৎসর।

বাসন্তী (মাসিক)। ফাল্গুন ১২৯৩।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

অধ্যয়ন (মাসিক)। চৈত্র ১২৯৩।

সম্পাদক—রামদয়াল মজুমদার।

গান ও গল্প (পাক্ষিক)। ১ বৈশাখ ১২৯৪।

এই "পাক্ষিক পত্র ও সমালোচন" প্রতি পক্ষান্তর অর্থাৎ মাসের ১লা ও ১৫ই তারিখে প্রকাশিত হইত। মতিলাল বসু (নাট্যকার মনোমোহনের পুত্র ও বোসের সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা) ইহার সম্পাদক ছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায়, রজনীকান্ত গুপ্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণ ইহার লেখকশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। চতুর্থ সংখ্যায় (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪) তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "সুখ ও দুঃখ" নামে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল।

কর্ণধার (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৪।

মাসিকপত্র ও সমালোচন; সম্পাদক—হারাণচন্দ্র রক্ষিত। বার্ষিক মূল্য এক টাকা।

বীণাপাণি (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৪।

"বীণাপাণি, মাসিক পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা—বৈশাখ। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা। বীণাপাণির আবির্ভাবে আমরা বড় সুখী হইয়াছি। প্রধানতঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধীয় আলোচনা ইহাঁর উদ্দেশ্য। প্রবন্ধগুলি অতি সুন্দররূপ নির্ব্বাচিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজে এরূপ পত্রিকার বহুল প্রচার একান্ত আবশ্যক।"—'কর্ণধার,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪।

চিকিৎসাদর্শন (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৪।

নদীয়া, মোল্লাবেলিয়া হইতে প্রকাশিত, চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবন্ধপূর্ণ মাসিকপত্র ও সমালোচন; সম্পাদক—রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্ম (সাপ্তাহিক)। বৈশাখ ১২৯৪।

"আমরা 'হিন্দুধর্ম্ম' নামক একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি।"—'সুলভ সমাচার ও কুশদহ,' ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪।

দীপিকা (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৪।

৭।১ অভয় হালদার লেন, কলিকাতা, সুলভ সাহিত্য প্রকাশ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—প্যারীমোহন হালদার।

নব-যুগ (মাসিক)। বৈশাখ ১২৯৪।

সম্পাদক—আনন্দচন্দ্র মিত্র।

কামনা (মাসিক)। বৈশাখ (?) ১২৯৪।

ঢাকা গিরিশ-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—শশিভূষণ দত্ত।

সাম্যবাদী (মাসিক)। বৈশাখ (?) ১৮০৯ শক।

"উড়িষ্যা হইতে প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রিকাতে অতি উদারভাবে ধর্ম্ম, নীতি ও মিতাচার বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত হইয়া থাকে। পত্রিকা বিনামূল্যে বিতরিত হয়।"—'ধর্ম্মতত্ত্ব,' ১৬ আষাঢ়, ১৮০৯ শক।

কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড-বেদ। আত্ম ও সাধনতত্ত্ব। ১২৯৪ সাল।

কুমারখালী হইতে প্রকাশিত। কাঙ্গাল-ফিকিরচাঁদ ফকীর [হরিনাথ মজুমদার] কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ৬ ভাগে প্রকাশিত; প্রত্যেক ভাগ ১২ সংখ্যায় সম্পূর্ণ।

হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী (মাসিক)। আষাঢ় ১২৯৪।
সম্পাদক—মুন্‌শী গোলাম কাদের।

গুপ্ত জ্ঞানরত্ন সংগ্রহ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯৪।
ডাঃ এ. সি. বসু কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অনুসন্ধান (পাক্ষিক···)। ১৩ শ্রাবণ ১২৯৪।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র। নানারূপ জুয়াচুরি হইতে দেশের লোককে সতর্ক করাই 'অনুসন্ধানে'র উদ্দেশ্য। প্রথম সম্পাদক—দুর্গাদাস লাহিড়ী। ৮ম বর্ষ (২১ বৈশাখ ১৩০১) হইতে ইহা সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত হয়।

সংসার দর্পণ (মাসিক)। শ্রাবণ ১২৯৪।
১৩ নং যোড়াবাগান ষ্ট্রীট হইতে প্রসাদকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। সংসার, সমাজ, বিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয় সকল আলোচনা করাই পত্রিকাখানির উদ্দেশ্য ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংসার দর্পণ' সম্পাদন করিতেন। পত্রিকাখানির পরমায়ু দুই বৎসর।

সচিত্র কৃষি শিক্ষা (মাসিক)। ভাদ্র ১২৯৪।
ঢাকা গিরিশ-যন্ত্র হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক—কালীকুমার মুন্সী।

সারসংগ্রহ (মাসিক)। ভাদ্র ১২৯৪।
বীরভূম জেলা মল্লারপুর পোঃ অঃ মলুটি গ্রাম হইতে প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা; সম্পাদক—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।

বিভা (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৪।
ইহা "শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক ৬১ নং বাহির শ্যামবাজার হইতে প্রকাশিত।" ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহার ৭ম-৮ম (চৈত্র-বৈশাখ) যুগ্ম-সংখ্যায় মুদ্রিত দাস-কবির 'প্রেম ও ফুল' কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য আছে :—" 'প্রেম ও ফুল' বিভা প্রকাশক প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের ইহার অধিক সমালোচনা করা ভাল দেখায় না।···"
'বিভা' একখানি উচ্চাঙ্গের মাসিক পত্রিকা ছিল। ইহার পৃষ্ঠায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনেকগুলি রচনা মুদ্রিত হইয়াছিল; দৃষ্টান্তস্বরূপ ১ম ও ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত তাঁহার "জাতিভেদ" প্রবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রবন্ধের শেষে লেখকের নামোল্লেখ নাই, কিন্তু ঐ দুই সংখ্যা পত্রিকার মলাটে মুদ্রিত প্রবন্ধ ও লেখকের নাম-সূচীতে শাস্ত্রী-মহাশয়ের নাম আছে।

ধর্ম্ম-নিগম (মাসিক)। আশ্বিন ১২৯৪।
ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শশীভূষণ নন্দী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

ভারতবন্ধু ও জাহানাবাদ পত্র (মাসিক)। ফাল্গুন (?) ১২৯৪।
সম্পাদক—আশুতোষ গুপ্ত।

* * *

'বামাবোধিনী পত্রিকা'য় (ভাদ্র ১২৯৪) 'খৃষ্টীয় প্রহরী,' এবং 'বিভা'য় (পৌষ ১২৯৪) 'গরীব ও মহাবিদ্যা' নামে দুইখানি পত্রিকার প্রাপ্তিস্বীকার আছে। 'গরীব' ঢাকা হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র; ইহার সহিত স্থানীয় 'মহাবিদ্যা' সম্মিলিত হইয়া 'গরীব ও মহাবিদ্যা' নাম ধারণ করে। এই পত্রিকাগুলির প্রথম আবির্ভাবকাল ১২৯৩-৯৪ সাল হওয়া সম্ভব।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের
সপ্তপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৭শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৮শ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পরিষদের ৫৭শ বর্ষের কার্য্যবিবরণ সংক্ষেপে পর্য্যালোচিত হইতেছে।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন,—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা :—

বিশিষ্ট সদস্য—১। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, ২। আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ৩। ডক্টর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৪। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়, ৫। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন সদস্য—রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। ডাঃ শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। প্রশান্ত-কুমার সিংহ, ১৬। ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২১। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ও ২২। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে ৫ জন। **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষশেষে ১০ জন।

সাধারণ-সদস্য—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী সদস্যের সংখ্যা ৭৫৩ জন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—শ্রীঅরবিন্দ, কমলচন্দ্র নাগ, তুলসীদাস কর, নিরুপমা দেবী, পরিমল মুখোপাধ্যায় ও সুরেশচন্দ্র রায়।

পরলোকগত সদস্যগণ—(ক) কালীকৃষ্ণ রায়, কৃষ্ণধন সাধু খাঁ, নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ, বঙ্কিমবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজবল্লভ রায় ও রমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত। (খ) ভূতপূর্ব্ব সদস্যগণ : ওয়াজেদ আলী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, নলিনীমোহন সান্যাল, ব্রজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় ও হরশঙ্কর পাল।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের ভূতপূর্ব্ব প্রধান কর্ম্মচারী রামকমল সিংহ গত ১২ই চৈত্র ১৩৫৭ তারিখে পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদর্শনার্থ গত ৭ই বৈশাখ ১৩৫৮ তারিখে এক বিশেষ অধিবেশন হয়।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (ক) ষট্-পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ ; (খ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতি-পূজা—১৪ই আষাঢ় ১৩৫৮ ; (গ) প্রথম মাসিক অধিবেশন—২১এ পৌষ ১৩৫৭ ; দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২০এ মাঘ ১৩৫৭ ; তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—১৯এ ফাল্গুন ১৩৫৭ ; চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ও বঙ্কিমচন্দ্র-স্মৃতিবার্ষিকী—

২৬এ চৈত্র ১৩৫৭ ; ৫ম মাসিক অধিবেশন—২১এ বৈশাখ ১৩৫৮ ; ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৫এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ ; সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২২এ আষাঢ় ১৩৫৮।

কার্য্যালয় : সভাপতি—শ্রীসুশীলকুমার দে ; গত ২৬এ চৈত্র পদত্যাগ করিলে অন্যতম সহকারী সভাপতি মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হন। **সহকারী সভাপতি**—আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার, শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, মহারাজা শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ; তাঁহার শূন্য স্থানে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅনাথনাথ ঘোষ, শ্রীত্রিদিবনাথ রায় ও শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীগণপতি সরকার। **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী। **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—(ক) সদস্য-পক্ষে : ১। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ২। রেভাঃ ফাদার এ দোঁতেন, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৫। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৫। শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ২০। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়। (খ) শাখা-পরিষদ পক্ষে : ২১। শ্রীঅজিতকুমার বসু মল্লিক, ২২। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২৩। শ্রীনারায়ণনাথ বসু সরস্বতী ২৪। শ্রীসুধীন দাশগুপ্ত।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা ; (ক) কমলা বক্তৃতা—শ্রীসজনীকান্ত দাস, (খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ বক্তৃতা—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) শরৎ চন্দ্র পদক ও পুরস্কার—শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, (ঘ) জগত্তারিণী পদক—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, (ঙ) সরোজিনী পদক—শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা।

২। আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকারের অশীতিতম বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে বঙ্গীয়-ইতিহাস-পরিষদ্ যে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করেন, তাহাতে পরিষৎ এক বাণী পাঠাইয়াছিলেন।

৩। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণের লেখা বাঙ্গলায় অনুবাদ করা প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয় ; এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৪। বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদের আমন্ত্রণে, পরিষৎ ইহার সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

৫। নয়া দিল্লীতে ভারত-সরকারের শিক্ষা-বিভাগ যে বিদ্বজ্জন সম্মিলন আহ্বান করেন, তাহাতে পরিষদের প্রতিনিধি ডক্টর শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য যোগদান করেন।

৬। কলিকাতা ছোট আদালতের বার্ষিক প্রদর্শনীতে এবং কৃষ্ণনগর-সাহিত্য-সংসদ 'অন্নদামঙ্গল' রচনার দুই শত বৎসর পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তাহাতে পরিষদের কতকগুলি পুস্তক ও পুথি প্রেরিত হইয়াছিল।

৭। পরিষদের নিয়মাবলী নিঃশেষিত হওয়ায় ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষেও সপ্তপঞ্চাশত্তম ভাগ পত্রিকা দুইটি যুগ্ম-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালা—বর্ষশেষে মোট পুথির সংখ্যা ৫৯২০। এতদ্ব্যতীত সম্প্রতি (শ্রাবণ ১৩৫৮) নটবর দত্ত ভক্তিবিনোদের যে গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদে আসিয়াছে, তাহাতে কতকগুলি পুথি আছে; সেগুলি এখনও গুছাইতে পারা যায় নাই।

বহু অনুসন্ধিৎসু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

রমেশ-ভবন—ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং আপিসরূপে এবং নিম্নতলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা সাহিত্য-পরিষৎ পোষ্ট আফিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নতলের হল-ঘরটিতে চিত্রশালার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর অন্যতম পুত্র ডাঃ শ্রীবেণীমাধব চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-পত্নী কাদম্বরী দেবীর রচিত 'সাধের আসন'খানি পরিষদের চিত্রশালায় দান করিয়াছেন।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বদান্যতা—"Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকাও পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ২৩২ খানি পুস্তক ও পত্রিকা (ক্রীত ১২৯ ও উপহারপ্রাপ্ত ১০৩) সংযোজিত হইয়াছে। সংগৃহীত পুস্তকগুলির মধ্যে 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আক্ষরিক অনুবাদ 'The Fall of Meghnad' (1899) উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিতাইদাস দত্ত তাঁহার পরলোকগত পিতা নটবর দত্তের গ্রন্থসংগ্রহ পরিষৎ-গ্রন্থাগারে দান করিয়াছেন।

পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকা সঙ্কলনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায় পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের বদান্যতায় এই কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

আলোচ্য বর্ষেও বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পরিষদ্‌-গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থপ্রকাশ—সাধারণ তহবিলের অর্থে (ক) রামেন্দ্র-রচনাবলীর ৫ম খণ্ড; (খ) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-লিখিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ৮৩ সংখ্যক পুস্তকে চন্দ্রনাথ বসু, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, ও ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্তের জীবনী; (গ) শ্রীরাজশেখর বসুর 'স্বপ্ন' তৃতীয় সংস্করণ ও 'পুরাণ প্রবেশ' দ্বিতীয় সংস্করণ; (ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে (ক) পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড; (খ) রামমোহন গ্রন্থাবলীর প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড; (গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'রজনী'র চতুর্থ সংস্করণ; (ঘ) মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের অর্থে শ্রীসুধাকান্ত দে-অনূদিত রিকার্ডোর 'ধনবিজ্ঞানে'র মুদ্রণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠান—পূর্ব্ববৎ এবারও কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠান পরিষৎ-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন; পরিষৎ এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। আলোচ্য বর্ষে তাঁহারা কেবলমাত্র ১৯৪৭-৪৮ সালের জন্য পরিষদ্-গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি ক্রয় বাবদ ৫০০৲ টাকার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা-পত্নী ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হয়। এতদ্ব্যতীত শিল্প-সমালোচক যামিনীকান্ত সেনের বিধবা-পত্নীকেও সাহায্য দান করা হইয়াছে।

বঙ্কিম-ভবন—পরিষদের নৈহাটি-শাখার তত্ত্বাবধানে এই ভবন রক্ষিত হইতেছে। এই শাখার উদ্যোগে বঙ্কিম-সঞ্জীব জন্ম-বার্ষিকী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী সম্পন্ন হইয়াছিল।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) একটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা—আলোচ্য বর্ষে (১) মহিলা কবি মানকুমারী বসুর তৈলচিত্র গত ৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৭ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীচারুচন্দ্র নাগ, এবং (২) প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও কথা-সাহিত্যিক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের তৈল-চিত্র গত ২০এ মাঘ ১৩৫৭ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। চিত্র-প্রদাতা—শ্রীফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়।

ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল—এই তহবিলে আলোচ্য বর্ষে যে চাঁদা পাওয়া গিয়াছে তাহা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ২৫৲, শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৫৲, শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত ৪৲।

উপসংহার—আমরা এত কাল আমাদের সাধ্যমত পরিষদের সেবা করিয়াছি—কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি আপনারাই জানেন। আমাদের তরফ হইতে এই কথা বলিতে পারি যে, নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার অভাব কোন দিন হয় নাই। এখন আমরা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি—যৌবনের শক্তি আর নাই। তরুণেরা আসিয়া আমাদের কর্ম্মভার লাঘব করিবেন তাহার প্রতীক্ষায় আছি। বর্ত্তমানে গ্রন্থপ্রকাশ-বিভাগকে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া পরিষদের চিরন্তন আর্থিক সমস্যার অনেকটা সমাধান করিয়াছি বটে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ, সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি, নিয়মিত তাঁহাদের চাঁদা আদায় অপেক্ষাকৃত তরুণ ও কর্ম্মক্ষম কর্ম্মীদের উপর নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা অগ্রসর হইয়া আসুন, আমরা তাঁহাদের হাতে ধীরে ধীরে পরিষদ্-পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তুলিয়া দিয়া নিশ্চিত হই—ইহাই আমাদের একমাত্র কামনা। এক দিনে হঠাৎ আসিয়া কেহ দায়িত্বভার লইতে পারেন না, তাহার জন্য শিক্ষা ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। পরিষদের সকল বিভাগের কাজ একে একে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সমস্ত বুঝিয়া পড়িয়া লইবেন সদস্যদের মধ্য হইতে এইরূপ উদ্যোগী ও উদ্যমশীল কর্ম্মীদের আমি আজ সাদর আহ্বান জানাইতেছি। এই নিবেদনই আমার এত কাল সাহিত্য-পরিষদের সেবার চরম নিবেদন।

১৫ ভাদ্র ১৩৫৮

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক—কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির পক্ষে

বিদ্যাবন্তং যশস্বন্তং লক্ষ্মীবন্তঞ্চ মাং কুরু
রূপং দেহি. জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি
দেহি সৌভাগ্যমারোগ্যং দেহি দেবি পরং সুখম্
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি
★
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু জাতি রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
হিন্দুস্থান
কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স
সোসাইটী, লিঃ, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা
UPCO
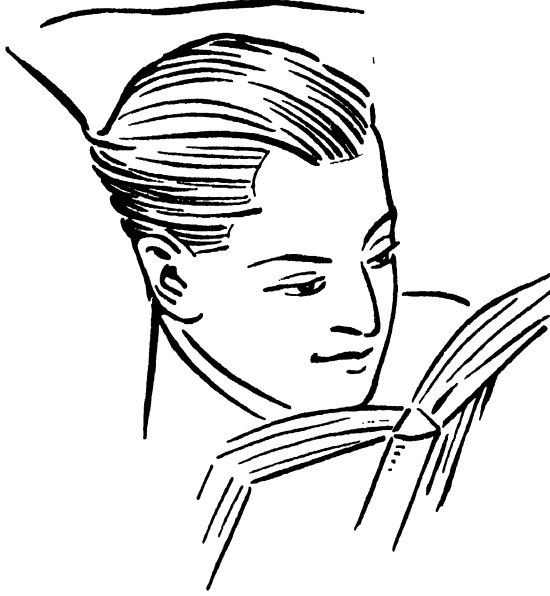
৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৮শ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির
হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৮শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

স্তর শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
মাননীয় শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীগণপতি সরকার

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

ইউ. এম. চৌধুরী এণ্ড কোং শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ৯। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ১০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ১২। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৩। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, ১৪। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ১৯। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২০। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ, ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৮শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫৮শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
১৩৫৮

মহাব্যাহৃতি

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাহৃতি সপ্তসংখ্যক—ভূর্, ভুবর্, স্বর্, মহর্, জন, তপস্, সত্য। এই সপ্ত ব্যাহৃতি মহাব্যাহৃতি নহে, ইহাদের অন্তর্গত ভূর্, ভুবর্, স্বর্, এই তিনটি মহাব্যাহৃতি (মনু, ২, ৮১)। ভূ-প্রভৃতি সপ্ত লোক মহাব্যাহৃতি নহে, উহাদের অন্তর্ভূত ভূর্, ভুবর্, স্বর্, এই তিনটি মহাব্যাহৃতি হইল কেন? এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসে। এই প্রশ্নের উত্তরে, হেয় বা উপাদেয় বিচার না করিয়া, আমার সিদ্ধান্ত, কারণ নির্দেশ করিয়া নিবেদন করিব।

১। ঋগ্বেদের ১.১৬৪.৫০শ ঋকের সায়ণভাষ্য—"সর্ববৈদিকবাগ্‌জালস্য সংগ্রহরূপা ভূরাদিস্তিস্রো ব্যাহৃতয়ঃ,"—অর্থাৎ সকল বৈদিক বাক্‌সমূহের সংগ্রহরূপ অর্থাৎ সমবেত বা সংক্ষিপ্ত ভাবে গ্রহণরূপ বা গৃহীত আকার ভূরাদি ত্রিসংখ্যক (ভূর্, ভুবর্, স্বর্) ব্যাহৃতি। বৈদিক শব্দসমূহের সংগ্রহরূপত্ব এই ব্যাহৃতিত্রয়ের মহত্ত্বের কারণ এবং এই হেতু ভূরাদি মহাব্যাহৃতি নামে অভিহিত।

২। "প্রজাপতি (বিরাড়াত্মা) পৃথিব্যাদি লোকের উদ্দেশে, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি হইতে রস গ্রহণের ইচ্ছায়, ধ্যানলক্ষণ তপস্যা করিলেন। তিনি তপস্যায় সেই লোকসমূহের রস (সার) উদ্ধৃত করিলেন এবং পৃথিবী হইতে সারভূত অগ্নি, অন্তরিক্ষ হইতে সারভূত বায়ু, দ্যুলোক হইতে সারভূত আদিত্য উদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি এই তিন দেবতার উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। তিনি তপ্যমান সেই দেবতাত্রয়ের রস উদ্ধৃত করিলেন এবং অগ্নি হইতে ঋক্‌সমূহ, বায়ু হইতে যজুঃসমূহ, আদিত্য হইতে সামসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি এই ত্রয়ী বিদ্যার উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। তিনি তপ্যমান দেবতাত্রয় হইতে রস গ্রহণ করিলেন এবং ঋক্‌সমূহ হইতে ভূর্, যজুঃসমূহ হইতে ভুবর্, সামসমূহ হইতে স্বর্ উদ্ধৃত করিলেন।"—ছান্দোগ্যোপনিষৎ, চতুর্থাধ্যায়, সপ্তদশ খণ্ড, ১, ২, ৩ মন্ত্র।

প্রজাপতি ধ্যানলক্ষণ তপস্যায় ত্রয়ী হইতে সারভূত রস এই ব্যাহৃতিত্রয় প্রথমে উদ্ধৃত করেন। মহরাদি লোকচতুষ্টয় পরে কল্পিত ও তত্তন্নামান্তরে স্বর্লোকের অন্তর্ভূত লোক। এই হেতু স্বরাদিত্রয় মহাব্যাহৃতি।

৩। অব্যয় অর্থাৎ অক্ষরব্রহ্মপ্রাপ্তিফলক ওঙ্কারপূর্বক ভূর্, ভুবর্, স্বর্, এই মহাব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা সাবিত্রী (গায়ত্রী) বেদের মুখ অর্থাৎ আদ্য, অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির মুখ অর্থাৎ দ্বার জানিবে।—মনু, ২,৮১।

বেদের আদ্য অর্থাৎ ওঙ্কারাদিপূর্বক স্বাধ্যায়ারম্ভ হেতু অথবা পরমাত্মপ্রাপ্তির দ্বারস্বরূপ অর্থাৎ স্তবাদিপাঠ জপাদি দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তিহেতু ওঙ্কারপূর্বক ভূরাদি ত্রয় মহাব্যাহৃতি।

৪। প্রণবস্বাহাযুক্ত ব্যাহৃতিত্রয় মহাব্যাহৃতি। যথা, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা।—ভবদেব ভট্ট (শব্দকল্পদ্রুম)।

৫। পুরাণে যে চতুর্দশ লোকের বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্যে ভূরাদি সপ্ত লোক উর্দ্ধলোক। 'ত্রিলোকী' শব্দের 'ত্রিলোকে'র গণনায় স্বর্গ, অন্তরিক্ষ, পৃথিবী, অথবা স্বর্গ, মর্ত, পাতাল, এই তিন লোক গৃহীত হইয়াছে। এই গণনায় স্বর্গ, মহরাদি চতুষ্টয়ের সহিত স্বর্লোক, অর্থাৎ মহরাদি ব্যাপক ভাবাপন্ন স্বর্গের বা স্বর্লোকের অন্তর্গত বিভাগবিশেষরূপে গণিত হইয়াছে; মহরাদি এইরূপ সংক্ষিপ্তভাবে স্বর্লোকের অন্তর্নিবিষ্ট। এই হেতু ভূর্, ভুবর্, স্বর্, এই ব্যাহৃতিত্রয় মহাব্যাহৃতি।

৬। ইষ্টাপূর্ত্তে অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত কার্য্যে স্বরাদি ব্যাহৃতিত্রয়ের ভূরি প্রয়োগ হয়। দ্বিতীয়তঃ, সপ্ত ব্যাহৃতি পূর্বোক্তরূপে সংক্ষেপে মহাব্যাহৃতির অন্তর্নিবিষ্ট হওয়ায়, মহাব্যাহৃতির পাঠে সপ্ত ব্যাহৃতির আনুষঙ্গিক পাঠ হয়। এই হেতু ভূরাদি ত্রয় মহাব্যাহৃতি।

৭। ঋগ্‌যজুঃসামবেদীয় সন্ধ্যাপ্রয়োগে ওঙ্কারপূর্বক সপ্ত ব্যাহৃতির পাঠ এবং ওঙ্কারপূর্বক মহাব্যাহৃতির পাঠও আছে। মনুসংহিতায় কেবল ওঙ্কারপূর্বক মহাব্যাহৃতি আছে। ইহাতে বোধ হয়, সপ্ত ব্যাহৃতি ভূরাদির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া, ভূরাদির মহাব্যাহৃতি, এই সংজ্ঞা করা হইয়াছে।

সংস্কৃত গ্রন্থকার অমর মৈত্র

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

কয়েক শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও প্রসার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় নূতন গ্রন্থরচনার প্রয়োজন কমিতে থাকে। বর্ত্তমানে সেই প্রয়োজন একেবারে লুপ্ত হইয়াছে বলা যাইতে পারে। সংস্কৃতরসিক তথা সংস্কৃতব্যবসায়ী সমাজে পুরাতন ও প্রসিদ্ধ সংস্কৃত পুথিপত্রেরই পঠনপাঠনের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। তথাপি সংস্কৃত রচনার একটা ধারা ক্ষীণ হইলেও প্রায় অব্যাহত ভাবেই এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে—এখনও নানা বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত হইতেছে—বিভিন্ন স্থান হইতে সংস্কৃত পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। যত বেশী অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, ততই এই ধারার পরিপুষ্টতর রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। অথচ ইহার পরিচয় শিক্ষিত সমাজের নিকটও তেমন সুস্পষ্ট নয়। মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তনের পর যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদেরও কোন ধারাবদ্ধ বিবরণ এ যাবৎ সংকলিত হয় নাই[১]। সেই সময়ে বা তাহার পূর্বে রচিত যে সমস্ত গ্রন্থ এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় পুথির আকারে বিভিন্ন পুথিশালায় বা ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, তাহাদের পরিচয়ই বা কবে কি ভাবে উদ্‌ঘাটিত হইবে বলা যায় না। অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সমস্ত স্মৃতিচিহ্ন ইতিমধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যাইতে পারে। এই অবস্থায় কোন গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের সন্ধান পাইলে তাহার যথাসম্ভব বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা বিশেষ উপযোগী হইবে। এই বিবেচনায় আমি পরিষদের পুথিশালায় কিছু দিন পূর্বে সংগৃহীত কয়েকখানি গ্রন্থ ও তাহাদের রচয়িতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে সংকলন করিয়া দিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থকারের নাম অমরচন্দ্র মৈত্র বা মৈত্রেয়। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে তান্ত্রিক সাধনা ও যোগ বিষয়ে রচিত ইঁহার তিনখানি গ্রন্থের পুথি পরিষদের পুথিশালার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (পরিষদের সংস্কৃত পুথি, সংখ্যা—১১০৫, ১৮৫৫, ১৮৬০)। এইগুলিতে গ্রন্থ-কারের যে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—ইনি গৌড়দেশীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল বাসুদেব।[২] ইনি কাশীতে বসিয়া গ্রন্থ তিনখানি রচনা করেন। ইনি কাশীতে যাইয়া যোগাদি অভ্যাস করিয়া বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও বহুশাস্ত্রাব-বোধক হইয়াছিলেন। ইনি বহু তন্ত্র ও অন্যান্য গ্রন্থ আলোচনা করিয়া 'জ্ঞানদীপিকা' ও 'আমরী সংহিতা' রচনা করেন। আমরী সংহিতার প্রারম্ভে আলোচিত গ্রন্থের একটি

১। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত কতকগুলি পুস্তকের উল্লেখ অ্যাডাম সাহেবের শিক্ষাবিষয়ক বিবরণে পাওয়া যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রকাশিত Reports on the state of education in Bengal by William Adam, পৃ. ২৫৯ প্রভৃতি)।

২। গৌড়দেশীয়বারেন্দ্রকুলোদ্ভববাসুদেবাত্মজশ্রীযুক্তামরচন্দ্রমৈত্রেয়বিরচিতায়াং জ্ঞানদীপিকায়াং··· ত্রয়োবিংশ-প্রকাশঃ।

তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকায় মহানির্বাণতন্ত্রের নাম সকলের আগে স্থান পাইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বহু শাস্ত্র আলোচনার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থগুলিতে মাঝে মাঝে অতি সাধারণ ধরণের ভাষার ভুল পরিলক্ষিত হয়। 'অমরসংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ইনি ইঁহার একখানি বাংলা গীতিকাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ইহা ছাড়া ইনি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, জানিতে পারি নাই—ইঁহার বিস্তৃততর পরিচয়ও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

উল্লিখিত গ্রন্থ তিনখানির প্রত্যেকখানির শেষেই রচনাকাল দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়—জ্ঞানদীপিকা রচিত হয় ১৭৫৩ শকাব্দে[৪] (১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে), অমরসংগ্রহ রচিত হয় ১৭৬৫ শকাব্দে[৫] (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) এবং আমরী সংহিতা রচিত হয় ১৭৬৮ শকাব্দে (১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে)[৬]।

পরিষদের পুথিশালায় ইহাদের যে তিনখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, সেগুলি শ্যামবাজার, শ্যামরত্ন লেনের অক্ষয়কুমার গোস্বামী মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। ইহাদের মধ্যে দুইখানি বঙ্গাক্ষরে লিখিত—আমরী সংহিতার পুথিখানি নাগরীতে লেখা। উৎকৃষ্ট কাগজে লিখিত চিত্রশোভিত জ্ঞানদীপিকার পুথির পাটা'র উপরে লাগান এক টুকরা কাগজে গ্রন্থকারের পুত্রের নাম (রামরত্ন মৈত্র) উল্লিখিত হইয়াছে মনে হয়। প্রসঙ্গক্রমে ইঁহাদের আশ্রিতবাৎসল্যের ইঙ্গিতও করা হইয়াছে।

জ্ঞানদীপিকা ২১ প্রকাশ বা পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ইহাতে বিভিন্ন তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থারম্ভে অনুক্রমণিকায় প্রতি প্রকাশে আলোচিত বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে[৭]। ইহা তন্ত্রসারজাতীয় একটি বিস্তৃত তান্ত্রিক নিবন্ধগ্রন্থ। বিগত

৩। অন্যস্য চরিতং গীতং ভাষয়া রচিতং ময়া। গানং করোমি কাশ্যাং বৈ প্রত্যহং সুজনৈঃ সহ।

৪। শাকে ভূশরশৈলচন্দ্রগণিতে কৌজে মিতে পক্ষকে
মীনস্থৈকাদশদিবসগতে ভূতসংজ্ঞা তিথৌচ।
ধ্যাত্বা শ্রীত্রিগুণাত্মিকাং গুণময়ীং দুর্গাঞ্চ দুর্গাপহাং
শ্রীযুক্তামরচন্দ্রমৈত্রবিনয়ী পূর্ণং কৃতং সংগ্রহম্।

৫। শাকে পঞ্চরসাদ্রিচন্দ্রগণিতে মেষং গতে ভাস্করে
রাকায়াং ভৃগুবাসরে ।
হমরচন্দ্রশর্ম্মকৃতিনা কৃত্বা চ গ্রন্থস্ত্বয়ং
শ্রীমৎসজ্জনসন্নিধৌ সুবিমলো ভক্ত্যা প্রকাশীকৃতঃ।

৬। শাকে বসুরসাদ্রীন্দৌ মীনেহষ্টাদশবাসরে। জাতা চ সংহিতা পূর্ণা সিতে ভূততিথৌ কুজে।
বিশেশস্য প্রসাদাচ্চ কাশ্যাং সুজনসন্নিধৌ। শ্রীপূর্বামরমৈত্রেণ কৃতা সজ্জনহেতবে।

৭। প্রকাশে প্রথমে বক্ষ্যে দুর্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্। প্রাতঃকৃত্যাদিকং সর্বং যদ্যদাবশ্যকং বিধিঃ।
দ্বিতীয়ে ভাবকথনং বীরব্যাখ্যা তৃতীয়কে। ষষ্ঠপ্রকাশে তৎ সর্বং যথা শঙ্করভাষিতম্।
চতুর্থে চাভিষেকঞ্চ পঞ্চমে সম্বিদাশনম্। প্রকাশে সপ্তমে সম্যক্ স্নানাদিকবিধিং ততঃ।
পুনস্তত্রৈব বিজয়াধূমগ্রহণজং ফলম্। সন্ধ্যাপ্রয়োগসকলং শিবপূজামনন্তরম্।

কয়েক শত বৎসরে বাংলা দেশে এ জাতীয় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাও কম নহে। ইহাদের মধ্যে প্রাণতোষণী ও হরতত্ত্বদীধিতি মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিয়াছে।

অমরসংগ্রহ ১৮ পাদে সম্পূর্ণ। ইহার বিষয়সূচী এইরূপ—জগন্মিথ্যাত্বপ্রকরণ, তত্ত্ববোধ প্রকরণ, বিবেকবর্ণন, লয়যোগবর্ণন, নবচক্রবিবরণ, পিণ্ডজ্ঞানবিবরণ, যোগরহস্য, ষট্‌চক্রযোগ, পঞ্চামরাযোগ, হঠযোগ, মুদ্রাপ্রকরণ, ধারণা প্রকরণ, রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মমন্ত্রসাধন, সন্ন্যাসযোগ, কাশীযোগ, কালজ্ঞান, বিপ্রলক্ষণ, সাংখ্যযোগ। গ্রন্থশেষে কতকগুলি শ্লোকে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুথিতে এই অংশের অনেকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এক দিন এক ব্রাহ্মণ গ্রন্থকারের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার হস্তস্থিত মহাভারতের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের সূচনা হয়। বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে নানা প্রসঙ্গে অনেক বচন এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমরী সংহিতা চারি উপদেশে বিভক্ত। উপদেশগুলির মধ্যে আবার পরিচ্ছেদবিভাগ আছে। গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়—প্রথম উপদেশে সাংখ্যযোগবিধান, দ্বিতীয় উপদেশে মন্ত্রযোগবিধান, তৃতীয় উপদেশে ছয় পরিচ্ছেদে নাড়িকাক্ষালন, আসন, প্রত্যাহার, প্রাণায়াম, ধারণা, ধ্যান প্রভৃতি হঠযোগবিধান, চতুর্থ উপদেশে সাত পরিচ্ছেদে পূজাপ্রয়োগাদি। গ্রন্থখানি বিশ্বেশ্বর বন্দ্য ও অমরচন্দ্রের কথোপকথনরূপে নিবদ্ধ। এক দিন বিশ্বেশ্বর অমরচন্দ্রসকাশে উপনীত হইয়া, মুক্তিলাভের উপায় অনুসন্ধান করেন এবং দ্রুত সিদ্ধিপ্রদ সাধন, মন্ত্রাদিসাধন ও আচার সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। অমরচন্দ্র বিবিধ তন্ত্র, পুরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া[৮] এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেন।

গুরুপূজাবিধানঞ্চ শিবেন ভাষিতং যথা।
অষ্টমে ত্রিবিধা পূজা শিবশাস্ত্রস্য সম্মতা।
নবমে বহুচক্রঞ্চ ভৈরব্যাদি পৃথক্ পৃথক্।
দশমে বীরকর্তব্যাকর্তব্যমতিসুন্দরম্।
নিন্দনীয়ঃ পুনর্বীরঃ পানাবশ্যকতা তথা।
অন্তর্যজনতাকর্ম তচ্চ রুদ্রপ্রকাশকে॥
ত্রিতুর্যে গৃহধর্মাণি প্রায়শ্চিত্তাদিকং তথা।
ত্রয়োদশপ্রকাশে চ পূর্বাভিষেকনির্ণয়ম্।
দ্বিসপ্তে চ কুমারীণাং পূজনং ফলদং মহৎ।
ত্রিপঞ্চে চ লতাযোগসাধনং পরমাদ্ভুতম্।
ষোড়শে চৈব বীরাণাং বীরসাধনমুত্তমম্।
নানাবিধা পুরশ্চর্য্যা তত্ত্বৎ সপ্তদশে হি বৈ।
অষ্টাদশপ্রকাশে চ জপাদীনাং রহস্যকম্।
অথোনবিংশে যাবদ্ধি মালাপ্রকরণাদিকম্।
বিংশে ত্রিলোহিকং মুদ্রাযন্ত্রসংস্কারমুত্তমম্।
ত্রিসপ্তে চৈব মোক্ষাখ্যিযোগপ্রকরণাদিকম্।
দ্বাবিংশতিপ্রকাশে চ তন্ত্রোক্তদণ্ডধারণম্।
দশনামাবলুং হি শিবেন কথিতং যথা॥
ত্রয়োবিংশপ্রকাশে চ হংসাখ্যং চাবধূতকম্।
ব্রহ্মচিন্তাফলং তত্র নির্বাণফলদং মহৎ।

৮। মহানির্বাণতন্ত্রঞ্চ তন্ত্রং গন্ধর্বসংজ্ঞকম্।
গৌতমীয়ং তথা রুদ্রজামলং গ্রহজামলম্।
শাক্তরং মুণ্ডমালাখ্যং মৃড়ানীতন্ত্রমুত্তমম্।
যোগেশ্বরোদয়ং নাম জ্ঞানভাষ্যং কুলার্ণবম্।
ঘেরণ্ডসংহিতা চৈব তথা গোরক্ষসংহিতাম্।
দত্তাত্রেয়সংহিতাঞ্চ তথা পদ্মপুরাণকম্।
মার্কণ্ডেয়ং তথা স্কন্দং মহাভারতমেব চ।
অন্যানি বহুশাস্ত্রাণি তন্ত্রাণি বিবিধানি চ।
শাস্ত্রাণ্যেতানি চালোক্য সংক্ষেপাৎ কথয়ামি তে।

বৈদ্যনাথমঙ্গল

অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

বেদে শিবের নাম নাই। বেদে যিনি রুদ্র নামে প্রসিদ্ধ, তিনিই বহু শতাব্দী পরে কালক্রমে শিব নামে অভিহিত হইয়াছেন। বেদোক্ত রুদ্রের বহু গুণই শিবের উপর আরোপিত হইয়াছে। শিব ও রুদ্র এখন অভিন্ন। রুদ্র কি ভাবে শিবে রূপান্তরিত হইলেন, তাহার বিচিত্র ইতিহাস বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা সম্ভবপর নহে, প্রয়োজনীয়ও নহে।

শৈব, শাক্ত, সৌর, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ধারার মধ্যে শৈব ধারা সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া আছে। শাক্ত তীর্থ যেমন ভারতের নানা স্থানে, তদ্রূপ শাক্ত তীর্থের পাশাপাশি শৈব তীর্থও সমগ্র ভারতব্যাপী বর্ত্তমান। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে শিব, স্কন্দ, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, বামন, বরাহ, ভবিষ্য, মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও ব্রহ্মাণ্ড, এই দশখানি 'শৈব পুরাণ' নামে অভিহিত। ইহা হইতে শৈব ধারার প্রচার যে কত ব্যাপক, তাহাই অনুভূত হইবে।

বেদোক্ত রুদ্রের নানা গুণের মধ্যে 'রোগাপহরণ' গুণটি অন্যতম। ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব বেদে রুদ্রের এই গুণের বহু উল্লেখ আছে (ঋক্, ১।১১৪।১; শুক্লযজুঃ, ১৬।৪) আবার কোথাও কোথাও তিনি স্বয়ং রোগের ঔষধরূপেও পরিগণিত (ঋক্, ১।৪৩।৪, শুক্লযজুঃ, ১৬।৪৯) এই রুদ্রই আদি দেববৈদ্য—"প্রথমো দৈব্যো ভিষক্"—শুক্লযজুঃ, ১৬।৫। ইনি রোগদাতা ও রোগাপহারী, উভয় রূপেই কল্পিত।

বেদোক্ত রুদ্রের উল্লিখিত গুণসমূহই বিভিন্ন পুরাণে ও তন্ত্রে শিবের গুণরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শিবপুরাণে শিবসহস্রনাম স্তোত্রে শিবের অন্যতম নাম হিসাবে 'ধন্বন্তরি' নামের উল্লেখ আছে। ধন্বন্তরি দেববৈদ্য, ইনি রোগাপহারী (শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ২৮।৬১)। উক্ত সহস্রনাম স্তোত্রটি নামীর গুণহেতু পাঠকদের পক্ষে আরোগ্যকর ও আয়ুষ্কর (ঐ, ২৮।১৬৩)। বেদোক্ত 'দৈব্যো ভিষক্' রুদ্র যেরূপে 'ভেষজী' অর্থাৎ স্বয়ং ঔষধস্বরূপ, তদ্রূপ পুরাণেও তিনি 'মহৌষধি'রূপে কল্পিত (ঐ, ২৬।৬৮) হইয়াছেন। শিবের আরাধনা করিলে শিবভক্তেরা সকল প্রকার ব্যাধি হইতে মুক্ত হন (শিবপুরাণ, সনৎকুমারসংহিতা, ১৪।১১৯, স্কন্দপুরাণে নীলকণ্ঠ-স্তবরাজ দ্রষ্টব্য।)

রুদ্র যেরূপ কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হইয়াছেন, তদ্রূপ এই শিবেরও অন্যতর রূপ 'বৈদ্যনাথ'। বৈদ্যনাথ শিবের উল্লেখ একাধিক তন্ত্রে ও পুরাণে আছে (মহালিঙ্গেশ্বর-তন্ত্রোক্ত শিবশতনামস্তোত্র দ্রষ্টব্য)। বেদোক্ত দৈব ভিষক্ রুদ্র, পুরাণোক্ত 'আরোগ্য ও আয়ুদাতা,' 'সর্ব্বব্যাধিপ্রশমনকারী' শিবই কালান্তরে বৈদ্যনাথ নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৈদ্যনাথ শিবের অবস্থিতিস্থল 'বৈদ্যনাথ' বা 'বৈদ্যনাথধাম' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞের পর সতীর দেহত্যাগ ঘটিলে, বিষ্ণু শিবস্কন্ধস্থিত সতীদেহ সুদর্শন চক্র দ্বারা খণ্ড খণ্ড

করেন। ৫২ ক্ষেত্রে সতীর দেহখণ্ড পতিত হওয়ায় ৫২ পীঠের উৎপত্তি হইয়াছে। তন্ত্রচূড়ামণির পীঠনির্ণয় প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে, বৈদ্যনাথে সতীর হৃদয় পতিত হয়। উক্ত পীঠস্থ ভৈরব বৈদ্যনাথ। "হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।" মৎস্যপুরাণের মতে এই পীঠস্থানের শক্তির নাম—'অরোগা'।

অরোগা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী।

(মৎস্যপুরাণ, ১৩ অঃ, ৪১ শ্লোক)।

বৈদ্যনাথপীঠস্থ দেবমূর্ত্তির নাম 'অরোগা' হইতে ইহাই অনুভূত হইতেছে যে, রোগাপহারী বৈদ্যনাথের গুণ পীঠস্থ দেবীমূর্ত্তির উপরও আরোপ করা হইয়াছে।

বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্যসূচক একখানি বাংলা মঙ্গলকাব্য পাইয়াছি। এই গ্রন্থ 'বৈদ্যনাথ-মঙ্গল' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে 'বৈদ্যনাথমঙ্গলে'রই সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পুথির পরিচয়

বৈদ্যনাথমঙ্গলের ১১খানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে, যথা :—

[১] শ্রীহট্ট জেলার সিঙ্গেরকাছ গ্রামের সদানন্দ ও জয়দুর্গা গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি —

'ক' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২৬, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৬৯ বাং ২৩ জ্যৈষ্ঠ, প্রদাতা—পুলিনবিহারী শীল, শ্রীহট্ট সহর।

'খ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৪২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৭০ বাং, প্রদাতা—রামানন্দ নাথ, খাদিমনগর, তুয়াবহর, শ্রীহট্ট।

'গ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৩০, ৩৫-৪২, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দেশমূল্যপাড়া, বাণিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট।

'ঘ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ২-২৩, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—তারকচন্দ্র চৌধুরী, সিঙ্গেরকাছ, শ্রীহট্ট।

'ঙ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-১৯, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—অমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দেশমূল্যপাড়া, বাণিয়াচঙ্গ, শ্রীহট্ট।

'চ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৪২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২১৭ বাং, প্রদাতা—দয়াল রায় চৌধুরী, বনভাগ, মৌতাপুর, শ্রীহট্ট।

[২] শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষদ্গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি :—

'ছ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২২৭ বাং, প্রদাতা—সতীশচন্দ্র দেব বি. এল. লাউতা, করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ২৭।

[৩] শিলচর নর্মাল স্কুলে রক্ষিত পুথি :—

'জ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-৯, পুথিখানি খণ্ডিত, লিপিকাল অজ্ঞাত, প্রদাতা—জগন্নাথ দেব বি. এ., বি. টি., সুনামগঞ্জ, শ্রীহট্ট। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৭০।

[৪] রাজসাহী, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুথি :—

'ঝ' পুথি—ইহার পত্রসংখ্যা ১-২৬, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২৪৫ বাং বৈশাখ, প্রদাতা—গিরিশচন্দ্র বিদ্যার্ণব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ত্রিপুরা। পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৩৬৮।

[৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত পুথি :—

'ঞ' পুথি—পত্রসংখ্যা ১-২২, পুথিখানি সম্পূর্ণ, লিপিকাল ১২১০ বাং, "নিজ পুস্তক শ্রীরাজকিশোর দাস, সাকিন পরগণে আথানগিরি" [শ্রীহট্ট], পুথির ক্রমিক সংখ্যা ১৩৩০।

[৬] বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত পুথি :—

'ট' পুথি—বিশ্বকোষ-সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়, বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত ৩৫৯ খানি পুথির সংক্ষিপ্ত পরিচয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার ১৩০৫ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় ও ১৩০৬ বঙ্গাব্দের প্রথম সংখ্যায়—'বাঙ্গালা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ১৭৫ সংখ্যক পুথি বৈদ্যনাথমঙ্গল। গ্রন্থরচয়িতা—সুন্দর দ্বিজ, লিপিকাল ১২১০ বাং ২ ভাদ্র, শ্লোকসংখ্যা ৯০০। এই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়া, গ্রন্থের আরম্ভ, ভণিতা ও শেষ অংশ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কবির পরিচয়

কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাঁহার পিতার নাম হরিহর, নিজের নাম দ্বিজ সুন্দর, সম্ভবতঃ নামান্তর মণিরাম ছিল। সমগ্র গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে 'সুন্দর রায়' বা 'সুন্দর দ্বিজ' এইরূপ ভণিতাই দৃষ্ট হয়। মাত্র এক স্থলে 'সুন্দর রাম' ভণিতা পাইতেছি। উক্ত গ্রন্থের দুই জায়গায় 'দ্বিজ মণিরাম' ভণিতা আছে।

উপরে উল্লিখিত 'গ' ও 'ঙ' পুথিতে সুন্দর রায় ও সুন্দর দ্বিজ স্থলে শঙ্কর রায় ও শঙ্কর দ্বিজ পাঠ আছে। ১৮শ ভাগ বিশ্বকোষে 'বাঙ্গালা সাহিত্য—শৈব প্রভাব' অংশে দ্বিজ হরিহরসুত শঙ্কর-রচিত বৈদ্যনাথমঙ্গল হইতে সাত পংক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পংক্তিসপ্তক ডাঃ সুকুমার সেন-রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থেও পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-রচিত বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে শঙ্করকৃত বৈদ্যনাথমঙ্গলের উল্লেখ আছে। অধিকাংশ পুথিতে 'সুন্দর' পাঠ পাওয়ায় উক্ত পাঠই আদর্শ পাঠরূপে গৃহীত হইল। লিপি-প্রমাদবশতঃ, অধিকন্তু 'বলেন সুন্দর রায় শঙ্করচরণে' পাঠের 'শঙ্কর' শব্দের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া 'সুন্দর'কে 'শঙ্কর' পাঠ করা বিচিত্র নহে। ১৯ ভাগ বিশ্বকোষে হরিহরসুত মুকুন্দ দ্বিজ-বিরচিত বৈদ্যনাথমঙ্গল নামক ভাষা-গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং তদ্‌গ্রন্থ হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃতও হইয়াছে। আমরা অন্য কোথাও 'মুকুন্দ দ্বিজ' পাঠ পাইতেছি না। ইহা লিপিপ্রমাদ বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

দ্বিজ সুন্দর কোথাও নিজের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাঁহার একটি উক্তিতে তিনি দারিদ্র্যবশতঃ বৈদ্যনাথদর্শনে বঞ্চিত বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন :—

সংসারে জন্মিয়া মোকে বাম হৈল বিধি।
ভাগ্যবন্তে দেখে গিয়া প্রভু গুণনিধি ॥

অন্যত্র—

প্রভুর মহিমা শুনি মনে লাগে সুখ।
চক্ষু ভরি না দেখিনু হেন চন্দ্রমুখ ॥

কবির বাসস্থান

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে সংগৃহীত পুস্তকখানি ব্যতীত অপর যে দশখানি পুথি দেখিয়াছি, তন্মধ্যে মাত্র একখানি পুথির লিপি-স্থল ত্রিপুরা জেলা ('ঝ' পুথি), অপর নয়খানিরই লিপি-স্থল শ্রীহট্ট জেলা। একমাত্র শ্রীহট্ট জেলা হইতে নয়খানি পুথি আবিষ্কৃত হওয়ায় এই কাব্যের প্রচার শ্রীহট্টেই সর্ব্বাধিক, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

কবির বাসস্থানের উল্লেখ তাঁহার কাব্যের কোথাও নাই। গ্রন্থে ব্যবহৃত ভাষা লক্ষ্য করিলে কবিকে পূর্ব্ববঙ্গের লোক বলিয়াই অনুমিত হয়। এই কাব্যে যে সকল ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এখনও অনুরূপ ভাবে শ্রীহট্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত যথা :—মাগু, যাইমু, দেমু, পূজিমু, নারিমু, হইমু, যাউকা, থৈমু, বলিমু ইত্যাদি।

শ্রীহট্ট জেলার মৌলবীবাজার মহকুমার গয়গড়নিবাসী কবি ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণের সঙ্গে বৈদ্যনাথমঙ্গলের অংশবিশেষের সাদৃশ্য রহিয়াছে। বৈদ্যনাথমঙ্গলের কবি শ্রীহট্টবাসী হইলে একই জেলার এক কবির প্রভাব অন্য কবির উপর পড়া খুবই স্বাভাবিক।

গ্রন্থরচনাকাল

গ্রন্থের কোথাও ইহার রচনাকালের উল্লেখ নাই। গ্রন্থকার কোথাকার এবং কোন্ সময়ের, এই উভয় প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া দুরূহ। বৈদ্যনাথমঙ্গলের যে সকল হস্তলিখিত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে লিপিকালের উল্লেখযুক্ত পুথি কয়খানির মধ্যে ১২১০ বঙ্গাব্দের পুথিখানি ('ঞ' পুথি) প্রাচীনতম। এই তারিখ হইতে কবি অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু

আলোচ্য বৈদ্যনাথমঙ্গল কাব্যেও বৈদ্যনাথের 'রোগাপহরণ' গুণই বিশেষ ভাবে স্বীকৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা :—

[ক] অন্ধ রোগী জরা ব্যাধি কুষ্ঠেত বিখ্যাত।
দরশন মাত্রে মুক্ত করে জগন্নাথ ॥

[খ] রোগ কোটি নাশ করে বৈদ্যনাথ রায় ॥

[গ] রোগ ব্যাধি নাশ করে বৈদ্যনাথ রায় ॥

[ঘ] ত্রাস পাইয়া রোগ ব্যাধি পলাএ ত্বরিতে ॥ ইত্যাদি।

বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক যে ছয়টি কাহিনী বর্তমান কাব্যে পাইতেছি, তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কাহিনী হইতে জানা যায় যে, বৈদ্যনাথের কৃপায় দুষ্ট রক্তবাতরোগী রোগমুক্ত হইয়াছিল। কাহিনী হইতে জানিতে পারি যে, বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে অন্ধ চক্ষুষ্মান্ হয়। এই সকল কাহিনী দ্বারা বৈদ্যনাথের রোগনাশক্ষমতাই বিশেষভাবে কীর্তিত হইয়াছে। আলোচ্য কাব্যের বৈদ্যনাথ শুধু রোগাপহারীই নহেন, অধিকন্তু ইনি ধনদাতা। উক্ত কাব্যের পঞ্চম কাহিনীতে বৈদ্যনাথের 'ধনদাতা রূপ'ই বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ কাহিনী বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ইহাতে জানা যায়, সতীর সতীত্বনাশকারী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া, রোগমুক্তি কামনায় বৈদ্যনাথের আরাধনা করিলে, তিনি তাহাকে তদবস্থায় বিতাড়িত করেন। এই কাহিনী দ্বারা লেখক ইহাই প্রচার করিতে চাহিয়াছেন যে, পরদাররত লম্পটের পাপের ক্ষালন কিছুতেই হয় না। ইহা হইতে লেখকের সমাজহিত-কামী মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে বৈদ্যনাথের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ছয়টি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

[১] রাবণকাহিনী

মহাভারত শ্রবণে বিগতপাপ জন্মেজয়ের রাজসভায় এক দিবস ব্যাস মুনি আসিয়া উপস্থিত হইলে জন্মেজয় তাঁহাকে যথারীতি বন্দনান্তর বলিলেন,—

পুনি এক নিবেদন শুন তপোধন।
বৈদ্যনাথমঙ্গলকথা শুনি অনুক্ষণ॥
কেমনেতে দশানন আনিল শঙ্কর।
কেমনেতে পথে আসি রৈল দিগম্বর॥

জন্মেজয়ের প্রশ্নের উত্তরে ব্যাস বলিলেন যে, রামের সভাতে এক দিবস দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলে রাম তাঁহাকে বন্দনা করিয়া সভায় আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে দুর্ব্বাসা রামের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—

ভকতবৎসল তুমি পতিতপাবন॥
সাগর বন্ধন করি রাবণ বধিলা।
অক্ষয় জটা মিলিছিল তাকে ছেদিলা॥

দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বলিলেন—

কি কারণে অক্ষয় জটা মিলিল রাবণ।

রামের এই প্রশ্নের উত্তরে দুর্ব্বাসা মুনি রাবণকাহিনী, বৈদ্যকাহিনী প্রভৃতি ছয়টি কাহিনী বিবৃত করেন। ব্যাস জন্মেজয়সকাশে এই ছয়টি কাহিনীই কীর্ত্তন করেন।

শিবভক্ত রাবণ প্রত্যহ কৈলাসে যাইয়া শিবপূজা করেন, ইহাতে—

আসিতে যাইতে দুঃখ পায়েত বিস্তর।

এইরূপ অবস্থায় একদিন রাবণ শিবকে লঙ্কায় আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিবার জন্ম প্রার্থনা জানান। শিব বলেন, যেহেতু পার্ব্বতী রাবণের উপর সন্তুষ্ট নহেন, সেই জন্ম গৌরী সহ কৈলাস নগরী, গৌরীর অজ্ঞাতসারে লঙ্কায় লইয়া যাইতে পারিলে, রাবণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে পারে। রাবণ এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কায় আসিয়া, পাত্র মিত্র ও আত্মীয়বর্গকে আহ্বান করিয়া, শিবের লঙ্কায় আগমনে স্বীকৃতি-সংবাদ জ্ঞাপন করেন। ইহা অবগত হইয়া সকলেই আনন্দিত হন। তখন রাবণের নির্দ্দেশে বিশ্বকর্ম্মা গৌরী সহ শিব ও তাঁহার অনুচর-বর্গের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। তৎপর রাবণ বৈশাখের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে শিব আনয়নের জন্ম কৈলাসে যাত্রা করেন। তথায় 'অন্তরে থাকিয়া' শিবানুচর ও বিদ্যাধরী সহ শিব-গৌরীর নৃত্য ও শিবের ভোজন ব্যাপার দেখিয়া চমৎকৃত হন। রাবণের সঙ্গী 'কুজল্লিয়া চর' পরামর্শ দিল, বৃদ্ধ শিবকে লঙ্কায় নিবার প্রয়াস না করিয়া—

বুড়া ছাড়ি রথে তুল যতেক সুন্দরী।

কিন্তু রাবণ কুজল্লিয়া চরের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। অধিক রাত্রে নৃত্যের আসর ভঙ্গ হইলে—

সর্ব্ব দেব চলি গেলা যার যেই পুরী।
শিবদুর্গা নিদ্রা কৈলা কৈলাস নগরী॥

শিবদুর্গা নিদ্রা গেলে রাবণ বহু বিবেচনার পর হিমালয়ের যে চূড়ায় কৈলাস অবস্থিত, তাহা উপড়াইয়া লইবার জন্ম কুড়ি হস্ত দ্বারা আকর্ষণ করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র কৈলাস নগরী কাঁপিয়া উঠিল ও কার্ত্তিক গণেশ সহ শিবদুর্গার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৌরী শিবকে এই অকস্মাৎ প্রলয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শিব রাবণের কামনা ও প্রার্থনার কথা গৌরীকে জ্ঞাপন করিলেন। গৌরী রাবণের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার কথা অবগত হইয়া রুষ্ট হইলেন এবং বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, ইহার ফলে—

পর্ব্বতের তলে হাত লাগিলেক চাপ।
উচ্চৈস্বরে বলে রাবণ ছাড়ি বীরদাপ॥

রাবণের হস্তের উপর পর্ব্বতের চাপ পড়ায় রাবণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত প্রায় চূর্ণ হইবার উপক্রম হইলে রাবণ একান্ত ব্যথিতচিত্তে শিবকে স্তব করিতে আরম্ভ করেন—

কান্দএ রাবণ রাজা কি কহিমু বাণী।
মুখ দিয়া পড়ে রক্ত চক্ষে পড়ে পানি॥

রাবণের এহেন দুর্দ্দশা দর্শনে শিবানুচর নন্দী ও ভৃঙ্গীর হৃদয়ে করুণা ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। তাঁহারা রাবণকে নিস্তার করিবার জন্ম শিবকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শিব ইঁহাদের কথায় কৃপাযুক্ত হইয়া পার্ব্বতীর নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বুঝাইয়া ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন। গৌরী বিশ্বম্ভর রূপ সংযত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—

তবে ত পর্ব্বত কৈলাস অল্পভার হইল।
মৃত্যুবৎ হইয়া রাবণ হস্ত খসাইল॥

ব্যথিত ও অপমানিত রাবণ শিবকে লঙ্কায় লইয়া যাইতে অপারগ হইয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। শিব রাবণের ঐকান্তিক আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া, একা গোপনে লঙ্কায় যাইতে স্বীকৃত হইয়া, নিম্নোক্ত সর্ত্তে রথে আরোহণ করিলেন—

পথে নিয়ে রথ যদি কদাচিত এড়।
তথাতে রহিব রথ কহিলাম দড় ॥

রাবণ শিব সহ রথ মাথায় তুলিয়া লঙ্কা রওয়ানা হইলেন। এ দিকে গৌরী এই সংবাদ অবগত হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইলে ভৃঙ্গী তাঁহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দেন যে—

রাবণ ভাণ্ডিয়া পথে আসিবা বিশ্বনাথ।

গৌরীর আদেশে বরুণ রাবণের উদরে প্রবেশ করিলে তাঁহার দুরন্ত 'লগৃঘিপীড়া' হইল। এমন সময় এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সম্মুখে দেখিয়া রাবণ তাহাকে কিছু সময়ের জন্য রথ ধারণ করিতে অনুরোধ করিলে—

ব্রাহ্মণে বলএ বৃদ্ধ গাএ নাহি বল।
মুহূর্ত্তেক দেখি রথ থৈমু ভূমিতল ॥

রাবণ অনন্যোপায় হইয়া, মস্তক হইতে রথ নামাইয়া, ব্রাহ্মণের হস্তে সমর্পণ করিয়া—

লঘি করিবারে যাএ দুরন্ত রাবণ।

বরুণের কৃপায় মুহূর্ত্তেকে 'লগৃঘি' সমাপ্ত হইল না। দশ দণ্ড কাল অতিক্রান্ত হইল। এদিকে ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তেক পরে রথ ভূমিতে নামাইয়া রাখিলেন। লগৃঘি অন্তে রাবণ আসিয়া দেখেন, রথ মাটিতে বসিয়া পড়িয়াছে। রথ উত্তোলনের জন্য অশেষ চেষ্টা করার কালে শিব রাবণকে পূর্ব্বসর্ত্তের কথা স্মরণ করাইয়া দিলে দুঃখে ও ক্ষোভে রাবণ নিজ মস্তক কাটিয়া, স্তব করিয়া শিবকে পূজা করিতে আরম্ভ করেন—

ত্রিলোকের পুষ্পভার রুধির চন্দন।
অঞ্জলি ভরিয়া শিব পূজএ রাবণ ॥

একাদিক্রমে নয়টি মস্তক ছেদন করিয়া শিবকে পূজা করায় শিব সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মস্তক হইতে অক্ষয় জটা খুলিয়া লইলে রাবণ অকস্মাৎ সেই জটা গিলিয়া ফেলেন। শিবের বরে রাবণের 'নব মুণ্ড' পুনর্ব্বার সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। রাবণ দশ মস্তক একত্রে ছেদন করিয়া শিবকে উপহার দিলেন, কিন্তু—

কাটা মাথা বাঁচি উঠে জটার কারণ।

শিব বলিলেন—অক্ষয় জটা গ্রাসের ফলে—

দেব ঋষি গন্ধর্ব্বেত তোর নাহি ভয়।

শিবের প্রসাদাৎ রাবণ অক্ষয় হইলেন এবং শিবকে বনে পরিত্যাগ করিয়া লঙ্কায় প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে গৌরী—

মদ্য খায় বিপ্রহিংসা করে নানা পাপ।
হেন রাক্ষসের পুরে—

শিব চলিয়া যাওয়াতে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, এমন সময়ে শিব 'শিবরূপী এক লিঙ্গ' সেখানে রাখিয়া কৈলাসে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিবকে দেখিয়া গৌরীর ক্রোধ দ্বিগুণ হইল, তিনি শিবের দুশ্চরিত্রের কথা বর্ণনা করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। শিবও কটূক্তি শুনিয়া রাগিয়া বলিলেন—

আমারে তর্জ্জ কেনে চক্ষু করি রাঙ্গা।
ভাল স্থান চাইয়া গৌরী তুমি বৈস সাঙ্গা॥

শিবের এই উক্তি শুনিয়া গৌরীর ক্রোধ বৃদ্ধি পাইল। তিনি শিবকে নিরাভরণ করিয়া পুরীর বাহির করিয়া দিতে পুত্রদ্বয়কে আদেশ করিলেন। এরূপ অবস্থায় নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলে গৌরী ভাগিনেয়ের নিকট তাঁহার মাতুলের কীর্ত্তির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া বলিলেন—শিব, রাক্ষস রাবণের পুরীতে গিয়াছিলেন, এখন আর তাহাকে ঘরে নেওয়া চলে না, ঘরে নিলে কোন দেবতাই আর গৌরীর হাতে খাইবেন না—

ঘরেতে উঠিলে হৈব পাকেতে বর্জ্জন।

নারদ, গৌরীসকাশে শিব যে কিরূপে রাবণকে 'ভাণ্ডিয়া' চলিয়া আসিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিলে গৌরীর ক্রোধ শান্ত হইল এবং শিবকে পূজা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। ত্রিদশের রাজা শিব রাক্ষসের পুরীতে গেলে দেবসমাজে বড় লজ্জার বিষয় হয়, সেই জন্যই—

এ কারণে কহিলাম এত মন্দ বাণী।

বলিয়া গৌরী শিবের নিকট মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন।

[২] বৈদ্যকাহিনী

ভোজরাজার দেশে 'মন্ত্রবীর্য্য' নামে এক গুণী ছিল, তাহার পুত্র 'অগ্নিবীর্য্য'ও পিতার তুল্য পণ্ডিত। মন্ত্রবীর্য্যের মন্ত্রের গুণে এক পক্ষ বা বিংশতি দিবসের মৃতদেহেও প্রাণসঞ্চার হয়। উক্ত দেশের জনৈক ব্রাহ্মণপুত্রের সর্পাঘাতে মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ না করিয়া, শুধু মুখাগ্নি করিয়া, 'খুলের ভেরুয়া'র উপর স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। মন্ত্রবীর্য্য গুণীর পুত্রবধূ উক্ত মৃতদেহ দেখিয়া, তাহাকে মন্ত্রের দ্বারা সঞ্জীবিত করিয়া, শ্বশুর-শাশুড়ীকে সকল ঘটনা বিবৃত করেন। ব্রাহ্মণতনয় কিছু দিন মন্ত্রবীর্য্যের গৃহে অবস্থান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। উক্ত দেশের রাজার স্ত্রীর 'রক্তবাত' হইলে বৈদ্যকুমার অগ্নিবীর্য্য শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখেন, 'ভৃঙ্গকেশী' ঔষধ ব্যবহারে এই রোগ আরোগ্য হয়। তখন তিনি উক্ত ঔষধের উপকরণ সংগ্রহের জন্য রওয়ানা হন। সারা দিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঔষধ অনুসন্ধান করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া রাত্রে নিদ্রিত হন। বৈদ্যনাথের কৃপায় ঔষধ কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহা স্বপ্নে দেখিয়া জাগিয়া উঠেন এবং তাহার নিকটেই ঔষধ দেখিতে পান। স্বপ্নে দৃষ্ট লিঙ্গ ও উক্ত লিঙ্গের চতুষ্পার্শ্বে—

মাংসে বঞ্চিত মুণ্ড দেখে শত শত।

তিনি ঐ লিঙ্গ পূজা করিয়া ঔষধ সহ গৃহে ফিরিয়া আসেন এবং উক্ত ঔষধের দ্বারা রোগীকে রোগমুক্ত করেন এবং গৃহে আসিয়া সকল কথা পিতাকে নিবেদন করেন। বৃদ্ধ বৈদ্যের 'রাবণকাহিনী' জানা ছিল, তিনি পুত্র সহ—

সেই মুণ্ড সেই লিঙ্গ সেই তপোবন।

দেখিয়া চিনিতে পারেন এবং প্রত্যহ আসিয়া ভক্তিভাবে বৈদ্যনাথের পূজা করিতে থাকেন।

[৩] মুনিব্রহ্মকাহিনী

সত্য যুগে মুনিব্রহ্ম নামে জনৈক নৃপতি ছিলেন। ইনি বহু তপস্যার ফলে শব্দভেদী শর প্রাপ্ত হন। এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়া ঐ শব্দভেদী শর দ্বারা বেদপাঠরত জনৈক ব্রাহ্মণকে মৃগজ্ঞানে হত্যা করেন। এই পাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রক্তবাত হয়। বশিষ্ঠের নির্দ্দেশে নৃপতি কৌপীন পরিয়া বাল্মীকির তপোবনে গিয়া গঙ্গাস্নানানন্তর গঙ্গাজলে শিবকে স্নান করাইয়া যথারীতি পূজা ও স্তব করেন এবং শিবপদে সেই রাত্রে শুইয়া রহেন। রাত্রে বৈদ্যনাথ স্বপ্নে ঔষধের ব্যবস্থা বলিয়া দেন। স্বপ্নপ্রাপ্ত ব্যবস্থা অনুসরণ করিয়া রাজা ব্যাধি-মুক্ত হন। রাজসঙ্গে তাঁহার রাজ্যের আরও বহু রোগী রোগমুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

[৪] রাজপুত্রকাহিনী

সূর্য্যরাজের যুবক পুত্র ভৃগুমুনির পত্নী সুনন্দার সতীত্ব নাশ করিলে, সেই পাপে তাহার পিত্তশূল, শূল বাত ও রক্তমহাবাত রোগ হয়। বৈদ্যনাথের মহিমা অবগত হইয়া সে রোগ-মুক্তি কামনায় তাঁহার পূজা করিয়া সাত দিন উপবাসী হইয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু বৈদ্যনাথের দয়া হইল না। বৈদ্যনাথের আদেশে পূজারী ব্রাহ্মণেরা তাহাকে তাড়াইয়া দিল। কারণ—

ইহারে দেখিলে হএ ব্রহ্মবধের পাপ।
ইহার শরীরে আছে ব্রাহ্মণীর শাপ॥

[৫] সন্দককাহিনী

বশিষ্ঠ গোত্রে সন্দক নামক জনৈক ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার পত্নীর পরামর্শে তিনি বৈদ্যনাথের যথাবিধি পূজা করিয়া—

দারিদ্র্য না খণ্ডায় যদি প্রভু বিশ্বনাথ।
অপমৃত্যু হইয়া মরিমু তোমার সাক্ষাৎ॥

বলিয়া শুইয়া থাকেন। অবশেষে বৈদ্যনাথের কৃপায় অঙ্গরাজ্যের অধিপতি হন।

[৬ষ্ঠ] অন্ধ ব্রাহ্মণীর কাহিনী

দ্বাপর যুগে নারায়ণীনাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণী এক দিবস অজ্ঞাতে কেশযুক্ত বিল্বপত্রের দ্বারা শিবপূজা করায় দ্বাদশ বৎসরের জন্য অন্ধ হইয়া পড়েন। সেই সময়ে বিশ্বামিত্রের নির্দ্দেশে তাঁহার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী সহ বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হন এবং বৈদ্যনাথকে প্রণাম, স্তুতি ও প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে শয়ন করেন, রাত্রে বৈদ্যনাথ স্বপ্নে কি করিলে আবার চক্ষুষ্মান্ হইতে পারেন, তাহা ব্রাহ্মণীকে বলিয়া দেন।

বাংলা প্রায় মঙ্গলকাব্যের মূলানুসন্ধান করিলে কোন না কোন পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তাহাদের যোগসূত্র আবিষ্কৃত হয়। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। আলোচ্য বৈদ্যনাথমঙ্গলে যে ছয়টি কাহিনী পাইতেছি, তন্মধ্যে প্রথম কাহিনীর সঙ্গে শিবপুরাণান্তর্গত জ্ঞানসংহিতার কোন কোন কাহিনীর আশ্চর্য্য মিল আছে। সম্ভবতঃ কবি জ্ঞানসংহিতোক্ত কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার রাবণকাহিনী রচনা করিয়া থাকিবেন। জ্ঞানসংহিতায় 'বৈদ্যনাথোৎপত্তিবর্ণন' নামক ৫৫ অধ্যায় ও পরবর্ত্তী ৫৬ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত কাহিনীটি আছে:—

একদা ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিত রাক্ষসরাজ রাবণ শিবকে প্রসন্ন করিবার জন্য হিমালয়ে গিয়া ভূতলে গর্ত্ত খনন করিয়া তথায় অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক তন্নিকটে শিবস্থাপন করিয়া বিবিধ হোম করিতে থাকেন। তথাপি শিব প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া নিজ মস্তক ছেদনপূর্ব্বক মহাদেবের পূজা আরম্ভ করেন। ক্রমে নয়টি মস্তক ছিন্ন হইল, একটি মাত্র অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করেন। শিবের বরে রাবণ অতুল বলশালী হন এবং তাঁহার মস্তক পূর্ব্ববৎ সুস্থ হয়। এই শিবই বৈদ্যনাথ নামে লোকে প্রসিদ্ধ আছেন।

> তদা শিরাংসি ছিত্ত্বা স পূজনং শঙ্করস্য চ।
> আরব্ধঞ্চ তদা তেন ছিন্নানি নব বৈ যদা ॥৪
> একস্মিন্নবশিষ্টে তু প্রসন্নঃ শঙ্করস্তদা ॥৫
>
> *　　*　　*
>
> যথেপ্সিতং দদৌ তস্মৈ হ্যতুলং বলমুত্তমম্ ॥৮
> শিরাংসি পূর্ব্ববৎ কৃত্বা নীরুজানি তথা পুনঃ।
>
> *　　*　　*
>
> বৈদ্যনাথেশ্বরো লোকে প্রসিদ্ধো হিতকারকঃ।
> প্রণিপত্যাগতশ্চাহং বিজেতুং ভুবনত্রয়ম্ ॥৩৮
>
> (শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৫৫ অধ্যায়)

শিববরপ্রাপ্ত রাবণের নিকট হইতে সমুদয় কাহিনী অবগত হইয়া নারদ রাবণকে এই যুক্তি দিলেন যে, রাবণ যেন কৈলাস পর্ব্বত উত্তোলনে যত্নবান্ হন। কৈলাস উত্তোলন করিতে পারিলেই তাহার সকল কামনা সিদ্ধ হইবে।

> কৈলাসোদ্ধরণে যত্নঃ কর্ত্তব্যশ্চ ত্বয়া পুরঃ ।৪
> যদি চৈব ধৃতশ্চায়মুচ্চৈশ্চৈব ভবিষ্যতি।
> তদা বৈ সফলং সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৫
> পূর্ব্ববৎ স্থাপয়িত্বা তং পুনরাগচ্ছ বৈ সুখম্।

নারদের যুক্তি অনুসারে রাবণ কৈলাস উত্তোলন করিলে তথাকার সকল বস্তুই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। শিব এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বলদর্পিত রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন যে, তোর গর্ব্বখর্ব্বকারী পুরুষ শীঘ্রই উৎপন্ন হইবে।

পশ্চাচ্ছিবেন শপ্তশ্চ রাবণো বলদর্পিতঃ।
শীঘ্রঞ্চ তব হন্তানাং দর্পঘ্নশ্চ ভবিষ্যতি ॥১০
(শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৫৬ অধ্যায়)

উপরে উদ্ধৃত জ্ঞানসংহিতার কাহিনী লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, এই দুই অধ্যায়ের কাহিনীকে পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া বৈদ্যনাথমঙ্গলের কবি রাবণ-কাহিনী রচনা করিয়াছেন।

বৈদ্যনাথমঙ্গলের ষষ্ঠ কাহিনীতে আছে, কেশযুক্ত বিল্বপত্রের দ্বারা শিবপূজা করায় ব্রাহ্মণী অন্ধ হইয়া পড়েন। চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতুর গল্পে আছে—কীটযুক্ত পুষ্পের দ্বারা শিব-পূজা করায় শিব রুষ্ট হইয়া ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকে অভিশাপ দিয়াছিলেন। উক্ত কাহিনীতে আছে, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে অন্ধ ব্রাহ্মণী সহ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির তপোবনে উপনীত হইয়া বৈদ্যনাথকে প্রণাম ও স্তুতি করিয়াছিলেন। আধুনিক বৈদ্যনাথধামের প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি গণ্ডশৈলোপরি একটি বন বাল্মীকির তপোবন নামে প্রসিদ্ধ। এই বনে এক গুহা আছে, তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত। প্রবাদ, মহাকবি বাল্মীকি ঐ গুহায় বাস করিতেন।

বৈদ্যনাথমঙ্গলের রাবণ-কাহিনীতে হর-গৌরীর কলহের এক চিত্র আছে। অনুরূপ চিত্র মনসামঙ্গলেও পাইতেছি। ক্রুদ্ধা গৌরী পুত্র লম্বোদরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

মহামায়া বোলে পুত্র শুন লম্বোদর।
হস্তে ধরি পুরী হনে বুড়া বার কর ॥
কর্ণ হনে কাড়ি লও কুণ্ডল ভূষণ।
প্রথমে খসাও বুড়ার যোগীর লক্ষণ ॥
* * *
বৃষ নিয়া বেচ পুত্র দেশ দেশান্তর।
বলদ নিয়া রাখ সিংহের মন্দির ॥
ভাঙ্গের ঝুলি কর অগ্নির আহার। ইত্যাদি

শ্রীহট্ট জেলার গয়গড়নিবাসী ষষ্ঠীবর দত্তের পদ্মাপুরাণে অনুরূপ কয়েকটি পংক্তি আছে—

মহামায়া বলে শুন পুত্র লম্বোদর।
হস্ত ধরি বুড়ারে দেশের বার কর ॥
হাত হনে কাড়ি লও ডুমুর ত্রিশূল।
প্রথমে কাড়িয়া লও ধুতুরার ফুল ॥
* * *
বৃষ নিয়া বেচ পুত্র দেশদেশান্তর।
নহে বান্ধি রাখ নিয়া ব্যাঘ্রের মন্দির।
ভাঙ্গের ঝুলি নিয়া কর অগ্নির আহার। ইত্যাদি

উভয় কবিই প্রায় সমসাময়িক। কে কাহার নিকট ঋণী, বলা যায় না। বহুপ্রচলিত কোন ছড়া উভয় কবিই হয় ত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন।

তাৎপর্যাচার্য

শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর

কয়েকখানি ন্যায়বৈশেষিক গ্রন্থে তাৎপর্যাচার্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। আত্মতত্ত্ববিবেকে উদয়নাচার্য, ন্যায়লীলাবতীতে বল্লভাচার্য, খণ্ডনোদ্ধারে দ্বিতীয় বাচস্পতি এবং কণাদরহস্যে শঙ্কর মিশ্র তাঁহার গ্রন্থ হইতে পংক্তি উদ্ধার অথবা আলোচনা করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী এবং মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং তাৎপর্যাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি, এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কাশী সরস্বতীভবন হইতে প্রকাশিত গবেষণা-প্রবন্ধাবলীর[১] তৃতীয় খণ্ডে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় স্বীয় ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের ইতিহাস ও গ্রন্থবিবরণে তাৎপর্যাচার্যকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে দেখিয়াছেন। তাৎপর্যাচার্যের কয়েকটি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ন্যায়বৈশেষিক মতের সহিত সামঞ্জস্যহীন। এই জন্যই কবিরাজ মহাশয় উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার মতে তাৎপর্যাচার্য কাশ্মীরের অধিবাসী হওয়া সম্ভবপর।

বিগত কয়েক বৎসরে ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকার সহিত পূর্বোক্ত গ্রন্থগুলির সংশ্লিষ্ট অংশ নবপ্রকাশিত ব্যাখ্যাগ্রন্থ-সমূহের সাহায্যে আলোচনা করিলে তাৎপর্যটীকাকার এবং তাৎপর্যাচার্য অভিন্ন ব্যক্তি, এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া মনে হইবে।

আমরা এ স্থলে কবিরাজ মহাশয়ের উদ্ধৃত পংক্তিগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিয়া দেখিতে চাই।

আত্মতত্ত্ববিবেকে উদয়নাচার্য অনুমানের স্বতঃপ্রামাণ্য সম্পর্কে তাৎপর্যাচার্যের মত উল্লেখ করিয়াছেন,—

> এককোটিনিয়তো হ্যনুভবো নিশ্চয়ঃ। জ্ঞানতদ্ধর্মগ্রাহিণি চ জ্ঞানে ন দ্বৈতমিতি ব্যবস্থিতিরেব। প্রামাণ্যনিশ্চয়স্তু তস্যাপি পরত এবেতি ন্যায়সম্প্রদায়ঃ। ইত এব বিশেষাত্তাদৃশস্য স্বত এবেতি তাৎপর্যাচার্যাঃ।—আ. ত. বি. সোসাইটি সংস্করণ, পৃ, ৬৯৭-৮।

শঙ্কর মিশ্র উক্ত সন্দর্ভের নিম্নোক্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

> নন্বেবমনুব্যবসায়প্রামাণ্যে স্বতস্ত্বং সমায়াতমিত্যপসিদ্ধান্ত ইত্যত আহ প্রামাণ্যেতি। যদি ব্যসনিতয়া তত্র প্রামাণ্যমনুমীয়তে তদা তৎপ্রামাণ্যমনুমানাদেব গৃহ্যতে ন্যায়নয়ে প্রামাণ্যস্য নিত্যানুমেয়ত্বাদিত্যর্থঃ। নন্বনুমানস্য নিরস্তসমস্তবিভ্রমাশঙ্কস্য স্বত এব প্রামাণ্যমিতি কথং টীকা, কথং বা তবাপি তত্র তাদৃশমেব ব্যাখ্যানমত আহ। ইত এবেতি। তত্রাপি

১। Princess of Wales Sarasvati Bhavana Studies.

স্বতঃ প্রামাণ্যমপ্রামাণ্যশঙ্কানাস্পদত্বং টীকাকৃত্তাৎপর্যবিষয়ো মমাপি তদভিপ্রায়কমেব তত্র তথা ব্যাখ্যানমিত্যর্থঃ ।—আত্মতত্ত্ববিবেককল্পলতা, সোসাইটি-সং, পৃ. ৬৯৮-৯ ।

এ স্থলে শঙ্কর মিশ্রের মতে

'অনুমানস্য নিরস্তসমস্তবিভ্রমাশঙ্কস্য স্বত এব প্রামাণ্যম্'

বাক্যটি কোন টীকাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত টীকাসন্দর্ভ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আত্মতত্ত্ববিবেককার স্বয়ং অনুমানের স্বতঃ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। রঘুনাথ শিরোমণি এবং ভগীরথ ঠক্কুরও উক্ত বাক্যটিকে কোন টীকাগ্রন্থের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়াছেন। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রচলিত ন্যায়সম্প্রদায় অনুসারে অনুমান পরতঃ প্রমাণ।

বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকায় নিম্নোক্ত সন্দর্ভে আমরা শঙ্কর মিশ্রের উল্লিখিত বাক্যটি প্রায় অবিকল উদ্ধৃত দেখিতে পাই,—

অনুমানস্য তু প্রবৃত্তিসামর্থ্যলিঙ্গজন্মনোঽন্যস্য বা **নিরস্তসমস্তব্যভিচারশঙ্কস্য স্বত এব প্রামাণ্য**মনুমেয়াব্যভিচারিলিঙ্গসমুত্থত্বাৎ ।—তা. টী. কলিকাতা-সং, পৃ. ৯ ।

এবং উহার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যপরিশুদ্ধিতে উদয়ন স্পষ্টভাবেই অনুমানের স্বতঃ প্রামাণ্য সম্পর্কে বাচস্পতি মিশ্রের মতের অনুবর্তন করিয়াছেন। তিনি বলেন,—

দ্বিধা হি ব্যভিচারশঙ্কা। কারণতঃ স্বরূপতশ্চ। সা চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্মতাগ্রাহকৈরেব প্রমাণৈরপনীয়ত ইতি ভবতি নিরস্তসমস্তব্যভিচারশঙ্কমনুমিতিজ্ঞানম্। তস্যৈবম্ভূতস্য স্বত এব প্রামাণ্যং নিশ্চীয়ত ইতি শেষঃ ।—ন্যা. বা. তা. প. পৃ. ১১২ ।

তাৎপর্যটীকায় অন্যত্রও অনুমানের স্বতঃ প্রামাণ্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লিখিত হইয়াছে এবং সেখানে উদয়ন অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন[২]।

এ স্থলে দেখা গেল যে, আত্মতত্ত্ববিবেকে যাহা তাৎপর্যাচার্যের মত বলিয়া উল্লিখিত, শঙ্কর ও অন্যান্য ব্যাখ্যাকর্তারা যাহা কোন টীকার অন্তর্গত এবং উদয়নের অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকায় বর্তমান এবং তাৎপর্যপরিশুদ্ধিতে উদয়নাচার্য তাহার ব্যাখ্যা এবং অনুমোদন করিয়াছেন।

খন্দনখণ্ডখাদ্য গ্রন্থে শ্রীহর্ষ সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি সম্পর্কে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের মত উল্লেখপূর্বক বলিয়াছেন,—

ইন্দ্রিয়েণ সামান্যলক্ষণয়া প্রত্যাসত্ত্যা ব্যাপ্তিগ্রহণকালে সর্বাস্তজ্জাতীয়ব্যক্তয়ো গৃহ্যন্তে। যদনভ্যুপগমে যত্তকমুদ্বাহ্য বন্ধ্যায়াঃ পুত্রপ্রার্থনমিবেতি বাচস্পতিরুপালম্ভমবাদীৎ ।—খণ্ডন, কাশী-সং, পৃ. ৩৫৪ ।

২। অনুমানস্য স্বতঃ প্রামাণ্যতয়া......তা. টী., পৃ. ৪ ।

অনুমানস্য ইত্যুপলক্ষণম্। স্বত ইতি চ। তদিতরস্যাপি স্বতঃ পরতশ্চ প্রামাণ্যসিদ্ধেঃ... । পরিশুদ্ধি, পৃ. ৬১ । এ স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বর্ধমান উপাধ্যায় পরিশুদ্ধিপ্রকাশে উক্ত সন্দর্ভের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—স্বত ইতি পরমতাভিপ্রায়ম্। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাচস্পতির মতটি নব্যনৈয়ায়িক সম্প্রদায়ে প্রচলিত হয় নাই।

খণ্ডনোদ্ধার গ্রন্থে দ্বিতীয় বাচস্পতি ন্যায়মতে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের সমালোচনা করিয়াছেন। উদ্ধৃত সন্দর্ভের সমীক্ষাকালে তিনি সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি স্বীকারের পক্ষে তাৎপর্য-টীকাকারের যুক্তির পুনরুল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—

সামান্যলক্ষণায়াং সিদ্ধায়াং সর্বধূমব্যক্তিষু ব্যাপ্তিগ্রহঃ সম্ভবতি। প্রত্যাসত্তিসৌকর্যাদিতি তথৈবোক্তং তাৎপর্যাচার্যৈঃ।—খণ্ডনোদ্ধার, পৃ. ৮১।

সামান্যলক্ষণা প্রত্যাসত্তি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে প্রথম আবিষ্কৃত, এই মতটি বিচারসহ নহে।[৩] উহা বাচস্পতি মিশ্রের তাৎপর্যটীকা এবং ন্যায়কণিকায় উক্ত সর্বোপসংহারক ব্যাপ্তির সঙ্গে কার্যত অভিন্ন। এই প্রসঙ্গে শ্রীহর্ষের পূর্বোদ্ধৃত সন্দর্ভটির সহিত তাৎপর্যটীকার নিম্নোক্ত সন্দর্ভ তুলনীয়,—

তদেতৎ মস্তকমুদ্রাসু বন্ধ্যায়াঃ পুত্রপ্রার্থনমিব। তস্মাদন্তর্বহির্বা সর্বোপসংহারেণাবিনা-ভাবোঽবগন্তব্যঃ।—তা. টী. পৃ. ৪০।

এখানে দেখিতেছি, খণ্ডনোদ্ধারে উল্লিখিত তাৎপর্যাচার্য এবং তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র একই কথা বলিতেছেন।

ন্যায়লীলাবতী গ্রন্থে বল্লভাচার্য দ্বিত্ব প্রভৃতিকে একত্বের ন্যায় স্বতন্ত্র সংখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে গিয়া বিরুদ্ধবাদী ন্যায়ভূষণকার ভাসর্বজ্ঞের মতের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—

তদিদং চিরন্তনবৈশেষিকমতদূষণং ভূষণকারস্যাতিত্রপাকরম্। তদিয়মনায়াত্ততা ভাসর্বজ্ঞস্য যদিয়মাচার্যমপ্যবমন্যতে। তথাচ তদনুযায়িনস্তাৎপর্যাচার্যস্য সিংহনাদঃ সংবিদেব হি ভগবতীত্যাদি।—ন্যায়লীলাবতী, কাশী-সং, পৃ. ৩৫৮।

বৈশেষিকমতে দ্বিত্ব প্রভৃতি একত্বের মত এক একটি স্বতন্ত্র সংখ্যা; উহারা ভূষণকার-স্বীকৃত 'একত্বসমুচ্চয়' অথবা 'অপেক্ষাবুদ্ধিবৈচিত্র্য' মাত্র নহে। ভূষণকার এই বিষয়ে প্রাচীন বৈশেষিকমতে যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। এ বিষয়ে আচার্যকেও অবমাননা করিয়া ভাসর্বজ্ঞ নিজের মূর্খতাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আচার্য-মতানুসারী তাৎপর্যাচার্য সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছেন,—'ভগবতী বুদ্ধিই আমাদের স্বতন্ত্রবস্তু স্বীকারের কারণ'।

বর্তমান সন্দর্ভে 'আচার্য' শব্দ দ্বারা কাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, তাহা বুঝা প্রয়োজন। ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনগ্রন্থে 'আচার্য' শব্দে পরবর্তী কালে উদয়নকে বুঝাইলেও পূর্বে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিই আচার্য নামে অভিহিত হইতেন, এমন নহে। আমাদের মনে হয়, বর্তমান স্থলে আচার্য শব্দ দ্বারা ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকর অভিপ্রেত। বস্তুতঃ তিনি বিশেষ সমীক্ষাপূর্বক ন্যায়বার্তিকে দ্বিত্বাদির স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন,—

যতো ব্যবস্থা তে দ্বিত্বাদয়ঃ।—ন্যা. বা. কলিকাতা-সং, পৃ. ৫০৬।

যঃ পুনরেকত্বং দ্বিত্বাদীংশ্চ ন প্রতিপদ্যতে তস্য ন সমুচ্চয়ঃ ন সমুচ্চয়নিবৃত্তিঃ।—ঐ, পৃ. ৫০৭।

৩। ন্যায়পরিচয়, মহামহোপাধ্যায় ৺ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, পৃ. ১৮৪।

এই প্রসঙ্গে টীকাকার বাচস্পতি বলেন,—

সংবিদেব ভগবতী বস্তূপগমে নঃ শরণম্। সমুচ্চয়াদিবিলক্ষণং দ্বিত্বাস্তবগাহমানা ব্যবস্থাপিকা দ্বিত্বাদীনাম্। তদনুসরণপ্রকারশ্চ যুক্তিবহুলতয়া বার্তিককৃতা কৃত ইতি মন্তব্যম্।—তা. টী. পৃ. ৫০৬।

এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, বল্লভাচার্য্যের গৃহীত তাৎপর্যাচার্যের উক্তি 'সংবিদেব ভগবতী' ইত্যাদি তাৎপর্যটীকার অন্তর্গত। আচার্য উদ্যোতকরের দ্বিত্বাদিসম্পর্কিত প্রসিদ্ধ মতের সমর্থনকল্পে বাচস্পতি মিশ্র উহার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব পরবর্তী বাক্যে উল্লিখিত 'বার্তিককার' উদ্যোতকরই যে 'আচার্য' পদের দ্বারা বল্লভের অভিপ্রেত, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

কণাদরহস্য গ্রন্থে শঙ্কর মিশ্র তাৎপর্যাচার্যের অপর একটি পংক্তি উদ্ধার করিয়াছেন,—

উদ্ভূতরূপবত্ত্বমুদ্ভূতস্পর্শবত্ত্বং চ মিলিতং তন্ত্রমিতি তাৎপর্যাচার্যাঃ।—কণাদরহস্য, কাশী-সং, পৃ. ২৪।

ইহার অভিপ্রায় এই যে, তাৎপর্যাচার্যের মতে দ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূতরূপ এবং উদ্ভূতস্পর্শ উভয়ই কারণ। বিষয়টি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থেও আলোচিত হইয়াছে। সেখানে উহা কোন টীকার মত[৪] এরূপ ইঙ্গিত আছে। কিন্তু বর্তমান তাৎপর্য-টীকায় উক্ত সন্দর্ভটি পাওয়া যাইতেছে না। উহার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্ত ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায় প্রথম আহ্নিকের ৩৮ এবং ৪০ সূত্রের বিষয়ীভূত। কিন্তু সূত্র দুইটির তাৎপর্যটীকা বর্তমান নাই। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, শঙ্কর মিশ্র টীকা বলিতে তাৎপর্যটীকাকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অতএব এ স্থলেও তাৎপর্যাচার্য শব্দের দ্বারা বাচস্পতি মিশ্র অভিপ্রেত, ইহাই সম্ভবপর।

শঙ্কর মিশ্র, দ্বিতীয় বাচস্পতি এবং বল্লভাচার্য তাৎপর্যাচার্যের যে কয়টি সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কোনটি আক্ষরিকভাবে তাৎপর্যটীকায় বর্তমান, কোনটি বা পরম্পরাক্রমে তাৎপর্যটীকা-সংশ্লিষ্ট। অতএব বাচস্পতি মিশ্র ও তাৎপর্যাচার্য অভিন্ন এবং ন্যায়বার্তিকের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাৎপর্যটীকার নামানুসারে বাচস্পতিকে তাৎপর্যাচার্য বলা হইত, ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

৪। তত্ত্বচিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড, কলিকাতা, পৃ. ৭৩০-৭৩৭।

রেবন্ত

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস

সূর্য্যদেবতার অন্যতম পুত্ররূপে রেবন্ত ভারতীয় পৌরাণিক ঐতিহ্যে সুপরিচিত। উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে এই দেবতার মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এঁর জন্মকাহিনী ও পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে নানা পুরাণে কিছু কিছু বিবরণও পাওয়া যায়। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, সূর্য্যপূজার মত রেবন্তপূজার প্রচলন এত অধিক ছিল না এবং তাঁর পিতার তুলনায় রেবন্তের বিষয়ে আলোচনা করবার উপযোগী উপকরণ আমরা পেয়েছি অনেক কম। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে রেবন্তের গুরুত্ব অধিক না হলেও সূর্য্যপূজা ও সৌর ধর্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। তা ছাড়া দুর্গা লক্ষ্মী প্রভৃতি ব্যাপকভাবে উপাসিতা দেবীগণের পূজার সঙ্গে রেবন্তপূজার কিছু কিছু যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মবিবর্ত্তনের ইতিহাসে রেবন্তের স্থান উপেক্ষণীয় নয়।

সম্প্রতি কয়েক জন শ্রদ্ধেয় সুপণ্ডিত লেখক রেবন্ত ও তাঁর পূজা সম্পর্কে কিছু মূল্যবান্ আলোচনা করেছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রারম্ভে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে প্রাচীন বাঙলার ধর্ম্মমত সম্পর্কে ডাঃ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচি মহাশয়ের একটি আলোচনা স্থান পেয়েছে। সেই প্রসঙ্গে রেবন্ত সম্পর্কে তিনি বলেন[১]: "We possess a number of images of Revanta who is described in some of the Puranas as the son of the Sun-god, begotten on Surenu,......he does not seem to have had any popularity in the orthodox Brahmanical circle and belonged to the folk-religion, his cult being an adjunct of Sun-worship." ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায় তাঁর কিছু কাল পূর্ব্বে প্রকাশিত 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে রেবন্ত সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন, তা এই[২]: "পুরাণকাহিনী অনুসারে অশ্বারূঢ় এবং পরিজনসহ মৃগয়াবিহারী রেবন্তদেবতার সঙ্গে সূর্য্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। এই রেবন্তদেবতার কয়েকটি মূর্ত্তি বাংলার নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।...মনে হয়, রেবন্ত আদিতে পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন এবং লোকায়ত জীবনের সঙ্গেই ছিল তাঁহার সম্বন্ধ। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে কোনও সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং অশ্বারূঢ় বলিয়া সূর্য্যের সঙ্গে আত্মীয়তাবদ্ধ হন।" সম্প্রতি বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাঙলার

১। History of Bengal (Dacca University), Vol. I. p. 409।

২। বাঙালীর ইতিহাস (প্রথম সংস্করণ), পৃঃ ৬২৭।

লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে[৩] : "বাংলার প্রাচীন ভাস্কর্য্যের মধ্যে রেবন্ত নামক এক দেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। কতগুলি অর্ব্বাচীন পুরাণের মতে তিনি সূর্য্যের পুত্র। তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তিগত কোনও সঙ্গত অর্থ সংস্কৃত অভিধানে সন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।......অনুমান করা হইয়াছে যে, ইনি বাংলার লৌকিক ধর্ম্ম (folk religion) হইতে ক্রমে অর্ব্বাচীন পুরাণের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন—তাঁহার পূজা সূর্য্যপূজারই অঙ্গ হইয়া গিয়াছে।" দেখা যাচ্ছে যে, একটি বিষয়ে উপরিউক্ত পণ্ডিতগণের পরস্পরের মতের মিল রয়েছে। এঁরা সকলেই মনে করেন যে, রেবন্ত মূলতঃ লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দেবতা এবং পরবর্ত্তী কালে পুরাণকারগণের কৃপায় তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছেন। আলোচনাপ্রসঙ্গে এই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য বিচার আমাদের করে দেখতে হবে।

রেবন্ত বৈদিক দেবতা নন। বৈদিক সাহিত্যে তাঁর কোনও উল্লেখ নেই। ঋগ্বেদে 'রেবতী'নাম্নী এক দেবীর সন্ধান পাওয়া যায় (যথা "...স্বস্তি পথ্যে রেবতি")[৪]। কিন্তু বৈদিক রেবতীর সঙ্গে পরবর্ত্তী কালের রেবন্তের আত্মীয়তার কোনও সূত্রই খুঁজে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে রেবন্তের পূজা ও কাহিনী প্রচলিত হয়েছিল বৈদিক যুগের অনেক পরে। সুতরাং তাঁর সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান করবার প্রশস্ত ক্ষেত্র বেদোত্তর সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্য। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎসংহিতা' গ্রন্থে নানা দেবমূর্ত্তির লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে রেবন্তের উল্লেখ ও নিম্নলিখিত বর্ণনা করেছেন[৫] :

রেবন্তোঽশ্বারূঢ়ো মৃগয়াক্রীড়াদি পরিবারঃ।

ভাস্কর্য্যের দিক্ থেকে বরাহমিহিরের এই বর্ণনার মূল্য সম্পর্কে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। বর্ত্তমানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, বৃহৎসংহিতার রচনাকাল সম্পর্কে আমাদের সুনির্দ্দিষ্ট ধারণা থাকায়, বরাহমিহিরের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রেবন্ত অন্ততঃপক্ষে উত্তর-ভারতের দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থান পেয়েছেন। প্রতিমালক্ষণের আলোচনাপ্রসঙ্গে বরাহমিহির অবশ্য রেবন্তের যে উল্লেখ করেছেন, তা অতি সংক্ষিপ্ত। তাঁর জন্মকাহিনী ও জীবনবৃত্তান্ত সম্পর্কে তিনি নীরব। এ বিষয়ে নানা তথ্য পরিবেশণ করে আমাদের অভাব মিটিয়েছে বিভিন্ন পুরাণ। পৌরাণিক সাহিত্যে রেবন্তকে সূর্য্যপুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে তাঁর মাতৃপরিচয় সর্ব্বত্র এক নয়। কতগুলি পুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে রেবন্ত সূর্য্যপত্নী বিশ্বকর্ম্মার কন্যা সংজ্ঞার গর্ভজাত।[৬]

৩। বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃঃ ৪৯৫।

৪। ঋগ্বেদ, ৫।৫১।১৪।

৫। বৃহৎসংহিতা, ৫৮।৫৬ (কার্ণ-সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩২২)।

৬। বিষ্ণুপুরাণ ৩।২।৭ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ৩৪৭); মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৭৮।২৩; ১০৮।১১ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা-সং, পৃঃ ১১৭, ১৫১); শিবপুরাণ-ধর্ম্মসংহিতা ১১।৬৪ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭৯); স্কন্দপুরাণ,

আবার দুই একটি পুরাণে রেবন্তকে সূর্য্যের অপর এক পত্নী রৈবত নামক রাজার কন্যা রাজ্ঞীর পুত্র বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।[৭] এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পৌরাণিক সাহিত্যে কোথাও কোথাও 'রেবন্ত' নামটির 'রেবত'রূপ পাঠভেদ দেখা যায়। রেবন্ত আর রেবত যে অভিন্ন, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেন না, তাঁদের জন্মবৃত্তান্তে ও মাতৃ-পরিচয়ে অনেকখানি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। রেবন্তের উপরিউক্ত দ্বিতীয় পরিচয়ের নজিরে, কয়েকটি পুরাণের মতে 'রেবত' সূর্য্য ও তাঁর পত্নী রাজ্ঞীর সন্তান।[৮] কালিকাপুরাণের বঙ্গবাসী সংস্করণে 'রেবন্তে'র স্থলে 'রেমন্ত'রূপ অশুদ্ধ পাঠ স্থান পেয়েছে। যাই হোক, এই দেবতার মূল নামটি যে রেবন্ত, এ বিষয়ে বড় একটা সন্দেহ নেই। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে বরাহমিহির এঁকে এই নামেই উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ পুরাণেও এই নামটিই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই প্রাচীন লোকপ্রসিদ্ধ ও বহুলপ্রচারিত নামই গ্রহণ করা হয়েছে।

দুই একটি পুরাণে রাজ্ঞীর পুত্র বলে বর্ণিত হলেও, বিশ্বকর্ম্মা-কন্যা সংজ্ঞার পুত্র হিসাবেই রেবন্ত পৌরাণিক ঐতিহ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ। সূর্য্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে তাঁর জন্ম সম্পর্কে পুরাণে একটি বিস্তারিত আখ্যায়িকা পাওয়া যায়। সংক্ষেপে তা এই : "বিশ্বকর্ম্মাপুত্রী সংজ্ঞার সূর্য্যের সঙ্গে বিবাহ হয়। বৈবস্বত মনু, যম ও যমুনা নামে তাঁদের দুই পুত্র ও এক কন্যা জন্মায়। সূর্য্যের অসাধারণ জ্যোতিঃ সহ্য করা সংজ্ঞার পক্ষে ক্রমশঃ অসম্ভব হয়ে উঠল। তখন তিনি তাঁর নিজদেহ থেকে নিজের এক ছায়া-প্রতীক সৃষ্টি করলেন এবং সেই ছায়াকে সূর্য্যের নিকট রেখে স্বয়ং পিতৃগৃহে পলায়ন করলেন। সূর্য্য কিছু দিন এই চাতুরী বুঝতে পারেননি। সংজ্ঞাভ্রমে তিনি ছায়াকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে তাঁর সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। অবশেষে এক দিন এই ছলনা ধরা পড়ে গেল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সূর্য্য, সংজ্ঞার অন্বেষণে শ্বশুর বিশ্বকর্ম্মার আলয়ে উপস্থিত হলেন। বিশ্বকর্ম্মা জামাতাকে সান্ত্বনয়ে জানান যে, তাঁর প্রচণ্ড তেজ সহ্য করতে না পেরে সংজ্ঞা পালিয়ে তাঁর গৃহে এসেছিলেন ও পরে সেখান থেকে বনে গিয়ে কঠোর তপস্যায় রত আছেন। বিশ্বকর্ম্মা অতঃপর সূর্য্যকে মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করে ভ্রমিযন্ত্রে আরোহণ করিয়ে তাঁর তেজ শাতন করলেন। এই ভাবে সংস্কৃত হয়ে সূর্য্য সংজ্ঞার অনুসন্ধানে নির্গত হলেন। সংজ্ঞা তখন অশ্বিনীমূর্ত্তি ধারণ করে উত্তরকুরু অঞ্চলে বিচরণ করছিলেন। সূর্য্যও অশ্বরূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্ব ও অশ্বিনীরূপে সূর্য্য ও সংজ্ঞার এই

আবন্ত্য খণ্ড, ২।৫৬।৬; প্রভাসখণ্ড ১।১১।২০৬ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০১২ ; সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯১)
কোনও কোনও পুরাণের মতে সংজ্ঞার অপর এক নাম সুরেণু, যথা, ব্রহ্মপুরাণ ৬।২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৩১)।

৭। কূর্ম্মপুরাণ ১।২০।১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭); অগ্নিপুরাণ ২৭৩.৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৪৫)।

৮। লিঙ্গপুরাণ ১।৬৫।৪ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১৪৫); পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড ৮।৩৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬০); সৌরপুরাণ ৩০।২৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৯৬)।

মিলনের ফলে প্রথম অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও পরে রেবন্ত জন্মগ্রহণ করলেন। রেবন্ত জন্মকালেই অশ্বারূঢ়, কবচমণ্ডিত ও ধনুর্ব্বাণ খড়্গ চর্ম্ম প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত ছিলেন।"

রেবন্তের জন্মবিবরণী ছাড়া তাঁর সম্পর্কে আরও দুচারটি তথ্য পৌরাণিক সাহিত্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ডের বর্ণনায় দেখা যায়, রেবন্ত জন্মগ্রহণ করবার পরে তাঁর দুর্দ্দম প্রতাপে বিশ্বভুবন অস্থির হয়ে উঠেছিল। সমগ্র দেবতা ও মানুষকে পরাজিত করে তিনি বিশ্ব জয় করেন। তাঁর শরীরনির্গত বহ্নিদ্বারা চরাচর দগ্ধ হতে থাকে। নিরুপায় দেবগণ অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা তাঁদের শিবের নিকট অভিযোগ জানাতে নির্দ্দেশ দিলেন। সমস্ত ব্যাপার অবগত হয়ে শিব রেবন্তকে আহ্বান করে তাঁকে আদেশ করলেন, তিনি যেন পৃথিবীতে গিয়ে মহাকালবন নামক শিবের অতি প্রিয় স্থানে বাস করেন। মহাকালবনে একটি অতি পবিত্র শিবলিঙ্গ পূর্ব্ব হতেই অবস্থিত ছিল। রেবন্ত শিবের নির্দ্দেশে সেখানে গমন করবার পরে সেই লিঙ্গ 'রেবন্তেশ্বর' নামে জগতে পরিচিত হয়।[৯] উক্ত পুরাণের প্রভাসখণ্ডে রেবন্ত সম্পর্কে আর একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে। তদনুসারে রেবন্ত খড়্গ, ছত্র ও কবচ ধারণ করে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরমুহূর্ত্তেই তিনি পিতার নিকট হতে উত্তম অশ্ব গ্রহণ করে পলায়ন করেন এবং সূর্য্যের পক্ষে সেই অশ্বটি তাঁর পুত্রের নিকট হতে উদ্ধার করা কিছুতেই সম্ভব হল না। তখন সূর্য্য তাঁর দুই অনুচর দণ্ডী ও পিঙ্গলকে রেবন্তের পশ্চাদ্ধাবন করে যে-কোনও ছিদ্রপথে অশ্বটিকে ফিরিয়ে আনতে আদেশ করেন। কিন্তু দণ্ডী ও পিঙ্গল বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ছিদ্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না। এদিকে রেবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে তাঁর জন্মস্থান উত্তরকুরু থেকে মুহূর্ত্তের মধ্যে লক্ষ যোজন পথ অতিক্রম করে দক্ষিণে প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন। দণ্ডী এবং পিঙ্গলও তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছালেন। কিন্তু পথশ্রমে ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও শ্রান্ত হওয়ায় রেবন্ত প্রভাসেই অবস্থান করতে লাগলেন। সেখানে দণ্ডী ও পিঙ্গল সমভিব্যাহারে অশ্বারূঢ় অবস্থায় তিনি (অর্থাৎ তাঁর মূর্ত্তি) প্রতিষ্ঠিত।[১০] প্রভাসখণ্ডে উক্ত কাহিনীপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, রেবন্ত 'রাজ্ঞা ভট্টারক' বা 'রাজভট্টারিক' নামেও সুপরিচিত ছিলেন। তিনি রাজ্ঞীর পুত্র হওয়াতেই নাকি এই নাম দুটির উৎপত্তি। অবশ্য এখানে যে রাজ্ঞীর উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে, তিনি সূর্য্যের অপরা পত্নী রৈবতরাজতনয়া পূর্ব্বকথিতা রাজ্ঞী নন। স্কন্দপুরাণে রেবন্তের জন্ম-প্রসঙ্গে সংজ্ঞাকেই তাঁর মাতা বলিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত পুরাণের মতে সংজ্ঞারই অপর নাম রাজ্ঞী ("যা সংজ্ঞা সা স্মৃতা রাজ্ঞী...")।[১১] সুতরাং রাজ্ঞীপুত্র বলতে এখানে সংজ্ঞার পুত্রই বুঝতে হবে। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন গ্রন্থ দেবীভাগবতে হৈহয়গণের উৎপত্তিপ্রসঙ্গে রেবন্তের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী ও নারায়ণের সাক্ষাৎকারের একটি কাহিনী

৯। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, ২।৫৬ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭২-৭৪)।

১০। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯২-৯৩)।

১১। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১২।১ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩)।

পাওয়া যায়। উক্ত উপাখ্যান অনুসারে একদা রেবন্ত স্বর্গীয় অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে আরোহণ করে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুসমীপে গমন করেন। উচ্চৈঃশ্রবার অতুলনীয় সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়ে লক্ষ্মী একদৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি এতই তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে, বিষ্ণু যখন অশ্বারূঢ় রেবন্তের পরিচয় পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, তখন কোনও উত্তরই দিলেন না। অশ্বের প্রতি তাঁকে এত গভীরভাবে আসক্ত দেখে বিষ্ণু বিষম ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি লক্ষ্মীকে এই মর্ম্মে শাপ দিলেন যে, অশ্বিনীরূপে তাঁকে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে।[১২] পরে অবশ্য শিবানুগ্রহে বিষ্ণু অশ্বরূপ ধারণ করে পৃথিবীতে এসে অশ্বিনীরূপিণী লক্ষ্মীর সঙ্গে মিলিত হন এবং ফলে হৈহয়বংশের প্রতিষ্ঠাতা একবীর বা হৈহয় জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রজন্মের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর শাপমুক্তি ঘটে।

রেবন্তের স্বরূপ ও পূজা সম্পর্কে কোথাও স্বতন্ত্র ও সুসংবদ্ধ আলোচনা দেখা যায় না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে (প্রধানতঃ পৌরাণিক সাহিত্যে) অন্য প্রসঙ্গের আলোচনার মধ্যে এ বিষয়ে যে সব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যায়, সেগুলিকে একত্র করলে মোটামুটি আমরা একটা ধারণা করতে পারি। মর্য্যাদায় রেবন্ত কখনই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান দেবমণ্ডলীর (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদির) সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেননি। তাঁকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন পর্য্যায়ের দেবতা বা 'minor deity' বলাই সঙ্গত। পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁকে গুহ্যকগণের অধিপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা সূর্য্যকর্ত্তৃক ঐ পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন[১৩]—

গুহ্যকাধিপতিত্বে চ রেবন্তোঽপি নিয়োজিতঃ।

স্কন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ডে শিব কর্তৃক রেবন্তকে স্বর্গলোকে গুহ্যকগণের আধিপত্য প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে শিব রেবন্তকে বলছেন[১৪]—

গুহ্যকাধিপতিস্ত্বং চ স্বর্গলোকে ভবিষ্যসি।

আবার উক্ত পুরাণের প্রভাসখণ্ডে সম্ভবতঃ সূর্য্যকর্ত্তৃকই রেবন্তের গুহ্যকাধিপতিত্বে নিয়োগের কথা আছে। সেখানে তাঁর জন্ম, প্রভাসক্ষেত্রে আগমন ও সূর্য্যের নিকট হতে তাঁর বরপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[১৫]—

গুহ্যভট্টারকত্বে চ রেবন্তো বিনিয়োজিতঃ।

তা ছাড়া স্কন্দপুরাণের ঐ খণ্ডের একই অধ্যায়ে সূর্য্য কর্তৃক রেবন্তকে বরদানের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা থেকে রেবন্তের ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমরা কিছু কিছু জানতে পারি। সেখানে রেবন্তের উদ্দেশ্যে সূর্য্যের মুখ দিয়ে যা বলান হয়েছে, তা এই[১৬]—

১২। দেবীভাগবত, ৬।১৭।৪৯-৬১ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ২৫৬)।

১৩। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৭৮।৩০ ; ১০৮।২০ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা-সং, পৃঃ ১১৮, ১৫১)।

১৪। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড, ২।৫৬।২৫ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩)।

১৫। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৫ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩)।

১৬। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৭-১৮ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩)।

অরণ্যে চ মহাদাবে বৈরিদস্যুভয়েষু চ।
ত্বাং স্মরিষ্যন্তি যে মর্ত্যা মোক্ষ্যন্তে তে মহাপদঃ ॥
ক্ষেমবৃদ্ধিং সুখং রাজ্যমারোগ্যং কীর্ত্তিমুন্নতিম্।
নরাণামতিতুষ্টস্ত্বং পূজিতঃ সম্প্রদাস্যসি ॥

বর্ণনা পাঠে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দাবাগ্নি, শত্রু, দস্যু প্রভৃতির ভীতি নিবারণার্থে ত্রাণকর্ত্তারূপে রেবন্তকে অর্চনা করবার প্রথা ছিল। তা ছাড়া তিনি সুখ, কল্যাণ, রাজ্য, আরোগ্য, কীর্ত্তি, উন্নতি প্রভৃতি দান করেন, এই জাতীয় ধারণা তাঁর উপাসকমণ্ডলীর মনে স্থান পেয়েছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও প্রায় অবিকল অনুরূপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।[১৭] শিবপুরাণে রেবন্তকে 'ভিষগ্বর' বা চিকিৎসক বলা হয়েছে, যদিও অন্য কোথাও চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতির উল্লেখ নেই।[১৮] তবে স্কন্দ ও মার্কণ্ডেয়পুরাণদ্বয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রেবন্ত তাঁর ভক্তগণকে আরোগ্য দান করে থাকেন। এর সঙ্গে শিবপুরাণের উক্তির খানিকটা সামঞ্জস্য আছে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে এবং আবন্ত্য খণ্ডে রেবন্তের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। রেবন্ত অশ্বগণের অধিপতি ছিলেন, এবং সমস্ত অশ্বশালাতে বিশেষ করে তাঁর পূজা করার বিধি ছিল। আবন্ত্য খণ্ডে দেখা যায়, শিব রেবন্তকে বলছেন[১৯]—

অশ্বশালাসু সর্ব্বাসু পূজনীয়ো ভবিষ্যসি।
নৃপতীনাং গৃহে চৈব বসিষ্যসি সুপূজিতঃ ॥

প্রভাসখণ্ডে দেখা যায়, সূর্য্য স্বয়ং পুত্র রেবন্তকে অশ্বদের আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত করছেন[২০]—

এবং গচ্ছত্যসৌ যস্মাৎ সংজ্ঞায়াঃ শান্তিদঃ সুতঃ।
অশ্বানামাধিপত্যে তু ভানুনা চ নিয়োজিতঃ ॥

প্রভাসখণ্ডে অন্যত্র প্রভাসক্ষেত্রস্থ রেবন্তমূর্ত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাজা অশ্ববৃদ্ধিমানসে তার আরাধনা করবেন[২১]—

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তমেবারাধয়েন্নৃপঃ।
নির্ব্বিঘ্নং ক্ষেত্রবাসার্থং রাজা বাহবৃদ্ধয়ে ॥

আবন্ত্য খণ্ডে রেবন্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত 'রেবন্তেশ্বর' নামক একটি শিবলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ভক্তিভরে রেবন্তেশ্বরের পূজা করলে অশ্ব, বিজয়, যশ প্রভৃতি লাভ হয়[২২]—

তেষামশ্বা ভবিষ্যন্তি বিজয়ো যশ উর্জ্জিতম্ ॥

১৭। মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০৮।২১-২২ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা-সং, পৃঃ ১৫১)।
১৮। শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ১১।৬৪ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৭৯)।
১৯। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড, ২।৫৬।২৬ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩)।
২০। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২২৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯৩)।
২১। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১৬০।৪ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮৩২)।
২২। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড, ২।৫৬।৩২ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩)।

সুতরাং রেবন্তকে যে বিশেষ করে অশ্বের অধিরক্ষক দেবতা মনে করা হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রেবন্তের পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে যে সামান্য তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তার থেকে এটুকু বুঝা যায় যে, সে পূজার বড় একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল না। কয়েকটি প্রধান দেবদেবীর পূজার অঙ্গরূপেই বেশীর ভাগ সময়ে রেবন্তের অর্চ্চনা করা হত। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে সূর্য্যের সঙ্গে রেবন্তের সম্পর্ক অতি অন্তরঙ্গ। সুতরাং রেবন্তপূজায় যে সূর্য্যপূজা-পদ্ধতির অত্যধিক প্রভাব থাকবে, তা খুবই স্বাভাবিক। কালিকাপুরাণের মতে সূর্য্যপূজা-বিধানের দ্বারাই রেবন্তের পূজা কর্ত্তব্য[২৩]—

এবংবিধন্তু রেমন্তং প্রতিমায়াং ঘটেঽপি বা।
সূর্য্যপূজাবিধানেন পূজয়েত্তোরণান্তরে॥

সুতরাং প্রতিমাকারে বা ঘটে স্থাপন করে, যে ভাবেই রেবন্তের পূজা করা হক না কেন, এই পুরাণমতে তা সূর্য্যপূজার বিধিতেই সম্পাদন করতে হবে। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রস্থ যে রেবন্তমূর্ত্তির উল্লেখ আছে, তার পূজার তিথি দেওয়া হয়েছে রবিবার সপ্তমী[২৪]—

রবিবারেণ সপ্তম্যাং যস্তং পূজয়তে নরঃ।
তস্যান্বয়েঽপি নো দেবি দরিদ্রো জায়তে নরঃ॥

সপ্তমী তিথি, পৌরাণিক সৌর ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং ঐ তিথিতে সূর্য্যকে নানা ভাবে অর্চ্চনা করবার প্রয়োজনীয়তা ও তজ্জনিত পুণ্যের কথা শাস্ত্রে বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে। এই সপ্তমী তিথি উপলক্ষ্যে অনেকগুলি সৌর ব্রত-অনুষ্ঠানের বিধিও পুরাণে এবং স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়।[২৫] সূর্য্যপূজার এই পবিত্র তিথিতে, স্কন্দপুরাণের সাক্ষ্য অনুসারে, রেবন্তপূজা কর্ত্তব্য। সূর্য্যপূজার সঙ্গে রেবন্তপূজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের এও একটি দৃষ্টান্ত। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে রেবন্তের যে জন্মকাহিনী দেওয়া আছে, সেই প্রসঙ্গে তাঁর প্রভাসক্ষেত্রে আগমনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। রেবন্ত উত্তরকুরু থেকে প্রভাসক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলে সূর্য্যের অনুচরদ্বয় দণ্ডী ও পিঙ্গল তাঁকে অনুসরণ করে সেখানে আসেন। রেবন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে প্রভাসে অবস্থান করলেন এবং তাঁর সঙ্গে উক্ত সূর্য্যানুচরদ্বয়ও সেখানেই স্থায়ী হলেন[২৬]—

খিন্নগাত্রস্ততো দেবি প্রভাসে সমবস্থিতঃ।
দণ্ডপিঙ্গলসংযুক্তো হয়ারূঢ়ঃ স তিষ্ঠতি॥

২৩। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৪৯ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪); এই সংস্করণে রেবন্তকে 'রেমন্ত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, পূর্ব্বেই এ কথা বলেছি।

২৪। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১৬০।৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮০২)।

২৫। এই সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৫৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যায় (পৃঃ ২৫-৪৩) প্রকাশিত বর্ত্তমান লেখকের 'ভারতীয় সূর্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৬। স্কন্দপুরাণ, প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯২)।

এখানে যে প্রভাসক্ষেত্রস্থ কোনও রেবন্তের মূর্ত্তির উল্লেখ করা হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই মূর্ত্তি অশ্বারূঢ় ছিল এবং তার সঙ্গে দণ্ডী ও পিঙ্গলের মূর্ত্তিদ্বয় যুক্ত ছিল। সাধারণতঃ সূর্য্যপ্রতিমার উভয় পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গলের মূর্ত্তি স্থাপন করাই রীতি ছিল। দণ্ডী ও পিঙ্গলের মূর্ত্তিসংযুক্ত অসংখ্য সূর্য্যমূর্ত্তির আবিষ্কার, তা উত্তমরূপে প্রমাণ করেছে। শাস্ত্রেও সূর্য্যের দুই পাশে তাঁর এই দুই অনুচরের মূর্ত্তি স্থাপন করবার নির্দ্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত রেবন্তের কোনও মূর্ত্তির সঙ্গে দণ্ডী ও পিঙ্গলের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে বলে আমাদের জানা নেই। প্রভাসক্ষেত্রের উক্ত 'দণ্ডপিঙ্গলসংযুক্ত' রেবন্তমূর্ত্তির বিবরণ পাঠ করে মনে হয়, এখানে সূর্য্যমূর্ত্তির বিশেষত্ব রেবন্তমূর্ত্তিতে আরোপিত হয়েছিল। হয় ত বা সূর্য্যানুচরদ্বয়ের মূর্ত্তিশোভিত এই জাতীয় রেবন্তমূর্ত্তি মাঝে মাঝে নির্ম্মিত হত, যদিও ভাস্কর্য্যের দিক্ থেকে তার কোনও নিদর্শন আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। সূর্য্যপূজা যে কত গভীরভাবে রেবন্তপূজাকে প্রভাবিত করেছিল, প্রভাসক্ষেত্রের দণ্ডপিঙ্গলসংযুক্ত রেবন্তমূর্ত্তির বর্ণনা সম্ভবতঃ আমাদের তা বুঝতে সাহায্য করে। কালিকাপুরাণে দেখা যায় যে, দুর্গাপূজার পরে যে সপ্তদিবসব্যাপী নীরাজন অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তার সপ্তম দিবসে রেবন্তপূজার বিধান দেওয়া হয়েছে[২৭]—

পূর্ব্বোক্তানান্তু দেবানাং সপ্তাহং যাবদুত্তমম্।
সপ্তমেঽহ্নি তু রেমন্তং পূজয়েত্তোরণান্তরে॥

আশ্বিন মাসে সামরিক প্রস্তুতির অঙ্গস্বরূপ সাধারণতঃ এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান পালন করা হত। প্রধানতঃ রাজারা ও সেনাপতিগণ এই ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন। কেন না, এই সময়ই তাঁদের দিগ্বিজয়যাত্রা ইত্যাদির পক্ষে প্রশস্ত কাল। এই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, সৈন্যগণের কুচ্‌কাওয়াজ, যুদ্ধাভিনয় প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হত। তাঁর যুদ্ধাশ্বকে উদ্দেশ্য করে রাজাকে বলতে হত[২৮]—

যেন সত্যেন রেমন্তং যেন সত্যেন ভাস্করম্।
বহসে তেন সত্যেন বিজয়ায় বহস্ব মাম্॥

"যে সত্যের দ্বারা ভাস্কর ও যে সত্যের দ্বারা রেবন্তকে তুমি বহন কর, সেই সত্যের দ্বারা তুমি আমাকেও বহন কর!" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, দুর্গাপূজা ও তৎসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে রেবন্তপূজার পরোক্ষ সংস্রব ছিল, এবং অন্ততঃ কোনও কোনও মতে উপসংহারে রেবন্তপূজানুষ্ঠান না হলে, নীরাজনবিধি অসম্পূর্ণ থাকত। রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্ব' গ্রন্থে (রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ) উল্লেখ করেছেন যে, কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বে দ্বারোপান্তে বিত্তশালী এবং অশ্বের অধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক রেবন্তের পূজা কর্ত্তব্য[২৯]—

২৭। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৪৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪)।
২৮। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৬৬ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৬)।
২৯। তিথিতত্ত্বম্ (অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি,—শ্রীরামপুর-সং, প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৮৭।

দ্বারোপান্তে সুদীপ্তস্ত সংপূজ্যো হব্যবাহনঃ।
যবাক্ষতঘৃতোপেতৈস্তণ্ডুলৈশ্চ সুতর্পিতঃ ॥
সংপূজিতব্যঃ পূর্ণেন্দুঃ পয়সা পায়সেন চ।
স্কন্দঃ সভার্য্যস্কন্দশ্চ তথা নন্দীশ্বরো মুনিঃ ॥
গোমদ্ভিঃ সুরভিঃ পূজ্যা ছাগবদ্ভির্হুতাশনঃ।
উরভ্রবদ্ভির্বরুণো গজবদ্ভির্বিনায়কঃ।
পূজ্যঃ সাশ্বৈশ্চ রেবন্তো যথাবিভববিস্তরৈঃ ॥

সুতরাং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজার সঙ্গেও রেবন্তপূজার পরোক্ষ সংস্রব যে কোনও কোনও মতে স্বীকৃত হত, এ কথা বেশ বুঝা যাচ্ছে। স্কন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ডে উল্লিখিত শিব ও রেবন্তের যোগাযোগের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সেখানে দেখা যায়, শিব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হয়ে রেবন্ত মহাকালবন নামক স্থানে এলেন এবং ঐ স্থানে এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় শিবলিঙ্গ দেখতে পেলেন। তিনি সেই লিঙ্গের অর্চ্চনা করেন এবং উত্তরকালে সেই লিঙ্গ 'রেবন্তেশ্বর' নামে পৃথিবীতে পরিচিত হল। এই কাহিনীর মধ্যে সম্ভবতঃ শিবপূজা ও রেবন্তপূজার সংমিশ্রণের কিছু ইঙ্গিত থাকতে পারে।[৩০] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, অগ্নিপুরাণে নানাপ্রকার দানের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্যে বলা হয়েছে যে, ব্রাহ্মণকে অশ্বারূঢ় রেবন্তের স্বর্ণমূর্ত্তি দান করলে দাতার কখনও মৃত্যু হয় না[৩১]—

রেবন্তাধিষ্ঠিতঞ্চাশ্বং হৈমং দত্ত্বা ন মৃত্যুভাক্ ॥

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুখ্যতঃ সূর্য্যপূজার সঙ্গে ও গৌণতঃ অপর কয়েকটি দেবদেবীর পূজার সঙ্গে রেবন্তপূজার সংযোগ বর্ত্তমান ছিল।

আজ পর্য্যন্ত রেবন্তের যে মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, ভাস্কর্য্যের দিক্ থেকে তার কিছু কিছু আলোচনা অনেকেই করেছেন। পূর্ব্বে রেবন্তের এই মূর্ত্তিগুলিকে বিষ্ণুর কল্কি অবতারের মূর্ত্তি মনে করা হত। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় রেবন্তের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করেছেন, তার উপর ভিত্তি করে মূর্ত্তিগুলিকে রেবন্তের ব'লে প্রথম নির্দ্দিষ্ট করেন বোধ হয় পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।[৩২] রেবন্ত সম্পর্কে বরাহমিহিরের উক্তি পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাঁর মতে 'রেবন্ত অশ্বারূঢ় এবং মৃগয়াক্রীড়াদিযুক্ত পরিবার-সমন্বিত হবেন।' কয়েকটি পুরাণে রেবন্তের স্বতন্ত্র বর্ণনা পাওয়া যায়। সেখানে তাঁকে অশ্বারূঢ়, কবচমণ্ডিত এবং খড়্গ ধনুক তূণ প্রভৃতি অস্ত্রধারিরূপে কল্পনা করা হয়েছে। কালিকাপুরাণের বিবরণ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত[৩৩]—

৩০। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্যখণ্ড, ২।৫৬।২৩-৩২ (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩)।

৩১। অগ্নিপুরাণ, ২১১।১৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৪০০)।

৩২। Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909, pp. 391-92.

৩৩। কালিকাপুরাণ, ৮৫।৪৭-৪৮ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৫৫৪)।

সূর্য্যপুত্রং মহাবাহুং দ্বিভুজং কবচোজ্জ্বলম্।
জ্বলন্তং শুক্লবস্ত্রেণ কেশানুদ্‌গ্রথ্য বাসসা ॥
কশাং বামকরে বিভ্রদ্দক্ষিণং তু করং পুনঃ।
স খড়্গাং ন্যস্ত বামায়াং সিতসৈন্ধবসংস্থিতম্ ॥

এই বর্ণনা অনুসারে, রেবন্ত দ্বিভুজ, কবচমণ্ডিত এবং শুভ্র অশ্বে আরূঢ়; তিনি উজ্জ্বলকান্তি ও তাঁর কেশরাশি শুক্ল বস্ত্রে সংযত; তাঁর বাম হস্তে কশা ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গা। বরাহমিহির ও পুরাণকারগণ রেবন্তকে যে ভাবে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে রেবন্তের এযাবৎ আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। বিহারে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলিতে দেখা যায়, রেবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন এবং তাঁর অনুচরবৃন্দ পদব্রজে তাঁকে অনুগমন করছেন। শেষোক্তগণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ, উভয় শ্রেণীই বিদ্যমান। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মৃদঙ্গ ও করতাল বাজাচ্ছেন। একজন রেবন্তের মস্তকে ছত্র ধারণ করেছেন। দলের সঙ্গে একাধিক কুকুরও চলেছে। দেবতাদের একজন অনুচরের স্কন্ধে সম্ভবতঃ একটি মৃত বরাহ। অপর এক অনুচর সম্মুখস্থ একটি মৃগের প্রতি শরসন্ধান করছেন। অশ্বারোহী দেবতার দক্ষিণ হস্তে একটি পাত্র। পণ্ডিত বিদ্যাবিনোদ অনুমান করেন, এটি সম্ভবতঃ জলপাত্র। রেবন্তের পদদ্বয় আজানু পাদুকা (বুট জুতা) দ্বারা আবৃত। সশস্ত্র অনুচর, কুকুর, বাদ্যভাণ্ড, মৃগ, মৃত বরাহ প্রভৃতি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না যে, শিল্পী সানুচর রেবন্তের মৃগয়ারত মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করেছেন, এবং তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে বরাহমিহিরের পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা। বাঙ্গলা দেশের ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত বড়কামতায় এই জাতীয় একটি রেবন্তমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।[৩৪] দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ঘাটনগর থেকে রেবন্তের যে মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি এর থেকে কিছু ভিন্ন রকমের। এ ক্ষেত্রেও রেবন্ত অশ্বারূঢ় এবং তাঁর পদদ্বয় আজানু পাদুকাবৃত; তাঁর দক্ষিণ হস্তে কশা ও বাম হস্তে অশ্বের বল্‌গা; একজন অনুচর তাঁর মস্তকে ছত্র ধারণ করে আছে। তাঁর সম্মুখে ও পশ্চাতে দুজন দস্যু তাঁকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে; পশ্চাতে দস্যুটি বৃক্ষারূঢ়; তাঁর পদমূলে একটি দণ্ডায়মানা স্ত্রীমূর্ত্তি, একজন ভক্তের মূর্ত্তি ও ঢাল-তরবারিধারী একটি মনুষ্যমূর্ত্তি; তৃতীয় ব্যক্তি বঁটিতে মৎস্যকর্ত্তনরতা এক স্ত্রীলোককে আঘাত করতে উদ্যত। উপরে রেবন্তের সম্মুখে সম্ভবতঃ একটি বাসগৃহ ও তার মধ্যে সম্ভবতঃ একটি দম্পতি।[৩৫] স্কন্দ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণদ্বয়ে রেবন্তকে শত্রু ও দস্যুর হাত থেকে সাধারণের ত্রাণকর্ত্তা বলা হয়েছে, আলোচনা প্রসঙ্গে সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এই মূর্ত্তির নির্ম্মাতা সম্ভবতঃ সেই বর্ণনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই শত্রু ও দস্যুউপদ্রুত গৃহস্থের আশ্রয়স্থলরূপে রেবন্তমূর্ত্তির পরিকল্পনা করেছেন। মৎস্যকর্ত্তনরতা নারী, গৃহমধ্যে অবস্থিত দম্পতি প্রভৃতি একান্ত গার্হস্থ্য চিত্রগুলির ব্যাখ্যা এই ভাবেই করা সম্ভব। এই

৩৪। J. A. S. B. 1909, p. 392; N. K. Bhattasali, Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, p. 177.

৩৫। History of Bengal (Dacca University), Vol. I, pp. 458-59.

মূর্ত্তিটি বর্ত্তমানে রাজশাহী চিত্রশালায় রক্ষিত। সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তিটিকেই স্বর্গীয় নলিনী-কান্ত ভট্টশালী বটুকভৈরবের মূর্ত্তি বলে উল্লেখ করিয়াছিলেন।[৩৬] কিন্তু এ উক্তি যে ভুল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ঐ মূর্ত্তিটির সঙ্গে বটুকভৈরবের কোনও সম্পর্ক নেই। এই প্রসঙ্গে ৺ ভট্টশালী মহাশয়ের আর একটি ভ্রমাত্মক ধারণার কথাও বিচার্য্য। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত কোণার্ক সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রধান দেউলের উত্তর পার্শ্বদেবতারূপে একটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি এখনও বিদ্যমান। ৺ ভট্টশালী মহাশয় এটিকে রেবন্তের মূর্ত্তি বলে নির্দ্দিষ্ট করেছেন।[৩৭] কিন্তু এটি মোটেই রেবন্তমূর্ত্তি নয়, আসলে অশ্বারূঢ় সূর্য্যমূর্ত্তি। সূর্য্যের অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন এই জাতীয় মূর্ত্তি বিরল এবং ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্যে এর নাম হরিদশ্ব। কোণার্কের উল্লিখিত মূর্ত্তিটির শেষোক্ত পরিচয় পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বস্বীকৃত।[৩৮] অগ্নিপুরাণের নিম্নোদ্ধৃত বচনে শিল্পিগণের প্রতি এই ধরণের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবার স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে[৩৯]—

অথবাশ্বসমারূঢ়ঃ কার্য্য একস্তু ভাস্করঃ।

সুতরাং অশ্বারোহী হলেই কোনও দেবমূর্ত্তিকে রেবন্ত বলে চিহ্নিত করা সর্ব্বদা নিরাপদ্ নয়; মূর্ত্তিশিল্পের ক্ষেত্রে রেবন্ত ও হরিদশ্বের পার্থক্য সম্পর্কে আমাদের সচেতন থাকা উচিত।

রেবন্ত পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনার প্রধান বিপদ্ এই যে, রেবন্ত যে সকল গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত ও বর্ণিত হয়েছেন, তার প্রায় কোনটির সঠিক রচনাকাল আমাদের জানা নেই। পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্যে বিষ্ণু, পদ্ম, লিঙ্গ প্রভৃতি পুরাণগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং কালিকাপুরাণ বা দেবীভাগবতের মত অর্ব্বাচীন গ্রন্থের বিস্তারিত বর্ণনার কথা বাদ দিলে, মার্কণ্ডেয় এবং স্কন্দপুরাণদ্বয়ের সাক্ষ্যই এ ক্ষেত্রে বিশেষরূপে বিবেচ্য। স্কন্দ-পুরাণে রেবন্ত সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেলেও, তার দ্বারা রেবন্তোপাসনার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয় না। কেন না, পুরাণগুলির মধ্যে স্কন্দপুরাণ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে রচিত। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণ সম্পর্কে ঠিক এ কথা বলা চলে না। পৌরাণিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণ যে অন্যতম, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই পুরাণে দুই স্থানে, ৭৮ সংখ্যক ও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়দ্বয়ে, রেবন্তপ্রসঙ্গ সন্নিবেশিত হয়েছে। ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়ের বিবরণের সঙ্গে স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত

৩৬। Bhattasali, Iconography p. 174 n ; রেবন্তমূর্ত্তির নিম্নোল্লিখিত চিত্রগুলি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য : J. A. S. B. 1909, Plate XXX ; Bhattasali, Iconography, Plate LXII(a) ; History of Bengal (Dacca University), Vol. I, Plate XVI, 42.

৩৭। Bhattasali, Iconography, p, 176.

৩৮। M. N. Ganguli : Orissa and Her Remains, pp. 448-49 ; নির্মলকুমার বসু : কণারকের বিবরণ, পৃঃ ৭৪।

৩৯। অগ্নিপুরাণ, ৫১।৩ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ১০৩)।

প্রভাসখণ্ডে প্রাপ্ত বর্ণনা যে হুবহু মিলে যায়, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুটি অধ্যায়ের বর্ণনার মধ্যেও বহু সাদৃশ্য আছে, যদিও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়ে আমরা রেবন্তের স্বরূপ সম্পর্কে যে দুটি শ্লোক পাই, ৭৮ সংখ্যক অধ্যায়ে তা নেই।[৪০] একই পুরাণের বিভিন্ন অংশে একটি প্রসঙ্গ প্রায় একই ভাষায় দুই বার উল্লিখিত হতে দেখলে, সহসা সন্দেহ হতে পারে যে, বিষয়টি বোধ করি প্রক্ষিপ্ত। কিন্তু মার্কণ্ডেয় পুরাণের যতগুলি সংস্করণ দেখবার সুযোগ হয়েছে, সবগুলিতেই অবিকল ঐ একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।[৪১] সুতরাং ঐ অংশগুলি মূল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত নয়, এ জাতীয় অনুমান করতেও একটু দ্বিধা হয়। পাশ্চাত্য পুরাণবিদ্ পার্জিটার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বর্ত্তমান মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৪৫ থেকে ৮১ সংখ্যক, এবং ৯৩ থেকে ১৩৬ সংখ্যক অধ্যায়গুলিই মূল গ্রন্থে ছিল। বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি এই মতও প্রকাশ করেছেন যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক।[৪২] রেবন্তসম্পর্কিত তথ্যসমন্বিত অংশগুলি (৭৮ ও ১০৮ সংখ্যক অধ্যায়) পার্জিটারের হিসাব অনুসারে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল গ্রন্থেরই অঙ্গ। যদি মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পার্জিটারের মত গ্রহণ করা যায়, তা হলে আমাদের সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকেই রেবন্ত ভারতীয় ঐতিহ্যে সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁর জন্মকাহিনী, আকৃতি, পোষাক পরিচ্ছদ, বাহন, গুহ্যকাধিপতিত্ব, মাহাত্ম্য প্রভৃতি সব কিছু সম্পর্কেই ঐ সময়ে কতগুলি সুস্পষ্ট সংস্কার চলতি হয়ে গিয়েছিল। বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে রেবন্ত সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তা অতি সংক্ষিপ্ত হলেও গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, আমরা নিশ্চিত জানি যে, বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের লোক। সুতরাং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকেও রেবন্তের সন্দেহাতীত উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে। বরাহমিহির কি ভাবে রেবন্তের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতে হবে, তারও স্পষ্ট নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রমাণিত হচ্ছে যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে রেবন্তের মূর্ত্তিনির্ম্মাণপ্রণালীও বিধিবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, এবং ঐ সময়ে, কি তারও পূর্ব্ব হতে রেবন্তের মূর্ত্তি উত্তরভারতে নির্ম্মিত হত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে রেবন্ত সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী আছে, তার মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর পিতা সূর্য্য কর্ত্তৃক গুহ্যকগণের অধিপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাভারতে দেখা যায়, গুহ্যকগণের অধিপতি কুবের, রেবন্ত নন।[৪৩] বর্ত্তমান মহাভারতে এক লক্ষ শ্লোক থাকায়

৪০। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১০৮।২১-২২ (নিরপেক্ষ ধর্ম্মসভা-সং, পৃঃ ১৫১); স্কন্দপুরাণেও (প্রভাসখণ্ড, ১।১১।২১৭-১৮) এই শ্লোক দুটি আছে এবং এ প্রবন্ধে পূর্ব্বেই সেগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে রেবন্ত শত্রু দস্যু দাবাগ্নি প্রভৃতির হাত থেকে ত্রাণকর্তা ও সুখ কল্যাণ রাজ্য আরোগ্য প্রভৃতির বিতরণকারী রূপে বর্ণিত হয়েছেন।

৪১। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য মার্কণ্ডেয়পুরাণ (বঙ্গবাসী সং) পৃঃ ১২৮, ১৬৪ ; (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সং) পৃঃ ৪১৯-২০, ৫৩৯-৪০ ; (জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-কৃত সং) পৃঃ ৩৯০-৯১, ৫০৩-৪ ; (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, বোম্বাই) পৃঃ ১০৭, ১৩৬-৩৭।

৪২। Pargiter, Markandeya Purana (English translation, Calcutta, 1904), Introduction, pp. iv, xiv.

৪৩। Hopkins-Epic Mythology, p. 147.

একে শতসাহস্রী সংহিতা বলে অভিহিত করা হয়। ২১৪ গুপ্তসংবতে (অর্থাৎ ৫৩৩-৩৪ খ্রীষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ মধ্যভারতের নাগোধ রাজ্যের অন্তর্গত খোহ্‌তে প্রাপ্ত মহারাজ সর্ব্বনাথের তাম্রশাসনে মহাভারতকে লক্ষশ্লোকসম্বলিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্দ্ধে মহাভারত তার বর্ত্তমান আকার লাভ করেছিল, কিন্তু এতে গুহ্যকগণের সম্পর্কে রেবন্তের উল্লেখ মাত্র নেই, অধিকন্তু গুহ্যকগণের অধিনায়কত্ব সম্পর্কে এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্য স্থান পেয়েছে। পার্জিটারের মতানুসারে মার্কণ্ডেয় পুরাণস্থ রেবন্তপ্রসঙ্গের কাল যদি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক ধরা যায়, তা হলে মহাভারতের সাক্ষ্যের সঙ্গে তার সঙ্গতির অভাব সহজেই চোখে পড়ে। লক্ষ্য করবার বিষয়, বরাহমিহির স্বয়ং রেবন্ত সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে উক্তি করেছেন এবং তাঁকে গুহ্যকাধিপতি ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করেননি। বরাহমিহিরও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগের লোক। এই ব্যাপারে চরম মীমাংসায় উপনীত হওয়া বোধ করি, এখন পর্য্যন্ত সম্ভব নয়। তবে কয়েকটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। প্রথমতঃ এরকম হতে পারে যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পার্জিটারের মত ভ্রান্ত এবং এ গ্রন্থ আরও পরবর্ত্তী কালের রচনা। দ্বিতীয়তঃ এও অসম্ভব নয় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে পার্জিটারের অনুমান নির্ভুল, কিন্তু রেবন্ত প্রসঙ্গ মার্কণ্ডেয় পুরাণের মূল গ্রন্থের অংশ নয়, পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত। তৃতীয়তঃ যদি ধরে নেওয়া যায় যে, মার্কণ্ডেয় পুরাণের ও ঐ গ্রন্থস্থ রেবন্তকাহিনীর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরবর্ত্তী নয়, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, রেবন্ত তখনও উত্তরভারতীয় ঐতিহ্যে অল্প পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রাপ্ত কাহিনীগুলি তখনও বহুল প্রচলিত বা সর্ব্বস্বীকৃত হয়নি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে, পূর্ণাঙ্গ মহাভারতের অনুল্লেখ[৪৫] ও প্রায় ঐ একই সময়ে বরাহমিহিরের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ, হয় ত সেই রকমই ইঙ্গিত করে। হয় ত চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ বা তার কাছাকাছি কোনও সময়ে রেবন্তের কাহিনী ও ঐতিহ্যের জন্ম এবং তার পর কয়েক শতাব্দী ধরে রেবন্তের কাহিনী ও পূজা ক্রমশঃ অধিক প্রচারিত ও প্রসারিত হয়ে চলে এবং ক্রমশঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের (পূর্ণাঙ্গ মহাভারত ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা রচিত হওয়ার) বেশ কিছু কাল পরে রেবন্ত উত্তরভারতীয় দেবমণ্ডলীর মধ্যে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেন। রেবন্তপূজার ও রেবন্তসম্পর্কিত ঐতিহ্যের এই ক্রমপরিবর্ত্তনের ফলে ধীরে

৪৪। Fleet : Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 137.

৪৫। অবশ্য আমার এই উক্তিও অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। বর্ত্তমান প্রচলিত মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের মধ্যে রেবন্তের অনুল্লেখ দেখে জোর করে এ কথা বলা চলে না যে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্দ্ধেও মহাভারতের লক্ষ শ্লোকের মধ্যে রেবন্তের উল্লেখ ছিল না। এখনকার মহাভারতের সঙ্গে তখনকার মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা সমান হলেও, বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দুইএর মধ্যে কিছু কিছু গরমিল থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। বর্ত্তমান প্রচলিত মহাভারতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আমি অনুমান করেছি মাত্র যে, ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ণাঙ্গ মহাভারতে সম্ভবতঃ রেবন্তের উল্লেখ ছিল না।

ধীরে এই দেবতা সম্পর্কে কিছু কিছু কাহিনী ও কিংবদন্তী পল্লবিত আকারে পরবর্ত্তী সাহিত্যে স্থান পায়। বর্ত্তমানে রেবন্ত সম্পর্কে আমরা যা জানি, তাতে রেবন্তের পূজা ও ঐতিহ্যের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলা যায় না। উপরে যে তিনটি আনুমানিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে তৃতীয় বা সর্ব্বশেষটিকেই এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বাধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়, যদিও এর অনেকখানিই কেবলমাত্র অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে একে এই বিষয়ে শেষ কথা বলে স্বীকার করা চলে না।

প্রবন্ধের আরম্ভে যে সকল শ্রদ্ধেয় পণ্ডিতের মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছিল, উপসংহারে তাঁদের সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে দুএকটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমেই দেখা যাবে যে, রেবন্তের পূজা বা ঐতিহ্যসম্পর্কিত বিবরণ কেবলমাত্র কতগুলি অর্ব্বাচীন পুরাণের মধ্যে আবদ্ধ নয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে রচিত) বা বরাহমিহিরের বৃহৎ-সংহিতাকে (সুনিশ্চিত রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক) ঠিক অর্ব্বাচীন আখ্যা দেওয়া চলে না। রেবন্ত মূলতঃ লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দেবতা ও পরবর্ত্তী কালে তাঁর পূজা সূর্য্যপূজার অঙ্গবিশেষে পরিণত হয়েছে, এই মতও শেষ পর্য্যন্ত বিচারসহ কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। অন্যত্র প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমি দেখিয়েছি যে, ভারতীয় সূর্য্যপূজার ইতিহাসে প্রধানতঃ তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) লৌকিক (মূলতঃ আর্য্যেতর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত) ধারা; (২) বৈদিক ও (৩) বিদেশাগত ইরাণীয় বা পারসীক।[৪৬] রেবন্ত সম্পর্কে শিল্পগত এবং আরও খুঁটিনাটি দুই একটি প্রমাণ আলোচনা করে আমার ধারণা হয়েছে যে, ভারতীয় সূর্য্যপূজার বিদেশী ইরাণীয় অধ্যায়ের সঙ্গেই রেবন্তের যোগসূত্র সর্ব্বাধিক ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারা থেকেই রেবন্তপরিকল্পনার উৎপত্তি। সাধারণতঃ রেবন্তের যে মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গিয়েছে এবং শাস্ত্রে রেবন্তমূর্ত্তির যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে। শাস্ত্রোক্ত বর্ণনায় রেবন্তকে অশ্বারূঢ়, কবচমণ্ডিত, খড়্গ চর্ম্ম ধনুক তূণ প্রভৃতি অস্ত্রে সুসজ্জিত বলা হয়েছে। আবিষ্কৃত রেবন্তমূর্ত্তিগুলিও প্রত্যেকটি অশ্বারূঢ় এবং তাদের পদদ্বয় আজানু-পাদুকা (top-boot) দ্বারা আচ্ছাদিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেবন্তমূর্ত্তির সঙ্গে ছত্রধারী ও সশস্ত্র অনুচরসমূহের মূর্ত্তিও উৎকীর্ণ দেখা যায়। শাস্ত্র-বর্ণনা ও প্রাপ্ত মূর্ত্তির লক্ষণ একত্র করলে রেবন্তের পোষাক-পরিচ্ছদ যা দাঁড়ায়, প্রাচীন ভারতের মূর্ত্তিতত্ত্বের আচার্য্যেরা তার নাম দিয়েছেন উদীচ্যবেশ বা উত্তরাঞ্চলবাসীর পোষাক। বরাহমিহির সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে সূর্য্যকে উদীচ্যবেশে ভূষিত করবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন[৪৭]—

নাসাললাটজঙ্ঘোরুগণ্ডবক্ষাংসি চোন্নতানি রবেঃ।
কুর্য্যাদুদীচ্যবেশং গূঢ়ং পাদাদুরো যাবৎ॥

দ্বিতীয় পংক্তিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সূর্য্যমূর্ত্তিকে উদীচ্যবেশে সজ্জিত করতে হবে

৪৬। 'ভারতের সৌরধর্ম্ম' ভারত-সংস্কৃতি (ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার-জয়ন্তীস্মারক গ্রন্থ), পৃঃ ২২২-৫৯।

৪৭। বৃহৎসংহিতা, ৫৮।৪৬ (কার্ণ-সম্পাদিত সং, পৃঃ ৩২০)।

এবং তাঁর পদদ্বয় হতে বক্ষদেশ পর্য্যন্ত আবৃত থাকবে। এখানে প্রচ্ছন্নভাবে উত্তরভারতে প্রচলিত সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় আজানু-পাদুকা (top-boot) দ্বারা আবৃত করবার ও বক্ষোদেশ কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত করবার অভ্যাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। উত্তরভারতে এই প্রকার উদীচ্যবেশে সজ্জিত সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন পারস্য থেকে এদেশে আগত ম্যাজাই (Magi) সৌর-পুরোহিতগণ। ভারতীয় ঐতিহ্যে এঁরা মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। এঁদের প্রভাবে উত্তরভারতে নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তিতে প্রধানতঃ তিনটি বহিরাগত বিশেষত্ব দেখা দিয়েছিল, যথা—(১) সূর্য্যমূর্ত্তির বক্ষঃস্থল কবচাবৃত করা; (২) সূর্য্যমূর্ত্তির জানু পর্য্যন্ত পাদুকা (বা top-boot) দ্বারা আচ্ছাদিত করা; (৩) সূর্য্যমূর্ত্তির কটিদেশে 'অভ্যঙ্গ' (পারসীক 'আইওয়ানঘ্') নামক মূলতঃ পারসীক ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত কোমরবন্ধ পরিবেষ্টিত করা। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক থেকে সুরু করে মধ্যযুগের আরম্ভ পর্য্যন্ত এই জাতীয় বুটজুতা-পরিহিত অভ্যঙ্গধারী ও কবচমণ্ডিত সূর্য্যমূর্ত্তির উত্তরভারতে খুবই বেশী প্রচলন ছিল। আধুনিক আবিষ্কার তা উত্তমরূপে প্রমাণ করেছে। দক্ষিণভারতে মগ-ব্রাহ্মণগণের প্রভাব সম্ভবতঃ খুব বেশী ব্যাপ্ত হয়নি বলেই প্রাচীন দক্ষিণ-ভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তিতে সাধারণতঃ এই সকল বিশেষত্ব দেখা যায় না। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা ছাড়াও উত্তরভারতীয় কোনও কোনও প্রাচীন গ্রন্থে সূর্য্য-মূর্ত্তিকে উদীচ্যবেশে সজ্জিত করবার প্রথার প্রতি ইঙ্গিত আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়।[৪৮] কিন্তু পরবর্ত্তী কালে দেখা যায় যে, উত্তরভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তির এই বৈশিষ্ট্যগুলি শিল্পীরা যদিও রক্ষা করে চলেছেন, তবুও আগেকার মত সুস্পষ্টভাবে নয়। প্রকাশ্যে সূর্য্যমূর্ত্তির পায়ে পাদুকা না পরিয়ে তাঁরা সূর্য্যমূর্ত্তির পা দুখানিকে পরের যুগে অধিকাংশ সময়ে প্রায় অখোদিত অবস্থায় রেখে দিতেন বা অনেক সময়ে পাদপীঠের সঙ্গে মিশিয়ে দিতেন। সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় প্রকাশ্যে উৎকীর্ণ করতে পরবর্ত্তী শিল্পিগণের অনিচ্ছা, পূর্ব্ববর্ত্তী কালে প্রচলিত সূর্য্যমূর্ত্তিকে আজানু পাদুকাবৃত করবার প্রথারই রূপান্তর মাত্র। পরবর্ত্তী কালে রচিত গ্রন্থাদিতেও এই শিল্পদৃষ্টি পরিবর্ত্তনের পরিচয় আছে। বরাহমিহির যে রকম সুস্পষ্ট ভাষায় সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় আবৃত করবার নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন, উত্তরকালের আচার্য্যেরা তেমন কিছুই বলেননি। তাঁরা শিল্পিগণকে সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় খোদাই করতেই নিষেধ করেছেন। মৎস্য ও পদ্মপুরাণদ্বয়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, সূর্য্যের পদদ্বয় তাঁর তেজোরাশির দ্বারাই আবৃত থাকবে, এবং যে শিল্পী তা খোদাই করতে সাহস করবেন, তিনি তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হবেন—[৪৯]

যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি নিন্দিতাম্।
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখসংযুতঃ॥

৪৮। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, ৩।৬৭।১-১৭।

৪৯। মৎস্যপুরাণ, ১১।৩২ (জীবানন্দ বিদ্যাসাগরকৃত সং, পৃঃ ৯৯); পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড। ৮।৪২ (বঙ্গবাসী সং, পৃঃ ৬২)।

পরবর্ত্তী কালে ভারতীয় শিল্পিগণ স্পষ্টভাবে বিদেশী ঐতিহ্যকে স্বীকার ও অনুসরণ করতে সম্ভবতঃ দ্বিধা করতেন বলেই, এই প্রচ্ছন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। এ ছাড়াও সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় পাদুকাবৃত করবার বিদেশী প্রথার প্রতি ইঙ্গিত প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অন্যত্রও দেখা যায়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে জমদগ্নি ও তাঁর পত্নী রেণুকার উপাখ্যানপ্রসঙ্গে দেখা যায় যে, প্রখর সূর্য্যকিরণে রেণুকা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লে জমদগ্নি শরনিক্ষেপে সূর্য্যকে ধ্বংস করতে উদ্যত হন। সূর্য্য তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্য রেণুকাকে সূর্য্যতাপ নিবারণার্থে একটি ছত্র ও একজোড়া চর্ম্মপাদুকা প্রদান করেন। সেই হতে পৃথিবীতে ছত্র ও চর্ম্মপাদুকার প্রচলন হয়।[৫০] বরাহপুরাণে রাজা মিথি ও তাঁর পত্নী রূপবতী সম্পর্কে যে উপাখ্যান পাওয়া যায়, তাতেও প্রায় একই কথা বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও রূপবতী সূর্য্যতেজে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়ায় সূর্য্য রাজদম্পতীকে তুষ্ট করবার জন্য তাঁদের ছত্র ও পাদুকা দান করেছিলেন।[৫১] এই দুটি উপাখ্যানেরই মূল বক্তব্য এক; দুটিতেই সূর্য্যকে পৃথিবীতে ছত্র ও পাদুকার প্রবর্ত্তকরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। উত্তরভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তির পূর্ব্বোল্লিখিত বিশেষত্বের কথা মনে রাখলে এবং বরাহমিহির ও পরবর্ত্তী লেখকগণ-কথিত সূর্য্যের উদীচ্যবেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কাহিনী দুটি পাঠ করলে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না যে, দুই ক্ষেত্রেই সূর্য্যকর্ত্তৃক পৃথিবীতে পাদুকা পরিধান প্রবর্ত্তন করবার বিবরণের মধ্যে উত্তরভারতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সূর্য্যমূর্ত্তিকে পাদুকা-শোভিত করবার প্রথা আনয়ন ব্যাপারের স্পষ্ট ইঙ্গিত বর্ত্তমান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা চলে যে, স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সূর্য্যপূজা উপলক্ষ্যে অপরাপর বস্তুর মধ্যে ছত্র এবং পাদুকা দানের বিধান দেওয়া হয়েছে[৫২]—

ধেনুং তিলময়ীং দত্বাদস্মিন্ ক্ষেত্রে চ ভারত।
উপানহৌ চ ছত্রঞ্চ শীতত্রাণাদিকং তথা॥

বর্ত্তমান আলোচনার ধারার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এই উক্তির গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, ইরাণীয় কায়দায় পাদুকা সর্ব্বদা কেবলমাত্র সূর্য্যমূর্ত্তিকেই যে পরানো হত, তা নয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সূর্য্যমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বস্থ অনুচর এবং অনুচরীগণও মোটামোটি উদীচ্যবেশে সজ্জিত হতেন এবং তাঁদের চরণও পাদুকাবৃত করা হত। সুতরাং উত্তরভারতের সৌরভাস্কর্য্যে পারসীক প্রভাব যে দূরপ্রসারী হয়েছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কবচমণ্ডিত ও সশস্ত্র রেবন্তের বর্ণনা পাঠ করলে ও আজানু বুটপরিহিত রেবন্তের আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি মন দিয়ে লক্ষ্য করলে বুঝতে বাকী থাকে না যে, সূর্য্যপূজা ও সৌরভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে যে বিদেশী ইরাণীয় ঐতিহ্যের প্রভাব উত্তরভারতে এত স্থায়ী ও গভীর হয়েছিল, রেবন্তের পরিকল্পনাতে ও মূর্ত্তিগঠনে সেই একই প্রভাব কার্য্যকরী

৫০। মহাভারত, ১৩।৯৫।১-২৮; ১৩।৯৬।১-২২।
৫১। বরাহপুরাণ, ২০৮।২৫-৯০ (বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা-সং, পৃঃ ১১৮৬-৯৩)।
৫২। স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ।২।১৩।৭৪ (বঙ্গবাসী সং, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮১২)।

হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মহাভারতে সূর্য্যপুত্র কর্ণের যে জন্মবিবরণ আছে, তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সর্ব্বপ্রথম এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন অধ্যাপক ডা: জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।[৫৩] রেবন্ত যেমন অশ্বারূঢ়, সশস্ত্র ও কবচাবৃত হয়ে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হন, তেমনি কর্ণও কবচমণ্ডিত ও কুণ্ডলশোভিত অবস্থায় মাতা কুন্তীর গর্ভ হতে প্রসূত হয়েছিলেন[৫৪]—

আমুক্তকবচঃ শ্রীমান্ দেবগর্ভঃ শ্রিয়ান্বিতঃ।
সহজং কবচং বিভ্রৎ কুণ্ডলোদ্দ্যোতিতাননঃ॥
অজায়ত সুতঃ কর্ণঃ সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতঃ॥

রেবন্তের মত কবচমণ্ডিত কর্ণের জন্মকালীন বর্ণনায় সূর্য্যমূর্ত্তিকে কবচমণ্ডিত করবার পারসীক ধারা প্রভাব বিস্তার করেছে, এতে কোনও সন্দেহ নেই। সূর্য্যের দুই পুত্রের উপরেই এই প্রভাব সঞ্চারিত হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং সমস্ত সাক্ষ্য একত্র করে নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখলে মনে হয়, এখন পর্য্যন্ত আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে রেবন্তকে ভারতীয় সূর্য্যপূজা ও সৌরধর্ম্মের বিদেশী ইরাণীয় ধারার সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত। এই প্রসঙ্গে স্মরণে রাখা যেতে পারে যে, শিবপুরাণে রেবন্তকে 'ভিষগ্‌বর' বা চিকিৎসক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দপুরাণদ্বয়ে রেবন্তের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যান উপলক্ষ্যে বলা হয়েছে, রেবন্ত তাঁর ভক্তবৃন্দকে আরোগ্য দান করে থাকেন। এর মধ্যে অন্তত মার্কণ্ডেয় পুরাণের উক্তি যে খুবই প্রাচীন, আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই তা বলেছি। বিদেশী মগ পুরোহিতগণের প্রভাবে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতক থেকে সূর্য্যকে রোগ-চিকিৎসক হিসাবে বিশেষভাবে উপাসনা করবার রীতি উত্তরভারতে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিত লিপি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।[৫৫] অন্ততঃ মার্কণ্ডেয়পুরাণের (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক ?) নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, এই বৈশিষ্ট্য রেবন্তের উপরও আরোপিত হত। স্কন্দপুরাণ ও শিবপুরাণের উক্তি মার্কণ্ডেয় পুরাণকে সমর্থন করে। সূর্য্যের সঙ্গে রেবন্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পটভূমিকায়, এই পৌরাণিক সাক্ষ্যসমূহ আলোচনা করলেও স্বভাবতঃ এ অনুমান মনে আসে যে, পারসীক-প্রভাবান্বিত উত্তরভারতের সূর্য্যপূজা ও রেবন্তপূজা সমগোত্রীয়। এই প্রসঙ্গে আরও মনে রাখা দরকার যে, স্কন্দপুরাণের আবন্ত্যখণ্ডে অবন্তীকে (পূর্ব্ব ও পশ্চিম মালোয়া) এবং প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রকে (কাথিওয়াড়) রেবন্তপূজার কেন্দ্র বলে প্রচ্ছন্নভাবে ইঙ্গিত

৫৩। 'Surya' নামক তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। এর পাণ্ডুলিপি তিনি আমায় ব্যবহার করতে দেওয়ায় আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। প্রবন্ধটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

৫৪। মহাভারত, ১।১১১।১৮-১৯।

৫৫। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৫৭শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যায় (পৃঃ ২৫-৪৩) প্রকাশিত বর্ত্তমান লেখকের 'ভারতীয় সূর্য্যপূজার একটি বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

করা হয়েছে। প্রভাসখণ্ডের দুই স্থানে প্রভাসে প্রতিষ্ঠিত রেবন্তমূর্ত্তির স্পষ্ট উল্লেখ ও তার মাহাত্ম্যবর্ণনা স্থান পেয়েছে।[৫৬] মার্কণ্ডেয় পুরাণের মত এত প্রাচীন গ্রন্থ না হলেও, স্কন্দপুরাণ এ বিষয়ে যে উক্তি করেছে, তা নির্ভরের একেবারে অযোগ্য নয়। দেখা যাচ্ছে, এই পুরাণ উত্তরভারতের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অর্থাৎ কাথিওয়াড় গুজরাট মালোয়া প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে প্রধানতঃ রেবন্তপূজাকে যুক্ত করেছে। মগ ব্রাহ্মণগণ ইরাণ থেকে এ দেশে আগমন করবার সময়ে সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম ও পশ্চিম সীমান্তেই পদার্পণ করেন এবং স্বভাবতঃ এই সকল অঞ্চলই প্রথম তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ভবিষ্যপুরাণোক্ত উপাখ্যান অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণপুত্র শাম্ব সর্ব্বপ্রথম তাঁদের ভারতবর্ষে আনয়ন করেন এবং সিন্ধুপ্রদেশের মূলতানে (প্রাচীন মূলস্থানপুর) সূর্য্যমন্দির নির্ম্মাণ করে সেখানে তাঁদের সৌরপুরোহিত নিযুক্ত করেন।[৫৭] ক্রমে তাঁদের প্রভাব উত্তরভারতের অন্যত্রও প্রসারিত হয়। উত্তরভারতের পশ্চিমাঞ্চল তাঁদের আদি কর্ম্মভূমি বলে এই অঞ্চলে তাঁদের প্রভাব বরাবর খুবই বেশী ও শক্তিশালী ছিল। এঁদের প্রভাব ক্রমপ্রসারিত হওয়ার ফলে বিভিন্ন স্থানে নূতন সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং সূর্য্যপূজার নব নব কেন্দ্রসমূহ স্থাপিত হতে থাকে। সৌরধর্ম্মের এই নূতন কেন্দ্রসকল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে পৌরাণিক সাহিত্যে শাম্বোপাখ্যানের বিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। যখনই একটি নূতন কোনও স্থানে সূর্য্যমন্দির নির্ম্মিত হত, তখন প্রায় সর্ব্বদা শাম্বোপাখ্যানকে স্থানকালের উপযোগী নূতন রূপ দেওয়া হত এবং দেখাবার চেষ্টা করা হত যে, শাম্ব সর্ব্বপ্রথম ঐ স্থানেই সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা করেন এবং ঐ স্থানের সূর্য্যমন্দিরটিই শাম্বপ্রতিষ্ঠিত আদি সূর্য্যমন্দির। এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে পৌরাণিক সাহিত্যে মথুরা কাশী উড়িষ্যা প্রদেশস্থ কোণার্ক প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে শাম্বোপাখ্যানকে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা দেখা যায়। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডে প্রভাসক্ষেত্রের সঙ্গে শাম্বোপাখ্যানকে সুস্পষ্টভাবে জড়িত করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, মিত্রবন, মুণ্ডীর এবং প্রভাসক্ষেত্র, এই তিনটি স্থানে শাম্বকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সূর্য্য অবস্থান করছেন এবং প্রভাসক্ষেত্রস্থ শাম্বপুর সূর্য্যের দ্বিতীয় শাশ্বত বাসস্থান। শাম্ব যে এখানে সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করেছিলেন, এ কথাও প্রভাসখণ্ডে স্পষ্ট বলা হয়েছে[৫৮]—

সাম্বাদিত্যং সুরশ্রেষ্ঠে যঃ সাম্বেন প্রতিষ্ঠিতঃ।
স্থানানি ত্রীণি দেবস্য দ্বীপেঽস্মিন্ ভাস্করস্য তু॥

৫৬। স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য খণ্ড।২।৫৬।২৩-২৬ মহাকালবনে রেবন্তের অধিষ্ঠান ও রেবন্তেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিবরণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। ঐ পুরাণ, প্রভাস খণ্ড।১।১১।২১৩ এবং প্রভাস খণ্ড।১।১৬০।১-২, প্রভাস ক্ষেত্রে অবস্থিত রেবন্তমূর্ত্তি সম্পর্কে দ্রষ্টব্য। (বঙ্গবাসী সং, পঞ্চম ভাগ, পৃঃ ৩০৭৩ ; সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৫৯২, ৪৮৩২ দ্রষ্টব্য)।

৫৭। ভবিষ্যপুরাণ, ব্রাহ্ম পর্ব্ব, অধ্যায় ১২৭ থেকে ১৪৯ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস সং, পৃঃ ১১৩-৩৩)।

৫৮। স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ড।১।১০০।২-৪ ; প্রভাস খণ্ড।১।১০১।৪৫-৪৬ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৭৫৭, ৪৭৬০)।

পূর্ব্বং মিত্রবনং নাম তথা মুণ্ডীরমুচ্যতে।
প্রভাসক্ষেত্রমাস্থায় সাম্বাদিত্যস্তৃতীয়কঃ॥
তস্মিন্ ক্ষেত্রে মহাদেবি পুরং যৎ সাম্বসংজ্ঞকম্।
দ্বিতীয়ং শাশ্বতং স্থানং তত্র সূর্য্যস্য নিত্যশঃ॥

প্রভাসক্ষেত্রমগমৎ সর্ব্বপাতকনাশনম্।
এবং তৎক্ষেত্রমাসাদ্য তপস্তেপে সুদারুণম্॥
প্রতিষ্ঠাপ্য সহস্রাংশুং দেবং পাপনিসূদনম্।
ততশ্চারাধয়ামাস পরং নিয়মমাশ্রিতঃ॥

যদিও এই প্রসঙ্গে মগ-ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ নেই, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। মগ-ব্রাহ্মণগণের প্রচারিত সূর্য্যোপাসনার নূতন অধ্যায় ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বস্বীকৃত হয়ে যাবার পরে এই ব্যাপারে উক্ত বিদেশী সৌরপুরোহিতবর্গের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও কৃতিত্ব অস্বীকার করবার একটা প্রচেষ্টা স্বভাবতঃই গোঁড়া ভারতীয় ব্রাহ্মণসমাজে দেখা দিয়েছিল। ফলে শাম্বোপাখ্যানের অধিকাংশ পরবর্ত্তী বিবরণে মগ পুরোহিতগণের উল্লেখ নেই। কিন্তু তার জন্য আমাদের বক্তব্য প্রমাণে কিছু অসুবিধা হয় না। প্রভাসক্ষেত্র যে পারসীক প্রভাবান্বিত সৌর ধর্ম্মের একটি বড় কেন্দ্র ছিল, পুরাণকার কর্ত্তৃক শাম্বোপাখ্যানকে এর সঙ্গে যুক্ত করবার প্রয়াসই তার অন্যতম প্রমাণ। গুজরাট ও কাথিওয়াড় অঞ্চলে আবিষ্কৃত বহু সূর্য্যমূর্ত্তি (উদীচ্যবেশে সজ্জিত) এবং সূর্য্যমন্দিরের ধ্বংসাবশেষও এই অঞ্চলে মগব্রাহ্মণগণ-প্রবর্ত্তিত সূর্য্যপূজার ব্যাপক অতীত প্রভাবের পরিচয় দেয়।[৫৯] সুতরাং প্রভাসক্ষেত্র ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের সঙ্গে রেবন্তপূজার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিবরণ যে অনেক পরিমাণে মগপুরোহিতগণ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত সূর্য্যপূজার ইরাণীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে রেবন্তপূজার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইঙ্গিত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাথিওয়াড় অঞ্চলে রেবন্তপূজা সুপ্রচলিত থাকার প্রমাণ আরও পাওয়া যায় জুনাগড়ের অন্তর্গত বন্থলি নামক মহলে প্রাপ্ত ১২৯০ খৃষ্টাব্দের একখানি খোদিত লিপিতে। এই লিপি অনুসারে যুদ্ধে নিহত হরিপাল নামক জনৈক ব্যক্তির ভ্রাতা হরিপালের মূর্ত্তিযুক্ত একটি রণস্তম্ভ এবং সূর্য্যপুত্র রেবন্তের মূর্ত্তির সম্মুখে একটি মণ্ডপ নির্ম্মাণ করেছিলেন ("সহস্রধাম্নস্তনয়স্য জন্মনঃ শ্রীরেবন্তনাম্নঃ পুরতো নবীনম্ অচীকরন্মণ্ডপমদ্বিতীয়মহো মহাসাধনিকঃ স এষ")। লিপিখানির আরম্ভেও রেবন্তকে প্রণাম জানানো হয়েছে ("ওঁ শ্রীরেবন্তায় নমঃ")।[৬০] পূর্ব্বালোচিত সাক্ষ্যসমূহের সহিত মিলিয়ে গ্রহণ করলে এই খোদিত লিপিখানির সাক্ষ্য রেবন্তের গোত্রনির্ণয় সম্পর্কে আমাদের অনুমানকে বলবত্তর করে।

৫৯। H. D. Sankalia : The Archaeology of Guzrat (including Kathiwar), pp. 157-64, 212-14.

৬০। Poona Orientalist, vol. III, p. 28 ; Bhandarkar's List of Inscriptions, No. 624 (Epigraphia Indica, vol. XX, p. 89)

রেবন্ত মূলতঃ পশুজীবী শিকারী কোমের লোকায়ত দেবতা ছিলেন, লোকায়ত জীবনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, এবং পরবর্ত্তী কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তাঁকে স্বীকার করে নেয় ও অশ্বারূঢ় বলে সূর্য্যের সহিত আত্মীয়তা তার উপর আরোপ করে, এই সকল যুক্তি কতখানি বিচারসহ, তা ভেবে দেখবার বিষয়। ভারতীয় লৌকিক সংস্কৃতির এমন কোনও দেবতার কথা এখন পর্য্যন্ত আমরা জানি না, যার সঙ্গে রেবন্তের উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে এবং যাকে সেই কারণে রেবন্তপরিকল্পনার উৎপত্তিস্থল বলা যেতে পারে। ঘাটনগরে রেবন্তের যে মূর্ত্তিটি আবিষ্কৃত হয়েছে (এর বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভাস্কর্য্যপ্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য), তার সঙ্গে অবশ্য আক্রমণোদ্যত দস্যু, মৎস্যকর্ত্তনে নিযুক্তা স্ত্রীলোক, গৃহাভ্যন্তরে অবস্থিত মনুষ্যদম্পতী প্রভৃতি কয়েকটি খাঁটি লৌকিক জীবনের চিত্র যুক্ত দেখা যায়। কিন্তু রেবন্ত যে মূলতঃ লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির দেবতা, ঐ একটি ভাস্কর্য্য কি তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করবার পক্ষে যথেষ্ট? ঘাটনগর-মূর্ত্তির অনুরূপ রেবন্তমূর্ত্তি, যত দূর জানা যায়, আর পাওয়া যায়নি। সানুচর মৃগয়াবিহারী রেবন্তের মূর্ত্তিই আমরা এ পর্য্যন্ত বেশী পেয়েছি। মার্কণ্ডেয় ও স্কন্দপুরাণদ্বয়ে রেবন্তকে যে দস্যু প্রভৃতির হাত থেকে ত্রাণকর্ত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে অবশ্য ঘাটনগর-মূর্ত্তিটিকে ভাল ভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়। তবুও স্বীকার করতে হয় যে, লৌকিক জীবনযাত্রার এত সজীব চিত্র মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য্যে বিরল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন অনুমানও করা যেতে পারে যে, লৌকিক জীবনযাত্রার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়সম্পন্ন সংস্কারমুক্ত কোনও শিল্পী এই মূর্ত্তি গড়েছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে তিনি পৌরাণিক বর্ণনাকে পাষাণে রূপ দিয়েছেন। এও অসম্ভব নয় যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় কতগুলি লোকাচার রেবন্তপূজার সঙ্গে জড়িত করা হয়েছিল বলেই মূর্ত্তিটি ঐ রূপ নিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে, আলোচ্য ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় রেবন্তের মূর্ত্তিতে বড় একটা বিশেষত্ব নেই। রেবন্তকে অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত মূর্ত্তির মত এখানেও অশ্বারূঢ়, আজানু-পাদুকাবৃত ও অনুচরধৃত ছত্রদ্বারা সুরক্ষিতমস্তকরূপেই উৎকীর্ণ করা হয়েছে। রেবন্তের চতুষ্পার্শ্বস্থ মূর্ত্তিগুলির সংস্থান ও পরিকল্পনার মধ্যেই যা কিছু বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ স্থানীয় হওয়াও সম্ভব। মোটকথা, রেবন্তের এই জাতীয় মূর্ত্তি যখন এ পর্য্যন্ত একটিই পাওয়া গিয়েছে, তখন এর বৈশিষ্ট্যগুলিকে সাধারণ ভাবে রেবন্ত-পূজার বৈশিষ্ট্য মনে না করে শিল্পীর নিজস্ব বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বা সম্পূর্ণ স্থানীয় কোনও প্রভাবের ফল বলে ধরে নেওয়াই বোধ করি যুক্তিসঙ্গত এবং নিরাপদ্, বিশেষতঃ যখন রেবন্তের অন্যজাতীয় মূর্ত্তি অপেক্ষাকৃত অধিকসংখ্যায় পাওয়া গিয়েছে এবং রেবন্তকে বিদেশী সৌর ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করবার পক্ষে প্রচুর যুক্তি রয়েছে।

রেবন্ত আদৌ পশুজীবী কোনও শিকারী গোষ্ঠীর লোকায়ত দেবতা, এই জাতীয় অনুমানের মূলে বোধ করি, অনুচরপরিবেষ্টিত মৃগয়ারত রেবন্তের আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি বর্ত্তমান। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বরাহমিহির তাঁর বৃহৎসংহিতায় রেবন্তমূর্ত্তি গঠন করবার যে সংক্ষিপ্ত নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন (পূর্ব্বেই তা উদ্ধৃত করেছি), এই জাতীয় মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণভাবে যে সেই

বর্ণনা অনুসারে উৎকীর্ণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গঠনপ্রণালীর মধ্যেও পারসীক সৌর ঐতিহ্যের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং রেবন্ত এ সকল ক্ষেত্রে অনেকাংশে 'উদীচ্যবেশে' সজ্জিত। লক্ষ্য করবার বিষয়, রেবন্তমূর্ত্তি নির্ম্মাণে মার্কণ্ডেয় বা স্কন্দপুরাণদ্বয়ের ঐতিহ্যের অপেক্ষা বরাহমিহিরের নির্দ্দেশই অধিকতর ভাবে পালিত হয়ে এসেছে। ঘাটনগরে আবিষ্কৃত রেবন্তমূর্ত্তিই বোধ করি, এর এ-পর্য্যন্ত জ্ঞাত একমাত্র ব্যতিক্রম। সেখানেও যে কেন্দ্রীয় রেবন্তের মূর্ত্তির সঙ্গে বরাহমিহিরের বর্ণনানুযায়ী গঠিত অন্যান্য রেবন্তমূর্ত্তির বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে, রেবন্তমূর্ত্তি নির্ম্মাণে বরাহমিহিরের নির্দ্দেশকেই উত্তরভারতে সর্ব্বদা আদর্শ বলে মনে করা হত। বরাহমিহির অবশ্য রেবন্তের ক্ষেত্রে উদীচ্যবেশ বা কোনও খুঁটিনাটির উল্লেখ করেননি, কিন্তু তাঁর নির্দ্দেশানুযায়ী নির্ম্মিত রেবন্তমূর্ত্তিগুলিতে রেবন্তের উদীচ্যবেশ লক্ষ্য করে মনে হয় যে, তাঁর যুগে রেবন্তকে উদীচ্যবেশে সুসজ্জিত করবার প্রথাও প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক) রেবন্তের যে বর্ণনা আছে, তাতেই উদীচ্যবেশের কতগুলি স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায়। সেখানে রেবন্তকে কবচমণ্ডিত, অশ্বারূঢ়, সশস্ত্র ইত্যাদি বলা হয়েছে। এ-রকমও হতে পারে যে, সূর্য্যের ক্ষেত্রে উদীচ্যবেশের বর্ণনা দেওয়ার পর সূর্য্যপুত্র রেবন্তের অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখে বরাহমিহির তার পুনরুক্তি অনাবশ্যক মনে করেছিলেন। মনে রাখা উচিত যে, বরাহমিহির খুব সম্ভবতঃ স্বয়ং ছিলেন বহিরাগত মগব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত।[৬১] সুতরাং তাঁর মাধ্যমে সূর্য্যপুত্র রেবন্ত সম্পর্কে যে ঐতিহ্য রক্ষিত এবং প্রচারিত হয়েছে, তাতে পারসীক সৌর প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ যখন দেখা যাচ্ছে যে, তাঁর অন্ততঃ দুই শতাব্দী পূর্ব্বেই মার্কণ্ডেয় পুরাণে রেবন্তের বর্ণনায় কিছু কিছু বিদেশী লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত; তখন তাঁর যুগে যে ঐ সকল বৈশিষ্ট্য আরও সুপরিচিত হবে, এ অনুমান সহজেই করা যেতে পারে। সুতরাং এ বিষয়ে আনুপূর্ব্বিক ভাবে আলোচনা করলে এবং বরাহমিহিরের বর্ণনা ও তদনুযায়ী নির্ম্মিত রেবন্তমূর্ত্তিগুলির লক্ষণ মিলিয়ে দেখলে, বুঝতে বাকী থাকে না যে, এই মূর্ত্তিসমূহের পরিকল্পনা ও গঠনপ্রণালীর মধ্যে পারসীক সৌর ঐতিহ্য সক্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। যা কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সবই এই আনুমানিক সিদ্ধান্তের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে। অপর পক্ষে পশুজীবী কোনও শিকারী গোষ্ঠীর কোনও লোকায়ত দেবতার পরিকল্পনা ও প্রভাব, রেবন্তপরিকল্পনা ও রেবন্তমূর্ত্তির উপরিউক্ত বিন্যাসের মূলে ছিল, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রমাণাভাব।

রেবন্ত মূলতঃ অশ্বারূঢ় বলে পরবর্ত্তী কালে তাঁকে সূর্য্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রূপে কল্পনা করা হয়েছে, এই অনুমানও যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হয় না। বরঞ্চ এ কথা বললে সত্য সম্ভবতঃ অধিক প্রকাশ পায় যে, সূর্য্যের সঙ্গে রেবন্তের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাই অনেকটা তাঁর অশ্বারূঢ়-

৬১। এই বিষয়ে Indian Historical Quarterly (September 1949) পত্রিকায় বর্ত্তমান লেখকের 'The Maga Ancestry of Varahamihira' প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রূপে পরিকল্পিত হওয়ার কারণ। পৌরাণিক ঐতিহ্যে রেবন্ত কেবলমাত্র অশ্ববাহন নন, তিনি অশ্বের অধিপতি, এবং অধিরক্ষক। অশ্বশালায় বিশেষ করে তাঁর পূজা করবার রীতি ছিল। রাজগণ অশ্ববৃদ্ধির মানসে তাঁকে পূজা করতেন। স্কন্দপুরাণের পূর্ব্বোদ্ধৃত সাক্ষ্য এ বিষয়ে অতি স্পষ্ট। রঘুনন্দনও কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে লক্ষ্মীপূজার পূর্ব্বে অশ্বের অধিকারী ব্যক্তিগণকে রেবন্ত-পূজার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং অশ্বের সঙ্গে রেবন্তের সংস্রব যে অতি ঘনিষ্ঠ ছিল, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে এক সূর্য্য ভিন্ন অশ্বের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সংস্রব অন্য কোনও দেবতারই নেই। বৈদিক সূর্য্যপূজায় সূর্য্যকে সপ্তাশ্ববাহিত রথে গগনপথে চলমানরূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রাচীন ইরাণীয় সৌর দেবতা মিথ্‌র্‌, 'মিহির'রূপে যাঁর পূজা মগপুরোহিতগণ ভারতে প্রবর্ত্তন করেন, প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার অন্তর্গত 'মিহির যশ্‌ত্‌' অনুসারে, বিশ্বস্ত ভক্তবৃন্দকে দ্রুতগামী অশ্ব দান করে থাকেন।[৬২] বৈদিক এবং প্রাচীন পারসীক সূর্য্যোপাসনার এই দুটি ধারাতেই সৌর দেবতার সঙ্গে অশ্বের সংস্রব স্বীকৃত। পরবর্ত্তী কালে ভারতবর্ষে এই দুই ধারার মিলনের ফলে যে সৌর ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তাতেও স্বভাবতঃই সূর্য্যের সঙ্গে অশ্বের ব্যাপক সংস্রব দেখা যায়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তির পায়ের কাছে সূর্য্যসারথি অরুণ ও সূর্য্যের রথে যোজিত সাতটি অশ্বের মূর্ত্তি লক্ষ্য করবার বিষয়। এ বিষয়ে শিল্পশাস্ত্রে সূর্য্যমূর্ত্তিনির্ম্মাণ-পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। 'পূর্ব্বকারণাগমে'র ত্রয়োদশ পটলে বলা হয়েছে[৬৩]—

একচক্রসসপ্তাশ্বসসারথিমহারথম্।
কৃত্বা তু স্থাপয়েৎ সূর্য্যং পুরুষাকৃতিস্থাপনম্॥

এই প্রসঙ্গে কোণার্কের সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মন্দিরটি সমগ্রভাবে একটি রথের আকারে পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত হয়েছিল এবং এর সম্মুখে রথে যোজিত অশ্বগুলির কোনও কোনওটির মূর্ত্তির ভগ্নাংশ এখনও বিদ্যমান। তা ছাড়া এই মন্দির-প্রাঙ্গণের দক্ষিণে বালিপাথরে তৈয়ারি দুটি বিশাল ও অপূর্ব্ব সুসজ্জিত অশ্বের মূর্ত্তি দেখা যায়। একাকী ও অশ্বারূঢ় অবস্থায়ও যে, সূর্য্যের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হত, এবং অগ্নিপুরাণে যে সেই জাতীয় সূর্য্যমূর্ত্তির বর্ণনা আছে, তার উল্লেখ পূর্ব্বেই করেছি। এই প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক সাহিত্যে বিখ্যাত সূর্য্য ও সংজ্ঞার উপাখ্যান স্মরণীয়। সেখানেও দেখা যায় যে, সংজ্ঞা অশ্বিনীরূপ ধারণ করে উত্তরকুরুতে বিচরণ করছিলেন এবং সূর্য্যও অশ্বরূপে সেখানে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। অশ্বিদ্বয় ও রেবন্তের এই ভাবেই জন্ম। এই কাহিনীতেও সূর্য্যের সহিত অশ্বের সংস্রব সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়। সূর্য্যের মাধ্যমে এই অশ্বসংস্রব সূর্য্যের পুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উপরে পর্য্যন্ত আরোপিত হতে দেখা যায়। ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে অশ্বিনীকুমারদ্বয় অশ্বমুখরূপে নির্ম্মাণ করবার রীতি আছে। কোনও

৬২। Haug : Essays on the Religion of the Parsis, p. 202.

৬৩। Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, vol. I, pt. II, Appendix C, p. 89.

কোনও প্রাচীন ভারতীয় (বিশেষতঃ উত্তরভারতীয়) সূর্য্যমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট সূর্য্যপুত্র অশ্বমুখ অশ্বিদ্বয়ের মূর্ত্তিও দেখতে পাওয়া যায়।[৬৪] সূর্য্যপূজা উপলক্ষ্যে প্রচলিত অশ্বদানের প্রথা এই বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বলা হয়েছে, সূর্য্যপূজা উপলক্ষ্যে অপরাপর বস্তুর মধ্যে অশ্ব দান বিধেয়।[৬৫]

ধেনুদানঞ্চ শয্যাঞ্চ বিক্রমঞ্চ হয়ং তথা।
দাসী-মহিষী-ঘণ্টাশ্চ তিলং কাঞ্চনসংযুতম্॥

ঐ পুরাণের প্রভাসখণ্ডে চিত্রাদিত্য নামক একটি সূর্য্যমূর্ত্তির মাহাত্ম্যবর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, চিত্রাদিত্যক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকে অশ্ব, কোষবদ্ধ অসি ও স্বর্ণ দান করা কর্ত্তব্য[৬৬]—

তত্রৈব চাশ্বো দাতব্যঃ সকোষং খড়্গমেব চ।
হিরণ্যং চৈব বিপ্রায় এবং যাত্রাফলং লভেৎ॥

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। সমগ্রভাবে প্রমাণগুলি আলোচনা করিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় সূর্য্যপূজার সঙ্গে অশ্বের সংস্রব অতি ঘনিষ্ঠ। ইরাণ থেকে পরবর্ত্তী কালে সৌর ধর্মের যে ধারা ভারতবর্ষে এসেছিল, তাতেও দেখা যায়, মিথ্র বা মিহিরের সঙ্গে অশ্বের সংস্রব অস্বীকৃত নয়। পরবর্ত্তী কালে বৈদিক ও ইরাণীয় সূর্য্যপূজার এই দুই ধারা ভারতবর্ষে (বিশেষতঃ উত্তরভারতে) মিশে যায়, এবং ফলে ভারতবর্ষীয় সূর্য্যোপাসনায় অশ্ব চিরকাল গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে এসেছে। সূর্য্যপুত্র অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের পরিকল্পিত মূর্ত্তিতে আমরা তার নিদর্শন দেখতে পাই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত সহজেই করা চলে যে, সূর্য্য ও সূর্য্যপূজার সঙ্গে অশ্বের ঘনিষ্ঠ সংস্রবই সূর্য্যের অপর পুত্র, অশ্বিদ্বয়ের ভ্রাতা রেবন্তের অশ্বসংস্রবের মূল কারণ। রেবন্ত যে মূলতঃ সৌরদেবতা, অশ্বের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এর একটি বড় প্রমাণ। স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের পূর্ব্বোক্ত কাহিনী অনুসারে রেবন্ত জন্মমুহূর্ত্তেই পিতা সূর্য্যের নিকট হতে অশ্ব গ্রহণ করে পলায়ন করেন এবং সূর্য্য বহু চেষ্টা করেও পুত্রের নিকট হতে অশ্ব উদ্ধার করতে পারেননি। সেই অশ্বসমেত রেবন্ত পরে প্রভাসক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হন। এই কাহিনীর মধ্যে যে ব্যঞ্জনা আছে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

উপসংহারে বক্তব্য যে, বন্য অশ্বকে ব্যাপকভাবে বশীকরণ ও ব্যবহার ইতিহাসে আর্য্য-গোষ্ঠীই প্রথম করেন। আর্য্যগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাই অশ্বের স্থান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁদের ধর্ম্মমতে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে সেই কারণে অশ্ব স্বভাবতঃই স্থান পেয়েছিল। ভারতে বৈদিক যুগের আর্য্য অধিবাসী ও পারস্যের প্রাচীন আর্য্য অধিবাসিগণের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল। ব্যবহারিক জীবনে অশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায়, এই দুই গোষ্ঠীর ধর্ম্মের, বিশেষতঃ সৌরধর্ম্মের সঙ্গে অশ্বের ঘনিষ্ঠ সংস্রব সম্ভবপর হয়েছিল। কিন্তু

৬৪। Gopinath Rao : Elements of Hindu Iconography, vol. I, pt II, pp. 314-15.

৬৫। স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড।২।১৩।৭৩ (বঙ্গবাসী সং, তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ১৮১২)।

৬৬। স্কন্দপুরাণ-প্রভাসখণ্ড।১।৯৩১।৪৩ (বঙ্গবাসী সং, সপ্তম ভাগ, পৃঃ ৪৮১৫)।

ভারতের আর্য্যেতর গোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে অশ্বের স্থান কোনও দিন এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে জানা যায় না। ভারতের লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির মূল প্রেরণা এসেছিল এই শেষোক্তদের নিকট থেকেই। সম্ভবতঃ সেই কারণে ভারতীয় লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতিতে অশ্বরূপী দেবতা বা অশ্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যথোচিত প্রাধান্যসম্পন্ন দেবতা প্রায় নেই বললেও চলে। অন্ততঃ এই স্তরের এমন কোনও দেবতার কথা আমাদের জানা নেই, যাকে বিশেষত্বের দিক্ দিয়ে রেবন্তের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে বা রেবন্তের আদি-প্রতীক বলে বর্ণনা করা চলতে পারে। বর্ত্তমানে অনার্য্য গোঁড়দের মধ্যে 'কোড়া পেন্' নামক এক অশ্বদেবতার পূজা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু এই দেবতার কোনও মূর্ত্তি গঠিত হয় না। এঁর প্রতীক এক খণ্ড পাথর।[৬৭] এ দেবতার পূজার প্রাচীনত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। এই জাতীয় কোনও দেবতার সঙ্গে রেবন্তের যোগসূত্র আজ পর্য্যন্ত কেউ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। তাই এ বিষয়ে বোধ করি, অধিক আলোচনা নিষ্ফল। সুতরাং এ পর্য্যন্ত আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি, তার ভিত্তিতে এইটুকু বলা চলে যে, রেবন্ত সূর্য্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে বদ্ধ ছিলেন বলেই অশ্বের সঙ্গে তাঁর সংস্রব এত ঘনিষ্ঠ; এবং তাঁর অশ্বারোহিত্ব এবং অশ্ব-সংস্রবের মূলে ভারতীয় সূর্য্যপূজার বৈদিক ও পারসীক ধারার সম্মিলিত প্রভাব কার্য্যকরী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রেও লৌকিক ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির কোনও প্রভাব এখন পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয়নি।

৬৭। Encyclopaedia of Religion & Ethics, vol. I, p. 519.

বেলওয়া-লিপির 'প্রমাণ'

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, বি. এস-সি.

মহীপালদেবের বেলওয়া-লিপির সম্পাদনাকালে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৪শ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যায়) দত্ত ভূমির মাপ বিষয়ে উল্লিখিত 'প্রমাণ' শব্দটির অর্থপরিগ্রহ হয় নাই। দত্ত ভূমির পরিচয়-বর্ণনা নিম্নরূপ ছিল—

২৮ পংক্তি শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তৌ। ফাণিত-বীথীসম্বদ্ধঅমল[ক্দ্বুষা]ন্তঃপাতিস্বসম্ব।

২৯ ... বিচ্ছিন্ন ত[লো]পেতদশোত্তরশতদ্বয়প্রমাণৌ। সন্নকৈবর্ত্তবৃত্তি।
পুণ্ডরিকামণ্ডলান্তঃপাতি পঞ্চকাণ্ডকাধিক

৩০ ... হ[ট্টি]পাণ। পববি]নবত্যুত্তরচতুঃশতপ্রমাণনন্দিস্বামিনী। পঞ্চনগরী-
বিষয়ান্তঃপাতি একপঞ্চাশদুত্তরশ-

৩১ ... তপ্রমাণগণেশ্বরসমেতগ্রামপুষ্করিণীষু।

অর্থাৎ পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত এই দান। ফাণিতবীথীসম্বদ্ধ অমল...দুই শত দশ-প্রমাণ; কৈবর্ত্তদের যে বৃত্তি প্রদত্ত ছিল, তাহার সন্নিহিত পুণ্ডরিকামণ্ডলান্তঃপাতি...চারি শত নব্বই প্রমাণ নন্দিস্বামিনী ও পঞ্চনগরীবিষয়ান্তঃপাতি একশত একপঞ্চাশ প্রমাণ গণেশ্বর সমেত গ্রামপুষ্করিণীতে (প্রদত্ত হইল)।

উপরোক্ত বর্ণনায় ভূমির মাপ-সম্পর্কীয় 'প্রমাণ' কথাটির অর্থপরিগ্রহের চেষ্টাই হইল বর্ত্তমান নিবন্ধের হেতু।

তৃতীয় বিগ্রহপালের বেলওয়া-লিপিতে (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫৬শ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, মৎসম্পাদিত লিপি দ্রষ্টব্য, ৬২ পৃ.) ২৯ পংক্তিতে দত্ত বস্তুর বর্ণনায় 'একাদশোদমানাধিক-সার্দ্ধসপ্তদ্রোণোপেতকুল্যত্রয়প্রমাণাং' কথাটি আছে। এই 'প্রমাণ' কথাটি 'মাপ' কথাটির (measure) পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে, বোধ হয়। ২৮ পংক্তিতেও ঐ ভাবে এক বার প্রমাণ কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয় তাঁহার 'Udamana in Bengal Epigraphs' (১৯৫০, নাগপুর ইতিহাস কংগ্রেসে পঠিত) প্রবন্ধেও এই 'প্রমাণ' কথাটিকে মাপ অর্থেই গ্রহণ করিয়াছেন দেখা যাইতেছে।

কিন্তু মহীপালের বেলওয়া-লিপির 'প্রমাণ'কে ঐ ভাবে গ্রহণ করা যায় না। ডাঃ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের অনূদিত কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের অধ্যক্ষপ্রচার অধিকরণের অন্তর্গত ৩৭শ প্রকরণে [তুলা ও মানের (বাটের) সংশোধন] ১৩০ পৃষ্ঠায় সম্প্রতি পাঠ করিলাম—

"(সম্প্রতি ধান্যাদি মাপিবার জন্য দ্রোণ, আঢ়ক প্রভৃতি নিরূপণ করা যাইতেছে।) ধান্য-মাষদ্বারা পূরণীয় ২০০ পল পরিমাণের নাম আয়মান দ্রোণ। সেইরূপ ১৮৭½ পল[১]

১। পল=২।০ তোলা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪০, দ্বিতীয় সংখ্যা, ৬৭ পৃ.।

পরিমাণের নাম এক ব্যবহারিক দ্রোণ; আবার তেমন ১৭৫† পরিমাণের নাম এক ভাজনীয় দ্রোণ। এবং ১৬২½ পল পরিমাণের নাম এক অন্তঃপুরভাজনীয় দ্রোণ।"

"উক্ত চারিপ্রকার দ্রোণের উত্তরোত্তর ¼ অংশ ভাগ কম হইতে থাকিলে ইহাঁদের আঢ়কাদি নাম হইবে, অর্থাৎ ১ দ্রোণের ¼ অংশের নাম আঢ়ক, ১ আঢ়কের ¼ অংশের নাম প্রস্থ ও ১ প্রস্থের ¼ অংশের নাম কুড়ুব।"

উদ্ধৃত অংশের 'পল পরিমাণ' ও 'পরিমাণ' শব্দটি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। যে পরিমাণ বীজধান্য যত মাপের জমিতে বপন করা যায়, সেই পরিমাণ জমিকে ঐ পরিমাণ বীজের মাপ দ্বারা পরিচিত করানই এই দেশে রীতি ছিল।* এই অবস্থায় মহীপালের বেলওয়া-লিপির ২১০ প্রমাণ, ৪৯০ প্রমাণ ও ১৫১ প্রমাণকে যদি ২১০ পল পরিমাণ, ৪৯০ পল পরিমাণ ও ১৫১ পল পরিমাণ গণ্য করা যায়, তবে সর্বজন-পরিচিত দ্রোণাদির সাথে একটা সামঞ্জস্যবিধান হইতে পারে।

ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় আমার লেখাটি পাঠ করিয়া আমাকে লিখিয়াছেন, "ভূমিতে উৎপন্ন শস্যাদির পরিমাণ দ্বারা যে ভূমির পরিমাণ বা মাপও সূচিত হইত, তাহা প্রাচীন ইতিহাসের একটা তথ্য বলিয়াই মনে হয়। আপনার ব্যাখ্যাটি সমীচীনই বোধ হয়।"

বিষয়টি পণ্ডিত ব্যক্তিদের হাতে আরও বিচারার্থ তুলিয়া দিলাম।

---

† এখানে পল কথাটি নাই। ডাঃ বসাক আমার পত্রোত্তরে লিখিয়াছেন যে, এখানে '১৭৫ পল ছাপা হওয়া উচিত ছিল'।

* ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের বাঙ্গালীর ইতিহাস, ভূমিবিন্যাস অধ্যায় দ্রষ্টব্য, এবং শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রবন্ধ (সা-প-প, ১৩৪০, ২য় সংখ্যা, ৬৬ পৃঃ হইতে) দ্রষ্টব্য।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

অষ্টপঞ্চাশৎ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

৫৮-শ ভাগ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার

প্রবন্ধ-সূচি

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা

শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৭ ভাগ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৮শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

স্যর শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী সম্পাদক

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল
শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীগণপতি সরকার

আয়ব্যয়-পরীক্ষক

ইউ. এম. চৌধুরী এণ্ড কোং   শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৮। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ৯। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ১০। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১১। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, ১২। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৩। শ্রীবিভাস রায়চৌধুরী, ১৪। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৫। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৬। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ১৯। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২০। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভদ্র, ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীমনীষিনাথ বসু সরস্বতী।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৯ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা

সূচি

✱

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫১ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা
১৩৫১

বরদামঙ্গল

(শ্রীশ্রীবরদেশ্বরীর ইতিবৃত্ত)

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ত্রিপুরা জিলার অন্যতম প্রধান পরগণা বরদাখাতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীশ্রীবরদেশ্বরী অন্যূন ৪৫০ বৎসর যাবৎ জাগ্রত দেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বরদাখাতের ইতিহাসের সহিত এই পীঠ-দেবতার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। ৺বরদেশ্বরীর নামানুসারেই ফার্সি "বলদাখাল" শব্দটি পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে সন্দেহ নাই। পাঠান অধিকারের পূর্ব্বে এই পরগণা সুপ্রাচীন "শিরচাইল" রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান, চীনপরিব্রাজক হিউয়েন সেঙ্গ সমতটের পূর্ব্বোত্তর দিকে যে "শি-লি-চ-ট-ল" রাজ্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহা "শিরচাইল" হইতে অভিন্ন।

৺বরদেশ্বরীর আবির্ভাব সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতে আমরা নানা কৌতুকজনক কাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। মুখে মুখে প্রচলিত সে সকল কিম্বদন্তীর মূল প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য ছিল। সৌভাগ্যবশতঃ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকাইল-নিবাসী স্বর্গত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট "বরদামঙ্গল" নামক একটি হস্তলিখিত পুথি (পত্রসংখ্যা ৫৫) প্রাপ্ত হইয়া আমরা তন্মধ্যে ৺বরদেশ্বরীর এবং বরদাখাত পরগণার ইতিহাস বিষয়ে অনেক অজ্ঞাতপূর্ব্ব মূল্যবান্ তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকার "দ্বিজ নন্দকিশোর" শ্রীকাইলের সন্নিহিত "রোয়াচালা" গ্রাম-নিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার স্বহস্তলিখিত একটিমাত্র প্রতিলিপিই আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রতিলিপির তারিখ [৫৫ ক পত্রে] "ইতি সন ১২২৬ সন তারিখ ২৬ মাহে ভাদ্র রোজ ভৃগুবাশরে শায়ং সময়ে পুস্তকং শমপ্তশ্চেতি পোস্তকং স্বাক্ষরং [হস্তা] শ্রীনন্দকিশোর শর্ম্মণ ॥ ॥ সাকীং পরগণে বরদাখাত মৌং রোয়াচালা গ্রামে ভাসিন্দা।" ইংরাজী তারিখ হয় ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮১৯ খ্রী। গ্রন্থকারের বংশীয় লোক এখনও এই গ্রামে বিদ্যমান আছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, চাঁদপ্রতাপ পরগণার রোয়াইল গ্রাম হইতে কাশ্যপ গোত্র, পুণ্ডীলাল শ্রোত্রিয় কৃষ্ণবল্লভ রায়ের পুত্র ধনঞ্জয় রায় কোন দুর্ঘটনাবশতঃ দেশত্যাগী হইয়া শ্রীকাইল আসেন। তৎকালে রোয়াচালা গ্রাম ব্রাহ্মণশূন্য ছিল, তত্রত্য বর্দ্ধিষ্ণু কায়স্থ "রামকেশব রাউত" ধনঞ্জয়ের পুত্র শান্তিরামকে সসম্মানে ঐ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্রই নন্দকিশোর। বরদামঙ্গল গ্রন্থ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পরিপূর্ণ; দ্বাদশ অধ্যায়ের শেষে এই ভণিতা আছে [৫০ক পত্র]—

সান্তিরামদ্বিজসুত নন্দকিশোর নাম। বরদাখাত দেষমধ্যে রোয়াচালা গ্রাম ॥
সেই দ্বিজে লিখীলেক বরদামঙ্গল পোতা। কলিতে কালিকাপরে আর যত মিত্যা ॥

শান্তিরাম শ্রীকাইলের ভৈরববংশীয় রামজগন্নাথ চক্রবর্তীর ভগ্নীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং নন্দকিশোর ভৈরববংশের দৌহিত্র বিধায় ৺বরদেশ্বরীর ইতিবৃত্ত সম্যক্ জ্ঞাত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। নন্দকিশোর প্রৌঢ় বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, ১১৯৫ সনে [১৭৮৮ খ্রীঃ] Patterson সাহেব বরদাখাত পরগণা জরিপ করিয়া সমস্ত নিষ্কর ভূমির যে বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, সেই "মৌনাহি" কাগজে [এখনও কুমিল্লা কালেক্টরীতে রক্ষিত আছে] রোয়াচালা গ্রামস্থ দুই জনের নাম আছে, রামকান্ত ও নন্দকিশোর। ইহারা উভয়েই শান্তিরামের পুত্র। নন্দকিশোরের তিন পুত্র—রাজকিশোর, গৌরকিশোর ও রুদ্রকিশোর। গৌরকিশোরের তিন পুত্র—কমলকিশোর, নীলকমল ও অরুণোদয়।

বঙ্গসাহিত্যের অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যের ন্যায় এই গ্রন্থও স্বপ্নাদেশে রচিত :—

কলিভব তারিতে কালি বরদারুপি হইলা।
অষ্টভুজা নিলবর্ণা ছিকালি বিরাজিলা ॥
আদেসিলা সপ্নবাণি বরদামঙ্গল খানি
লিখিতে পোস্তক তোমা আদেশ করিলা।
বরদামঙ্গল পোতা কেমতে লিখীব মাতা
ভাবিতে চিন্তিতে মন হৈল উচঞ্চলা ॥ ইত্যাদি।

গ্রন্থারম্ভে কবি অকপটে লিখিয়াছেন—"সমস্তং ন জানামি মূর্খ ভবাত নিশ্চয়। তবানুগ্রহণঞ্চৈব ভাসিতং বরদমঙ্গল ॥" [সপ্তম শ্লোক]। গ্রন্থের ভাষা ও বর্ণাশুদ্ধি দেখিলে গ্রন্থকারের উক্তি বিনয় মাত্র মনে হয় না। সুতরাং সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য অতি নগণ্য, পক্ষান্তরে ইহা একটি অমূল্য ইতিবৃত্তমূলক দুর্লভ গ্রন্থরূপে বঙ্গসাহিত্যে স্থান লাভ করার যোগ্য।

প্রথম অধ্যায়

মহাবলী ত্রিপুর অসুরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া, দেবগণ শিবসন্নিধানে যাইয়া, তাঁহার নির্দ্দেশে কালিকার স্তব করেন।

দেবের সাক্ষ্যাতে আসি কহিল বচন।
ত্রিপুর অসুর আমি করিব নিধন ॥
* * *
শিবে বোলে বরদা তুমি কালিমূর্ত্তি হইয়া।
অষ্টভুজা মূর্ত্তি ধরি অসুর বদ গিয়া ॥
* * *

শদাসিবে কহে দেবী সোনহ বচন।
তোমার কৃপায় হইল অসুর নিধন॥
প্রিথিভিতে থাক তুমি বরদা নাম ধরি।

*   *   *

আমা ভক্ত আছে এক দ্বিজ কির্ত্তিভাস।
তার তপে হবে তোমার লোকেত প্রকাষ॥ [১-৫ পত্র]

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাহাড় মুলুক ছিল গঙ্গার পশ্চিম ধারে।
কালিপুর নাম গ্রাম অতি মনুহরে॥

*   *   *

সেই গ্রামেতে ছিল **কির্ত্তিভাস ব্রহ্মচারী**।
পরম সাদক সেই শাস্ত্র অনুসারি॥

*   *   *

কালিপুর গ্রামের উত্তরে পর্ব্বত শিখড়ে।
কানন ভিতরে তবে গেল দ্বিজবরে॥

*   *   *

এহি মতে পঞ্চ বৎসর তপ কৈল।
তথা চ যে দেবি তাকে সদয় না হইল।

*   *   *

স্তপ শুনি নারায়ণি, নিজমূর্ত্তি ধরে পুনি, অষ্টভুজ মুণ্ডমালা গলে।
এক হস্থে খড়্গধারি, আর হস্তে ছেলসারি, আর হস্তে রুধির কোটরা।
আর হস্তে অস্ত্র জত, তাহা বা কহিব কথ, দ্বিগাম্বরি নিছে ভোলানাথ।
সিংহ বাহন করি, অসুর মারছে ধরি, নিলবর্ণ হইলা বরদা।

*   *   *

তাহা সুনি বরদামহি, তোমাতে সরুপ কহি, বরিসেক অন্তরে পাইবা।
রাড়দেসে হবে ভঙ্গ, লোক জাবে তোমা সঙ্গ, পূর্ব্বদেসে জাইবা চলিয়া।
বরদা আমার নাম, তোমাতে কহি অনুপাম, বরদাখাত পরগণা মধ্যে।
বিসারা গ্রামের নাম, তাহাতে চলিয়া জাম, কাননের মধ্যেত থাকিব। [৫-৮ পত্র]

তৃতীয় অধ্যায়

ক্ষেত্রি হৈল নিপাত জবন অধিকারি।
বাদসাহি আমল হৈল রাজা সব মারি॥

বলতকার করি লোকের জাতি নষ্ট করে।
বাদসাই নিসান উড়ে নগরে নগরে ॥

* * *

রাহাড় দেসের কথা করহ শ্রবণ।
রায়শ্রীপ্রতাপরাজা দুই ভাই ছিল।
বাদসাই হাঙ্গামা দেখি কাতর হইল ॥

* * *

দয়া হৈল নারায়ণি, কহিল আকাসবাণি, কির্ত্তিভাস দ্বিজ পাসে জায়।
কির্ত্তিভাস নাম সুনি, হরিস হইল পুনি, ব্রহ্মচারি কুলপুরোহিত ॥

* * *

তাহা সুনি হরিসে কহিল ব্রহ্মচারি।
পূর্ব্বে আমা বর দিছে বরদা ইশ্বরি ॥
রাহাড় দেশেত ভঙ্গ হইব নিশ্চয়।
বঙ্গরাজ্য পূর্ব্বদেস অরণ্যমধ্যয়ে ॥
সেই দেসে বরদাকালি প্রচার হইব।
পূর্ব্ব রাজ্যে রাজা পুনি তোমাকে করিব ॥

* * *

বরদাখাত নাম রাজ্য অধিক বিসেষ।
অরণ্য কানন সব লোক নাই তায়ে ॥
মনিস্তের গতি নাই গহিন কানন।
বরদা কালিকা তাথে পাইবা দরসন ॥

* * *

নানা জাতি লোক সব পরিবার লইয়া।
জাত্রা করে পূর্ব্বদেসে হরসিত হৈয়া ॥

* * *

ব্রাহ্মোণ কাহেস্ত বৈশ্য জতেক আছিল।
নব সখা আদি করি ছত্তিস জাতি লইল ॥

* * *

বিস্তর চলিল নৌকা নাহি লেখা জোখা।
রাহাড় মুর্থক মুক্ত হইল এতদিনে ॥
এহি মতে জায়ে নৌকা গঙ্গাশ্রোত বাহিয়া।
সাগরসংগ্রমতির্থ লাগ পাইল গিয়া ॥

* * *

উজাইয়া ভায় নৌকা উত্তর পূরবা কোন।

*　*　*

সতমুখি গঙ্গা দেখি দক্ষিণে রহিল।

*　*　*

ব্রহ্মপুত্র নদ বায়ে উত্তরমুখি হইয়া।

*　*　*

হেন কালে নৌকা সব পূর্ব্বমুখি হৈল।

*　*　*

মেগনাদ নদির পূর্ব্বপাড়ে গেল।

বরদাখাতনামে দেস তখনে মিলিল॥

*　*　*

বনমধ্যে অগ্নি দিল বরদা খরিয়া।......

সেই অগ্নি ছিল একবিংসতি দিবস।...... [৮-১২ পত্র]

চতুর্থ অধ্যায়

এক সরোবর তাথে অতি মনোহর।...

সারিং করি গ্রাম বিসারা নাম থুইবা। (দৈববাণী)

*　*　*

সরোবর পশ্চিম ধারে রাজপুরি কৈল। তাহার দক্ষিণে কির্ত্তিবাসপুরি হৈল॥

সকলি ব্রাহ্মোন তবে একগ্রাম হৈল। সুদ্র বৈর্দ্ধ আদি ছত্তিস জাতি রৈল॥

মধ্যে পর্দ্দসরোবর গ্রাম চতুর্দ্দিকে। বিসারানগরি নাম রাখে হরসিতে॥

রাহাড়দেস ছাড়িয়া আসিছে যত প্রজা। সকলির ঠাই করি দিল মহারাজা॥

দক্ষিণে **ফেনাই** নদি উত্তরে **খেয়াই**। এহার মধ্যে বসতি লোক করিল সামাই॥

বরদাখাত মৈধ্যদেস বরদার স্থান। পর্দ্দবনে কালিদেবি হইছে (অধি)ষ্টান॥

পুস্পনাল ধরি দ্বিজ জলে ডুব দিল। অথাত জলের মধ্যে এক রাত্র ছিল॥

*　*　*

ক্রমে বরদাদেবী, "বরদেশ্বর" শিবলিঙ্গ, "রামচন্দ্র" শালগ্রাম এবং দ্বিভুজ "বাসুদেব" মূর্ত্তি কীর্ত্তিবাস সরোবর হইতে তুলিল।

রায়শ্রীপ্রতাপরাম মন হরসিতে। বরদার মণ্ডপঘর বান্দিল তরিতে॥

বৈশাখ মাস অমাবস্যা শনিবারে দিনে।

পূজা করে বরদা কালি অতিভক্তি মনে॥

সাক্ষাৎ দেবীর নিকট কীর্ত্তিবাস,

জেইমত পূজার বিধি লিখিয়া লইল। **অষ্টাক্ষর মহামন্ত্র** দেবী তানে দিল॥

(১২-১৭ পত্র)

পঞ্চম অধ্যায় (রায় শ্রীপ্রতাপকথা)

দক্ষিণে ফেনাই নদি উত্তরে খেয়আই। এহি দেসের মহারাজা হৈল দুই ভাই॥
পুর্ব্বসিমান পর্ব্বত পশ্চিমে মেগনাদ। এহার মধ্যে রাজা দুই মনেত সার্ন্দাদ॥

*   *   *

কত দিন পরে তারগ হইল মত্যতা।
ব্রার্ক্ষোণ বৈষ্ণব হিংসা করছে সদায়ে। চুরি পরদার কাজ্য সদায়ে করয়ে॥
একদিন মগুপানে বিভোর হইয়া দুই ভাই বরদার মন্দিরে ঢুকিয়া
পুজারত কীর্ত্তিবাসকে আহত করিয়া,
সিংহাসন হতে কালি তোলে ততক্ষণ।
পরসে বরদা দেবির স্বেত কুষ্ট হৈল। তথা চ বর্ব্বর মূঢ় কীছু না বুজিল॥

*   *   *

নিজালয়ে নিয়া কালি সিংহাসনে বসাইল।

*   *   *

আপনে বসিল কালি পুজা করিবার।

*   *   *

ক্রোধ করি বলে কালি বলি না লইলা। কালিকে পুড়িব বলি আনল জালিলা॥

*   *   *

কতক্ষণে প্রজলিত হৈল হুতাসন। রাজপুরি ভশ্বরাশি অগ্নিতে দাহন॥
গ্রামনগর পুড়ি কৈল ছাড়খাড়। না দহিল অগ্নিয়ে কীর্ত্তিভাসের জে পুর॥
তথা চয় দুই অসুর জ্ঞান নাহি মনে। কালিকে সংহার আমি করিব এখনে॥
সেই অস্ত্র উলটিয়া পড়ে তার সিরে। দেবকোপে আপনা অস্ত্রে মরিল অসুরে॥

[১৮-২২ পত্র]

ষষ্ঠ অধ্যায়

কীর্ত্তিবাস মনের দুঃখে এবং ক্রোধে সমস্ত দেবদেবীর মূর্ত্তি নদীতে বিসর্জন দিল এবং পরে প্রত্যক্ষ দেবীর সান্ত্বনায় এবং প্রতিজ্ঞাবাক্যে (জম্মে২ না ছাড়িবা আমাবংশ ইত্যাদি) আশ্বস্ত হইয়া সমস্ত মূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।

পুর্ব্ব হথে অধিক প্রভা হইল কালিকার। জেবা জেই মানস করে সির্দ্ধি হয়ে তার॥
রায় শ্রীনির্ব্বংস হইল অরাজগ দেস। এতদিনে রাজবংস হইলেক শেষ॥
দেসে২ মাতবর লোক জতেক আছিল। বাটরা করিয়া তারা জমিদার হৈল॥
বরদাখাত দেস ভবে বার জিলা হইল। পোস্থক বাড়য়ে দেখি নাম না লিখিল॥...

[২২-২৪ পত্র]

সপ্তম অধ্যায়

দেবীর বরে কীর্ত্তিবাসের পত্নী "প্রভাবতী"র "জগন্নাথ" নামে এক পুত্র হইল। দেবীর নিকট ভবিষ্যদুক্তি শুনিয়া কার্ত্তিবাস দেহরক্ষা করিয়া, "ভৈরবানন্দ" নামে সাক্ষাৎ ভৈরবরূপে দেবীপদতলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। জগন্নাথ "কালিপদে লিপ্ত পিদা শ্রার্দ্ধ না করিল।" এক বৎসর পরে পত্নী প্রভাবতীও মুক্তি লাভ করিল। [২৫-৩০ পত্র]

অষ্টম অধ্যায়

জগন্নাথের পুত্র হইল "মৃত্যুঞ্জয়" এবং কিছু কাল পরে জগন্নাথ স্বর্গী হন। এই সময়ে দিল্লীর বাদ্‌সার পুত্র 'জাঙ্গির খাঁ' পূর্ব্বদেশে আসিয়া "জাঙ্গেরনগর" সহর স্থাপন করিয়া দেশ জয় করিতে লাগিল।

বার ওমরা আসিয়াছিল বাদসার সহিতে। বার জন চলি গেল মহিম করিতে॥

* * *

খাজ্জা খাঁ কোডর খাঁ দুই মগল ছিল। বহু সর্ণ্য লইয়া তারা বরদাখাত আইল॥
বিশারার কাচারি তানা কোরক করিল। চৌধুরি মযুমদ্দার সব পলাইয়া গেল॥

প্রজার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া অবস্থানকালে তাহারা দুই জন বরদেশ্বরীর পূজার কোলাহল শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পূজা ভাঙ্গিয়া দিতে অদেশ করিল।

তাথে এক ব্রার্হ্মোণ আছিল অনুপাম। ভাগরাতলি বাড়ি তার বানিরাম নাম॥
বানিরাম ছিল সেই দরবার ভিতর। সুনিয়া ইসব কথা কাফে থর থর॥
কালিভক্ত বাণিরায়ে সমাই স্থানে কহে। কালি এহি স্থানে রাখন উচিত না হয়ে॥
বাণিরায়ে বোলে সোন আমা নিবেদন। ভাগরাতলি আমা বাড়ি করহ গমন॥
তাহাতে সরতকাল দসমি উপস্থিত। শষ্ঠীদিবস জাত্রা করি চলিল ত্বরিত॥
দশমি জোগে তান বাড়ি তিন রাত্রি ছিল। নানা বিধিমতে পূজা তিন দিন কৈল॥

এ সময়ে ভৈরব মৃত্যুঞ্জয়কে দেবী আকাশবাণীতে জানাইল—

দশমী প্রভাতকাল, আমা লই ধরে চল, মহিমা দেখিব সর্ব্বলোকে।

বাণী রায়ের কাতরোক্তিতে ভৈরব প্রতি বৎসর "চারি রাত্র" বরদেশ্বরীকে তাঁহার বাড়ীতে আনিয়া পূজা করিতে স্বীকৃত হইল। [৩০-৩৩ পত্র]

নবম অধ্যায়

৺বরদেশ্বরীর মাহাত্ম্যে সসৈন্যে মোগল জমীদারদ্বয় পরাস্ত হইল এবং তাহারা দেবীপূজার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিয়া

বিসারার সপ্তগ্রাম বির্ত্তি করি দিল।
কত দিন পরে তাহা নদিয়ে ভাঙ্গিল॥ [৩৩-৩৭ পত্র]

দশম অধ্যায়

মৃত্যুঞ্জয় রত্নেশ্বরের কন্যা "সুভগা দেবী"কে বিবাহ করেন এবং "গঙ্গারাম" নামে এক পুত্র লাভ করেন। তাঁহারা যৌবনারম্ভে উভয়ে মুক্তি লাভ করেন। গঙ্গারামও বিবাহ করিয়া তিন পুত্র লাভ করেন :—

এহি তিন ভৈরববংস আছে ছিকালিতে। [৩৮–৪১ পত্র]

একাদশ অধ্যায়

পূর্ব্বে দেবী ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, বিশারা নদীতে ভাঙ্গিয়া যাইবে। গঙ্গারামের প্রত্যক্ষ হইয়া দেবী তাহার অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিলেন :—

এহি ঠাঞি নদি ছিল অতি খরতরে। তাথে এক মৎস আছে বচি নাম ধরে ॥
দির্গ সপ্ত যোজন মৎস্য প্রহস্থ দুইপর। বহুদিন অবদি মৎস রহিছে সাগর ॥
সেই মৎস উপরে বালুয়ে বান্ধে চর। লড়িতে না পাড়ে মৎস বড়ই ডাঙ্গর ॥
বহুকালে সেই মৎস গায়ে ঝাড়া দিব। এ কারণে এহি পুরি নদিয়ে ভাঙ্গিব ॥
সাগরে জাইবে মতস বহুকাল পরে। এহি মর্ম্মকথাখানি কহিল তোমারে ॥
দেবি বোলে ভৈরব তুমি সোনহ বচন। আমাকে লইয়া তুমি করহ গমন ॥

* * *

ভাগরাতলি নামে গ্রাম বানিরায়ে ছিল। সুনিয়া নদির সম্বাদ কালিপুরে আইল ॥

* * *

বানিরায়ে বোলে আমি কথায়ে জাইব। ছাড়িয়া বিসারাদেখ কোনখানে রহিব ॥

* * *

ভাগরাতলি উত্তরপুর্ব্বে স্যামগ্রাম নাম। সেই গ্রামে বাড়ি বান্দ সোন গুণধাম।
ভাগরাতলি গ্রাম তবে নদিয়ে ধরিল। বানিরায়ে বাড়িঘর স্যামগ্রামে কৈল ॥

* * *

বটবৃক্ষমূলেত বরদা নামাইয়া। কৌতুক দেখিতে বসে হরসিত হৈয়া ॥
তাতে সে বচিকামৎস লেজ ঝাড়া দিল। গম্ভিয়র নদির জল খলখলি হৈল ॥
দির্গ দুই দিন পথ প্রহস্থ হাড়াই পর। জলজন্তু কত তার উদর ভিতর ॥
প্রথমে ভাঙ্গিল গ্রাম নামে কালিপুর। তার পরে ভাঙ্গিল রম্য পদ্ম সরোবর ॥
তার পরে ভাঙ্গিল গ্রাম ব্রাহ্মোননগরি। তার পরে ভাঙ্গিল গ্রাম কির্ত্তিভাসপুরি ॥
তার পরে ভাঙ্গিল গ্রাম নামে ভাগরাতলি। বদন ভরিয়া সবে বোল কালি২ ॥
তার পরে ভাঙ্গিল বরদা অন্তপ্পুর। পাসানের মন্দির প্রাচির হৈল চুড় ॥
এহি মতে ভাঙ্গীল গ্রাম নগর সারি২। তার পরে ভাঙ্গিলেক বিসারানগরি ॥
দির্গে দুই দিন পথ পাসে হাড়াই পর। দুই দণ্ডে ভাঙ্গিল তাহা নদি খরতর ॥
বিসারার বিসগ্রাম নদিয়ে ভাঙ্গিল। অন্য২ দেসের কথা তাহা না লিখীল ॥

পরে দেবীর আদেশে ছিকালির "মধ্যগ্রামে" অগ্নিযোগে জঙ্গল ভস্ম করিয়া নূতন মণ্ডপ নির্ম্মিত হইল। বঙ্গদেশ ও ছিকাইলের মাহাত্ম্যবর্ণনায় এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়। শেষ দুই অধ্যায়ে মহাকালী ও লিঙ্গমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে।

প্রতাপ রায় ও ধন্যমাণিক্য

বরদামঙ্গলে উল্লিখিত বরদাখাতের আদি জমীদার প্রতাপ রায়ের নাম "রাজমালা"র প্রায় সমস্ত প্রতিলিপিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৫২৬ খৃঃ) তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে "বঙ্গদেশ" জয় করিয়া,

গৌড়াধিপতি রাজ্য বরদাখাত আদি। রাজায়ে কাড়িয়া লৈল হইয়া বিরোধী ॥
বরদাখাতে জমিদার প্রতাপ মহামতি। গৌড়ে না মিলিয়া রাজা সঙ্গে করে প্রীতি ॥
(রাজমালা, ৯৭ পৃঃ এবং দ্বিতীয় লহর ১৩ পৃঃ)

হস্তলিখিত "প্রাচীন রাজমালা"য় আছে,—

গৌড়েশ্বরের আছিল বরদাখাত। তাহারে কাড়িয়া লৈল করিয়া বিবাদ ॥
তাহার জমীদার **প্রতাপ রায়** মিলে। গৌড়ে না মিলিল সে যে আপনার বলে ॥

অন্য প্রতিলিপিতেও পাওয়া যায়—

বরদাখাত আছিল গৌড়ের অধিকারে। নিজবাহুবলে রাজা জিনিল তাহারে ॥
প্রতাপ রায় নামে তার জমিদার ছিল। গৌড়েতে না মিলে সেই আইসে নিজদল ॥

ধন্য মাণিক্যের সহিত প্রতাপ রায়ের মিলন অনুমান ১৫০০ খ্রীঃ হইয়া থাকিবে। রাঢ়দেশে যে হাঙ্গামার ফলে প্রতাপ রায় বহু লোক জন সহ নৌকাপথে পূর্ব্বদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা নিঃসন্দেহ গৌড়ে হাব্‌সী রাজাদের অত্যাচারকালে ঘটিয়াছিল। ঐ সময়েই মহাপ্রভুর জন্মের পূর্ব্বে নবদ্বীপেও 'রাজভয়' উপস্থিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বিখ্যাত হুসেন সাহার রাজ্যারোহণের [১৪৯৩ খ্রীঃ] পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই অরাজকতা চলিয়াছিল। "শূদ্র" রাজা প্রতাপ রায় তাঁহার "কুলপুরোহিত" [বাৎস্য গোত্র, ঘোষাল গাঞি] কীর্ত্তিবাস ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় বরদাখাত পরগণায়, সম্ভবতঃ রাঢ়দেশের "বিশারা" গ্রামের নামানুসারে বিশারা নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাহারই একাংশে পদ্মসরোবর হইতে উদ্ধৃত "বরদেশ্বরী" মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে শ্যামগ্রাম হইতে ঐ মূর্ত্তি অপহৃত কিম্বা অন্তর্হিত হইয়াছে। তৎপর ৺কাশীধাম হইতে অনুরূপ মূর্ত্তি আনিয়া ছিকাইল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শববাহনা অথচ সিংহবাহিনী এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এবং তাঁহার অষ্টাক্ষর মন্ত্র কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না—সাধকশ্রেষ্ঠ "ভৈরবানন্দ" কীর্ত্তিবাসের ইহা এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। রাজমালার উক্তির সহিত সামঞ্জস্য থাকায় বরদামঙ্গলের প্রতাপ রায় ঘটিত বৃত্তান্তের সারাংশ ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তদনুসারে ১৫২৫-৩০ খ্রীঃ প্রতাপ রায় মতিচ্ছন্ন হইয়া নিহত হইয়াছিলেন অনুমান করা যায়। ভোলাচঙ্গ গ্রামের চৌধুরী বংশের আদিপুরুষ "প্রতাপ রায়" প্রায় এক শতাব্দী পরবর্ত্তী এবং ভিন্ন ব্যক্তি; তাঁহার অন্যতম প্রপৌত্র "রামবল্লভ দেব" ১১২৭ সনে [১৭২০ খ্রীঃ] দেবোত্তর সম্পত্তি পাইয়াছিলেন।

মোগল অধিকার

তৎপর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া বরদাখাত পরগণা '১২ জিলা'য় বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদারের হস্তগত হয়। জাহাঙ্গীরনগর সহর স্থাপিত হওয়ার পর "খাঞ্জা খাঁ" [বা বেগ] ও "কোড়র খাঁ" (বা কোড়র বেগ) নামক দুই জন মোগল সম্ভ্রান্ত পুরুষ বরদাখাত পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা একটি সম্পূর্ণ নূতন তথ্য সন্দেহ নাই। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম ভাগে খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে [১৬১০-২০ খ্রীঃ] এই ঘটনা স্থাপন করা যায়। তখন কীর্ত্তিবাসের পৌত্র মৃত্যুঞ্জয় এবং সুবিখ্যাত শ্যামগ্রামের রায়বংশের আদিপুরুষ "বাণী রায়" বিদ্যমান ছিলেন এবং এই সময় হইতেই "বরদেশ্বরী শারদীয় পূজার ৪দিন রায়বংশের গৃহে নীত হইয়া তাঁহাদের ধর্ম্মগৌরব খ্যাপন করিতেছিলেন। সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয় "শ্যামগ্রাম" নামক গ্রন্থে বাণী রায় ও তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের বিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন। বাণী রায়ের আবির্ভাবকাল সহজেই অনুমান করা যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠানুক্রমিক প্রপৌত্র "মনোহর রায়" (ওরফে জানকীবল্লভ রায়) গঙ্গামণ্ডলের জমীদার মির্জ্জা মহম্মদ জাফর হইতে ১১৬৩ সনে [১৭৫৬ খ্রীঃ] ওয়াইদপুর গ্রামে নিষ্কর ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোহরের পৌত্রদ্বয় উদয়চন্দ্র ও অনুপনারায়ণ ১২০২ সনে এই ভূমির বিবরণ দাখিল করিয়াছিলেন। এতদনুসারে বাণী রায়ের অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে [১৬০০-১৬৫০ খ্রীঃ মধ্যে] নির্ণীত হয়, তৎপূর্ব্বে নহে নিশ্চিত।

বরদামঙ্গল গ্রন্থানুসারে খাঞ্জা খাঁই বরদেশ্বরীর প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তি—"বিশারার সপ্তগ্রাম"—দান করিয়াছিলেন। এই দানপত্রের ও মোগলাধিকারের তারিখ ঠিক ১০২৩ সন [১৬১৬ খ্রীঃ] বলিয়া অনুমান করার কারণ আছে। ১২০২ সনে [১৭৯৫ খ্রীঃ] শ্রীকাইলের ভৈরববংশীয় ৩০ জন দখলকার দেবোত্তর সম্পত্তির যে পরিচয় প্রদান করেন, তাহাতে পাওয়া যায়, "মনুহর খা জমিদার, অখন জে ম্রজা আলি ও ম্রজা বাখর আলি ও ম্রজা হুসেন আলি জমিদার এহানগ পীতামহ ম্রজা মাহাম্মদ বাকর জমিদারের পূর্ব্বের" কাগজে, অনূ্ন ৬০ খানা বিভিন্ন গ্রামে, মোট ৩২।৶৯।৮ জমী "বরদেশ্বরী ঠাকুরাণী"র নামে দেবোত্তর দান করেন। সনদের তারিখ—"১০২৩ সন পীতা পীতামহের ঠাই শুনিয়াছি কিছু কম ২০০ বৎসর হইব।" [কুমিল্লা কালেক্টরীর ৪৩৯নং হকীকত লাখেরাজ] এই "মনুহর খাঁ" নিঃসন্দেহ ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলির প্রপৌত্র সুবিখ্যাত Munawwar Khan," যিনি সায়েস্তা খাঁর চট্টগ্রাম অভিযানে [১৬৬৫-৬খৃঃ] সাহায্য করিয়াছিলেন (*J. A. S. B.*, 1906, pp. 405-17) কিন্তু ১০২৩ সনে (১৬১৬ খ্রীঃ) এই মনোহর খাঁর জন্মই হয় নাই; কারণ, নবপ্রকাশিত "বাহার-ই-স্তান" গ্রন্থানুসারে মনোহর খাঁর পিতামহ 'মুসা খাঁ'র ১৬২৩-২৪ সালে মৃত্যুকালে মনোহর খাঁর পিতা 'মাসুম খাঁ'রই বয়স ছিল মাত্র ১৮-১৯ (*I. H. Q.*, Dec. 1935, P. 671), সুতরাং ভৈরববংশে পুরুষানুক্রমে প্রচারিত তারিখটি খাঞ্জা খাঁ ও কোঁড়র খাঁ প্রদত্ত প্রথম দেবোত্তর সম্পত্তির বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। বরদাখাত পরগণা ঈশা খাঁর অধিকৃত ২২ পরগণার অন্তর্ভুক্ত

ছিল। ইস্‌লাম খাঁর মোগলবাহিনীর সহিত মুসা খাঁর সঙ্ঘর্ষ ১৬১১ খ্রীঃ ঘটে। ঐ সময়ে বরদাখাতেও মোগল অধিকার সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। এই সঙ্ঘর্ষের স্মৃতি এবং প্রমাণ এখনও বিদ্যমান আছে। "মির্জ্জা তাস বেগ" নামক একজন মোগল সেনাপতি "মোচাগারা" (মুরাদনগরের নিকট) গ্রামে ছাউনী করিয়া রাজাচাপীতলার তেলী রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন—"রণছোপ" প্রভৃতি গ্রামের নাম এখনও এই যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে। এই বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ তাস বেগ তাঁহার পুত্রের নাম "ফতে বেগ" রাখিয়াছিলেন। ইহাঁর বংশধরগণ পরে সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে যাত্রাপুর গ্রামে "খোসবাশ" বিত্ত লাভ করেন, সনদের তারিখ "৩৩ জলুশ ২৮ শফর" (১৬৮৮-৮৯ খ্রীঃ)। এই সনদ আমরা দেখিয়াছি। যাত্রাপুরের সম্ভ্রান্ত 'মির্জ্জা' বংশ এখনও এই খানেবাড়ি ভোগ করিতেছে।

বিশারা হইতে ছিকাইল

অনুমান ১৬৪০ খ্রীঃ কীর্ত্তিবাসের প্রপৌত্র গঙ্গারামের সময়ে "বিশারার বিশ গ্রাম" নদীতে নিমজ্জিত হয়, এই সম্পূর্ণ নূতন তথ্য বরদামঙ্গলের অতি অদ্ভুত "বচিকামৎস্যের সমুদ্রযাত্রা" কাহিনীর সারাংশরূপে গ্রহণ করা যায়। সুতরাং অন্যূন ১৫০ বৎসর বিশারার পাষাণ-মন্দিরে অধিষ্ঠান করিয়া ৺বরদেশ্বরী ছিকাইল গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 'বরদামঙ্গল' গ্রন্থে এবং সমস্ত প্রাচীন দলিলপত্রে এই গ্রামের নাম 'ছিকাইল' বলিয়া লিখিত হইয়াছে, পরে ইহা বিশুদ্ধ করিয়া বর্ত্তমান 'শ্রীকাইল' নাম প্রচারিত হয়। গ্রামটী পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ভূমি হইতে অনেকটা উচ্চ, ইহা অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। ভৈরববংশই এই গ্রামের আদিম অধিবাসী। গঙ্গারামের তিন পুত্র রাঘব, রামেশ্বর ও সনাতন হইতে তিন ধারার সৃষ্টি হইয়াছে—বর্ত্তমানে কীর্ত্তিবাস ব্রহ্মচারী হইতে ১১-১৪ পুরুষ চলিতেছে। গ্রামে একটী সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ বিদ্যমান আছে—মৌদ্‌গল্য গোত্র, নয়দাসের সন্তান। এই বংশীয় কৃতী পুরুষ (গৌরচন্দ্র দারোগার পিতা) জগন্নাথ রায় প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে বরদেশ্বরীর বর্ত্তমান পাকা মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পত্নী 'সর্ব্বেশ্বরী' বরদেশ্বরীর সাক্ষাৎ অনুগ্রহপাত্রী ছিলেন।

শ্রীকাইলের ভৈরববংশ ব্যতীত বরদাখাতের দুইটি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশ বিলুপ্ত 'বিশারা' সমাজের স্মৃতি বহন করিতেছে। আমরা তাঁহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

শ্যামগ্রামের রায়বংশ: বরদামঙ্গল আবিষ্কার ও নূতন গবেষণার ফলে এই বংশের আদিকথা নূতন করিয়া লিখিতে হইবে। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে 'বাণী রায়'ই প্রথম মোগল আমলে এদেশে আসেন ('শ্যামগ্রাম,' পৃঃ ৫১-৩)। কিন্তু বরদামঙ্গলে দেখা যায়, মোগল অধিকারের পূর্ব্বেই বাণী রায় বিশারার অন্তর্ভূত 'ভাগরাতলি' গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং বিশারার সহিত এই গ্রামও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বরদেশ্বরীর নির্দ্দেশমতে

ভাগরাতলির উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত 'অতি খিল বিল ঝিল' শ্যামগ্রাম নামক স্থানে বাণী রায়ই উঠিয়া আসেন। 'ভাগরাতলি' নামটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি আমরা প্রমাণ পাইয়াছি যে, বাণী রায়ের পিতামহও এই দেশের অধিবাসী ছিলেন। ঢাকা জেলায় মহেশ্বরদি পরগণার উত্তরে 'নৌলাকোট' নামে একটি নাতিবৃহৎ জোয়ার আছে। তাহার আদিম ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী ভরদ্বাজগোত্রীয় 'ভৌমিক' বংশ তদ্দেশে এখনও সম্মানিত। এই বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণানন্দ রায়, তৎপুত্র হরি রায়, তৎপুত্র বনমালী মিশ্র ও তৎপুত্র শ্রীমন্ত রায়। একটি প্রাচীন কুরচীনামায় শ্রীমন্ত সম্বন্ধে পাওয়া যায় "তস্য দ্বৌ পুত্রৌ, কন্যৈকা তদ্বিবাহকৃত বরদাখাৎ হৃদয়ানন্দ রায় তৎপুত্র রূপনারায়ণ রায়।" এই রূপনারায়ণ রায়ের (সংক্ষেপে রূপ রায়ের) পুত্রই বাণী রায় বটে ('শ্যামগ্রাম,' পৃঃ ৬৫)। উক্ত শ্রীমন্ত রায়ের অধস্তন পঞ্চদশ পুরুষ আমাদের সম্পর্কিত। হৃদয়ানন্দ রায় খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৫২৫-৫০ খ্রীঃ) জীবিত ছিলেন সন্দেহ নাই এবং তিনি এদেশে অতি সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করায় বুঝা যায়, তাঁহার পিতাই সম্ভবতঃ প্রতাপ রায়ের সমসময়ে এ দেশে প্রথম আসিয়া বিশারা সমাজের গৌরব বৃদ্ধি করেন। বাণী রায়ের পুত্র শ্রীবল্লভ রায়ের সময়ে শ্রীকাইল হইতে ৺বরদেশ্বরীর যাতায়াত বিষয়ে রাজাচাপীতলার তেলীরাজবংশীয় "অঙ্গদ রায়ে"র সহিত ব্রাহ্মণ রায়বংশের ভীষণ সংঘর্ষ ঘটে এবং অঙ্গদ রায় সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া বরদাখাত পরিত্যাগ করিয়া সোনারগাঁয়ে আশ্রয় নিয়াছিলেন। অঙ্গদ রায়ের বংশে প্রবাদ আছে, তাঁহারা পরগণার ॥৶০ অংশের ইজারাদার ছিলেন এবং বাকী ।৶০ শ্যামগ্রামের রায়বংশের ইজারা ছিল।

চাপীতলার ভট্টাচার্য্যবংশ। উল্লিখিত অঙ্গদ রায় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী ছিলেন এবং তাঁহার মাতার কল্যাণার্থে একটি 'স্বস্ত্যয়ন' কর্ম্মে নিযুক্ত করার জন্য চাপীতলার ভট্টাচার্য্য-বংশীয় অশূদ্রপ্রতিগ্রাহী 'নরসিংহ বাচস্পতি'কে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া ৭ দিন আটক রাখিয়া তাঁহার স্বীকারোক্তি আদায় করেন। নরসিংহ বাণী রায়ের সমসাময়িক; তাঁহার স্বহস্তলিখিত 'ভট্টিকাব্যে'র লিপিকাল ১৫৪৯ শকাব্দ (১৬২৭ খ্রীঃ) এবং ১০৯৫ সনে (১৬৮৮) অতি প্রাচীন বয়সে পুত্র পৌত্র সহ 'রাজাচাপীতলা' গ্রামে আসিয়া তদানীন্তন জমীদার মির্জা মাহাম্মদ বাখরের নিকট ৶১৫ নিষ্কর ভূমি দান পাইয়াছিলেন। (১৫৫৯নং হকীকত লাখেরাজ দ্রষ্টব্য)। নরসিংহের প্রপিতামহ [সর্ব্ববিদ্যাসিদ্ধ সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের 'জ্ঞাতিভ্রাতা'] 'নন্দনন্দন ন্যায়পঞ্চানন' প্রথম রাঢ়দেশ হইতে, প্রতাপ রায়ের সমসময়ে, 'বিশারা' আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পুত্র যদুনন্দন সার্ব্বভৌম এবং পৌত্র কৃষ্ণানন্দ শিরোমণিও বিশারার অধিবাসী ছিলেন। বিশারা সমাজে এই বংশের পাণ্ডিত্যপ্রতিষ্ঠার সূচক একটি প্রাচীন ছড়া প্রচলিত আছে :—

আগানগর দোবাচাইল, তারা না জানে পরব পাইল।
বিশারার থে সম্বাদ আইল তবে ভিজা আউল্যা চাইল ॥

বিশারা ধ্বংস হইলে কৃষ্ণানন্দের পুত্র উক্ত নরসিংহ বাচস্পতি প্রথম 'ব্রাহ্মণ চাপীতলা' গ্রামে উঠিয়া আসেন—ঐ গ্রামে 'ভট্টাইজের দীঘি' নামে একটী প্রাচীন জলাশয় তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তৎপর তাঁহার অঙ্গদ রায়ের সহিত সঙ্ঘর্ষ এবং রাজাচাপীতলায় আগমন উল্লিখিত হইয়াছে। এই পুরুষানুক্রমিক প্রবাদের সহিত বরদামঙ্গলের উক্তির আশ্চর্য্য মিল রহিয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীকাইলের ভৈরববংশ এই বংশের মন্ত্রশিষ্য বটে।

বিদ্যাপতির পদাবলীর সংস্করণ

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সুপণ্ডিত ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদকত্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বিদ্যাপতির এক বিস্তৃত পদাবলীসংগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহা নিঃশেষিত হওয়ায় অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র তাহার এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিদ্যাপতির নামে যে অনেক অবিদ্যাপতির পদ চলিতেছে, তাহা পদাবলীসাহিত্যে পারদর্শী ৺সতীশচন্দ্র রায়, অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জন মনীষী দেখাইয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমানে লোচন কবির রাগতরঙ্গিণী (দরভঙ্গা বীণা প্রেস, ১৯৩৪) এবং ৺শিবনন্দন ঠাকুর এম. এ. সঙ্কলিত মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী (মৈথিলী-সাহিত্য-পরিষদ্, লহেরিয়া সরায়, ১৯৪১) প্রকাশিত হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় রাগতরঙ্গিণী হইতে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, তাহাদের অনেকের ভণিতা পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইয়া দিয়াছেন। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, হয় ত অন্য রাগতরঙ্গিণীর পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যাপতির নাম ছিল, তবে তাঁহাকে তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তবে গুপ্ত মহাশয় যখন পদকল্পতরুর নয়টি পদের শেখর ভণিতা স্থলে কবিশেখর ভণিতা গড়িয়া বিদ্যাপতির নামে চালাইতে সঙ্কুচিত হন নাই, তখন তাঁহার পক্ষে ভণিতা পরিবর্ত্তন (হয় ত সরল বিশ্বাসে) অস্বাভাবিক নহে (দ্রষ্টব্য—সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত শ্রীশ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, ২১৫ পৃ.)।

ক। আমি এক্ষণে রাগতরঙ্গিণীর ভণিতা পরিবর্ত্তনসমূহ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।—

(১) গুপ্তের ৪৮৪ নং (বিদ্যাভূষণের ৪৯৮ নং, ছাপার ভুলে ৪৯৭ নং) পদের ভণিতা—

ভণই বিদ্যাপতি নব কবিসেখর
পুহবী দোসর কহাঁ।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক জঁহা॥

কিন্তু রাগতরঙ্গিণীতে আছে (৬৭ পৃঃ)—

ভণই জসোধর নব কবিশেখর
পুহবী তেসর কাঁহা।
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ সম নাগর
মালতি সেনিক তাঁহা॥

এই সাহ হুসেন বাঙ্গালার বিদ্যোৎসাহী সুলতান আলাউদ্দীন হুসয়ন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ অঃ), বিদ্যাপতি সেই সময় জীবিত ছিলেন না। যশোধর খান নামক এক বাঙ্গালী কবি একটি ব্রজবুলি পদে হুসয়ন শাহের প্রশংসা করিয়াছেন।

শ্রীযুত হুসন জগত ভূষণ
সোহ এ রস জান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর
ভনে যশরাজ খান ॥

কবি যশোধরের কোনও পরিচয় জানা যায় নাই। কিন্তু যশোরাজ খান সুপরিচিত। এক্ষণে নিশ্চিত যে, পদটি বিদ্যাপতির নহে। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, যশোধর যশোরাজের ভ্রান্ত পাঠ কি না। উভয়েরই পদ ব্রজবুলিতে এবং উভয়েই হুসন শাহের সমসাময়িক। সম্ভবত কবির নাম যশোধর, সংক্ষেপে যশ এবং রাজ খান উপাধি। তুলনীয় গুণরাজ খান।

২। গুপ্তের ১৯ নং (বিদ্যাভূষণের ৬৩ নং) পদের ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি পুরব পুনতহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ সিবসিংহ
লখিমা দেইকর কন্ত রে ॥

রাগতরঙ্গিণীতে (পৃঃ ৭২) পাইতেছি—

গজসিংহ ভন এহু পুরব পুনতহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে।
বুঝএ সকল রস নৃপ পুরুষোত্তম
অসমতি দেইকর কন্ত রে ॥

খুব সম্ভবত এই নৃপ পুরুষোত্তম মিথিলেশ্বর ভৈরব সিংহের পুত্র। তিনি উড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম নহেন (১৪৭০-১৪৯৭ খ্রীঃ)। গজসিংহের আরও একটি পদের ভণিতা পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, ইহা (১৯ নং পদ) তালপত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণীতে আছে। তালপত্রের পুথি এক্ষণে অদৃশ্য। সুতরাং তাহার কি পাঠ ছিল, তাহা আবিষ্কার

৩। গুপ্তের ৬৩৫ নং (বিদ্যাভূষণের ৬৪১ নং) পদের ভণিতা—

বিদ্যাপতি কহ সুন্দরি
মন ধীরজ ধরু রে।
অচিরে মিলত তোর প্রিয়তম
মন দুখ পরিহরু রে ॥

রাগতরঙ্গিণীতে (৬৮ পৃঃ) আছে—

গজসিংহ কহ দুখ ছাড়ত
সুনহ বিরহি জন রে।
নৃপ পুরুষোত্তম সহি রহ
তেহি দয়াঞে মিলু রে ॥

গজসিংহের আর একটি পদ রাগতরঙ্গিণীতে (৫৮ পৃঃ) উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে নৃপ পুরুষোত্তমের স্থলে 'কুমর সিরি গজসিংহ' উল্লিখিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি (গুপ্তের '৪১৮ নং পদে) 'হাসিনি দেবিপতি গজসিংহ দেব'এর উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবত এই গজসিংহ মিথিলার রাজবংশীয় ছিলেন।

৪। গুপ্তের ১৬ নং (বিদ্যাভূষণের ৬১ নং) পদের ভণিতা—

ভণই বিদ্যাপতি গাবে।
বড় পুন গুণমতি পুনমত পাবে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৭ পৃঃ) আছে—

কবি রতনাঞ্রী ভাণেঁ সঙ্ক কলঙ্ক দুঅও অসমানে॥
মিলু রতি মদন সমাজা দেবল দেবি লখন চন্দ রাজা।

কবি রতন (রতনাঞ্রী) বিদ্যাপতির উপাধি হইতে পারে না। কবি রতনের আর একটি পদ গুপ্তের হরগৌরী পদে (৫০২ পৃঃ) এবং বিদ্যাভূষণের ৯১৬ নং পদে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ রাগতরঙ্গিণীতেও (১০৫ পৃঃ) আছে। কবি রতনের স্তুত রাজা লখনচন্দের দুইটি চণ্ডীবিষয়ক পদ রাগতরঙ্গিণীতে (৮৮ এবং ১০৯ পৃঃ) আছে। তিনি কে ছিলেন, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

৫। গুপ্তের ৬০ নং (বিদ্যাভূষণের ৮ নং) পদের ভণিতা—

দানকলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপতি হিন্দু সুরতান রে।
মেধা দেবিপতি রূপ নরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহার রে॥

রাগতরঙ্গিণীর (১১২ পৃঃ) ভণিতা—

দান-কলপতরু মেদিনি অবতরু
নৃপ হিন্দু সুলতানে।
মেধা দেই পতি রূপনরাএন
প্রণবি জীবনাথ ভানে॥

কবিকণ্ঠহার বিদ্যাপতির উপাধি বটে। কিন্তু ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা সুরতানএর সহিত মিলের অভাবে ধরা পড়ে।

৬। গুপ্তের ৫৯ নং (বিদ্যাভূষণের ৭ নং) পদের ভণিতা—

সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
বিদ্যাপতি ভন সারে।
কংস দলন নারায়ন সুন্দর
মিলল নন্দ কুমারে॥

রাগতরঙ্গিণীতে (১০০ পৃঃ) আছে—

সুকৃতি সুফল সুনহ সুন্দরি
গোবিন্দ-বচন সারে।
সোরম-রমন কংস নরাএন
মিলত নন্দকুমারে॥

এই কংসনারায়ণ মিথিলার রাজা ছিলেন। তিনি ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের অগ্রপশ্চাৎ কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন (*J. A. S. B.* 1903, p. 19)। তাঁহার সময়ে বিদ্যাপতি বিদ্যমান থাকিতে পারেন না। তিনি একজন কবি ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পদ নেপালের পুথিতে (গুপ্তের ৪৭৯) এবং রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাগতরঙ্গিণীর ৯৭ পৃষ্ঠার পদে কংসনারায়ণ নসিরা সাহ সুরতানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি যে গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহ (১৫১৯—১৫৩২ খ্রীঃ অঃ), তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ভণিতাটি এই—

সুমুখি সমাদ সমাদরে সমদল
নসিরা সাহ সুরতানে।
নসিরা ভূপতি সোরম দেই পতি
কংস নরাএন ভানে।

কংসদলন নারায়ণ এই কংসনারায়ণ হইতে পৃথক্। বিদ্যাপতি-রচিত দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে মিথিলা-রাজবংশীয় চন্দ্রসিংহকে "রিপুরাজ কংসদলন প্রত্যক্ষ নারায়ণ" উপাধি দেওয়া হইয়াছে। ইহারই সংক্ষেপে কংসদলন নারায়ণ। তিনি কংসনারায়ণের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ অর্থাৎ পিতামহের সমকালীন। তাঁহার স্ত্রীর নাম লছিমা। কংসনারায়ণের স্ত্রীর নাম সোরম। ইহা বিদ্যাপতির পদ হইতে জানা যায়। মিথিলেশ্বর ভৈরব সিংহেরও উপাধি কংসনারায়ণ ছিল বলিয়া নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন (বিদ্যাপতি, ৩০ পৃঃ, ২য় স্তম্ভ)। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীদের নাম ছিল জয়া এবং জসমা।

৭। গুপ্তের ৪৮ নং (বিদ্যাভূষণের ৭২ নং) এবং কীর্ত্তনানন্দে ভণিতা—

বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গাব।
বড় পুনে রসবতি রসিক রিঝাব॥

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৭ পৃঃ) আছে—

কংস নরায়ন কৌতুক গাবৈ,
পুনফলে পুনমত গুণমতি পাবৈ।

৮। গুপ্তের ৫২৩ নং (বিদ্যাভূষণের ৫৩৭ নং) পদের ভণিতা—

বিদ্যাপতি ভন কংস নারাএণ
সোরম দেই সমাজ।

রাগতরঙ্গিণীতে (১০২ পৃঃ) ভণিতা আছে—

দাস গোবিন্দ ভন কংস নরাএন
সোরম দেই সমাজ।

দাস গোবিন্দ কংসনারায়ণের বিনয়সূচক বিশেষণ। এই পদ তাঁহারই রচিত, বিদ্যাপতির নহে।

৯। গুপ্তের ১২৬ নং (বিদ্যাভূষণের ১২৯ নং) পদের ভণিতা—

কবি বিদ্যাপতি ভানে
নৃপ সিবসিংহ রস জানে
নর কাহ্নে লো।

রাগতরঙ্গিণীর (৯৫ পৃঃ) ভণিতা—

ভবানী নাথ হেন ভাণে,
নৃপ দেব জত রস জানে।
নব কানৃহে লো ॥

১০। গুপ্তের ৭৯২ নং (বিদ্যাভূষণের ৭৮৫ নং) পদের ভণিতা—

ধৈরজ ধরু বিদ্যাপতি ভান।

রাগতরঙ্গিণীতে (৯৮ পৃঃ) আছে—

ধৈরজ কর ধরণী ধর ভাঁন।

সুতরাং পদটি ধরণীধরের, বিদ্যাপতির নহে।

১১। গুপ্তের ৩১৭ নং (বিদ্যাভূষণের ৩০৪ নং) পদের ভণিতায় আছে—

ভনই অমি কর　　সুনহ মধুর পতি
রাধা চরিত অপারে।
রাজা সিব সিংহ　　রূপ নরাঅন
সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে ॥

রাগতরঙ্গিণীতে ভণিতা (৮৫ পৃঃ)—

ভনই অমিঅ কর　　সুনু মথুরাপতি
রাধা চরিত অপারে।
রাজা সিব সিংহ　　রূপ নরাএন
লখিমা দেই কণ্ঠহারে ॥

এই পদটি অমিঅ করের (অমৃত করের)। লখিমা দেই কণ্ঠহার (লক্ষ্মী দেবী কণ্ঠহার) শিব সিংহের বিশেষণ। অমৃত করের আরও দুইটি পদ মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলীতে (৬৮ এবং ৮২ নং) উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি শিব সিংহের মন্ত্রী চন্দ্র করের পুত্র ছিলেন।

১২। বিদ্যাভূষণের ৩৩ নং পদের ভণিতা—

ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগর
রাই রূপ হেরি গর গর অন্তর।

রাগতরঙ্গিণীতে (৪৫ পৃঃ) ভণিতা—

কবি শেখর ভন অপরূব রূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখি।

গুপ্ত মহাশয় (৩৪ নং পদে) এই ভণিতাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই কবিশেখর দৈবকী-নন্দন সিংহ। তিনি গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন নুসরৎ শাহের (১৫১৯-১৫৩২) সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এই পদ বিদ্যাপতির হইতে পারে না।

১৩। গুপ্তের ৫৭৬ নং (বিদ্যাভূষণের ৫৮৩ নং) পদের ভণিতা—

বিদ্যাপতি কবিবর এই গাব।
সকল অধিক ভেল মনমথ ভাব॥

রাগতরঙ্গিণীর (১১৫ পৃ.) ভণিতা—

রসময় শ্যাম সুন্দর কবি গাব, সকল অধিক ভেল মনমথ ভাব।
কৃষ্ণ নরাএণ ঈ রস জান, কমলাবতি পতি গুনক নিধান॥

এই পদটি বিদ্যাপতির হইতে পারে না। তিনি কোনও কবিতায় কমলাবতীপতি কৃষ্ণ-নারায়ণের উল্লেখ করেন নাই। এই কৃষ্ণনারায়ণ মিথিলার রাজবংশীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবির নাম ভণিতাতে প্রকাশ শ্যামসুন্দর। ইঁহার আর কোনও পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

১৪। গুপ্তের ৩৬০ নং পদ ভণিতাবিহীন। তাহা রাগতরঙ্গিণীর (পৃ. ৪৮) হইতে গৃহীত। সেখানে এই পদের পর লিখিত আছে—"ইত্যাদি রাজ্ঞঃ শ্রীনিবাসমল্লস্য"। সুতরাং ইহা রাজা শ্রীনিবাস মল্লের রচিত। তিনি কে, তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবত তিনি মল্লভূমির রাজা ছিলেন।

১৫। গুপ্তের ৭১২ নং পদ ভণিতাবিহীন। তাহা তালপত্রের পুথি হইতে উদ্ধৃত বলা হইয়াছে। কিন্তু রাগতরঙ্গিণীতে (১০২ পৃ.) তাহা দৃষ্ট হয়। তাহার ভণিতা—

মধুসূদন ভন মনে অবধারি
কী ধৈরজেঁ নহি মিলত মুরারি।

সুতরাং ইহা মধুসূদন নামক কবির পদ।

খ। আমি এক্ষণে পদাবলীর ভণিতা বিচার করিব। গুপ্ত মহাশয়ের অবলম্বিত নেপালের পুথি, তালপত্রের পুথি ও রাগতরঙ্গিণী এবং মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী হইতে বিদ্যাপতির উপাধিগুলি নির্দ্দেশ করিব।

১। কবিকণ্ঠহার, সুকবিকণ্ঠহার, বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার, সরস কবিকণ্ঠহার—এই উপাধিগুলি পূর্ব্বোল্লিখিত চারি পুস্তকেই পাওয়া যায়। ইহাদের অতিরিক্ত কীর্ত্তনানন্দের ও

মিথিলার পদেও পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে আমরা বিদ্যাপতির বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

২। সরস কবি, সরস কবি বিদ্যাপতি—উপরি উল্লিখিত চারি পুস্তকেই এই উপাধি দেখা যায়। সুতরাং এই ভণিতাযুক্ত পদগুলি আমরা বিদ্যাপতির বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

৩। অভিনব জয়দেব। তালপত্রের পুথিতে এবং মৈথিলী বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ পদাবলীতে দেখা যায়। মাত্র পাঁচটি পদে এই উপাধি আছে। গুপ্তের নং ২২৭, ৫৫৩, ৫৯৯ এবং মৈথিলী বিদ্যাপতির ৫০ ও ৭৯ ক পদে। গুপ্তের বিদ্যাপতির পদাবলীর ৫২০ পৃষ্ঠার পদের ভণিতা সুকবি নব জয়দেব। এই পদগুলিকে আমরা বিদ্যাপতির বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

৪। বিদ্যাপতি। এই ভণিতার পদগুলি বিচারসাপেক্ষ। নবকবিশেখর, কবিশেখর, শেখর, শেখর রায়, রায় শেখর, কবিরঞ্জন—এই ভণিতাগুলির কোনও পদ (দুইটি ব্যতীত) পূর্ব্বোল্লিখিত প্রামাণিক কোনও পুস্তকে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাহাদের অনেক পদ বিদ্যাপতির ভণিতায় পদকল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ, গীতচিন্তামণি প্রভৃতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ৺নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্রের বিদ্যাপতির পদাবলীতে নির্বিচারে এইগুলি গৃহীত হইয়াছে। নব কবিশেখর, কবিশেখর, শেখর, রায় শেখর, শেখর রায়, কবিরঞ্জন ভণিতার সমস্ত পদ বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে বাদ দিতে হইবে। ইহাতে ৫৪টি পদ বাদ পড়িয়া যাইবে। গুপ্তের ৬৮৪ নং পদে নবকবিশেখর তালপত্রের পুথিতে যে যশোধর স্থলে ভ্রমে বিদ্যাপতির নামের সহিত উপাধিস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে রাগতরঙ্গিণীর প্রমাণে সাব্যস্ত করা হইয়াছে। গুপ্তের ৩৪নং পদ রাগতরঙ্গিণী হইতে কবিশেখর ভণিতা সহ উদ্ধৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, এই কবিশেখর দৈবকীনন্দন সিংহ, বিদ্যাপতি নহেন।

গ। (১) সম্পাদক গুপ্ত মহাশয় বলেন যে, তালপত্রের ও নেপালের পুথি দুইটিতে সমস্ত পদই বিদ্যাপতির। এই জন্য তাহাদের ভণিতাহীন পদগুলিও বিদ্যাপতির পদাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে। তালপত্রের পুথি যে সম্পূর্ণরূপে নির্ভরযোগ্য নহে, তাহার একটি প্রমাণ—যশোধর স্থলে বিদ্যাপতি পাঠ গ্রহণ, যেমন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরও প্রমাণ দিতেছি। গুপ্তের ৫৬৬ নং পদটি উমাপতির পারিজাতহরণ নাটকে পাওয়া যায় ; সুতরাং তাহা উমাপতির রচিত। কিন্তু তালপত্রের পুথিতে উমাপতি স্থলে বিদ্যাপতি ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, গুপ্তের ৩১৭ নং পদটি অমৃত করের, কিন্তু তাহাতে ভ্রান্ত পাঠ "সুকবি ভনথি কণ্ঠহারে" ব্যবহার দ্বারা বিদ্যাপতির পদ বলিয়া ধারণা করা হইয়াছে। গুপ্তের ৫০৯ নং পদটি সিংহভূপতির এবং ৭৮৩ নং পদটি পঞ্চাননের। তাহা ভণিতা হইতে স্পষ্টত জানা যায়। ৭১২ নং পদে ভণিতা নাই। কিন্তু পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, তাহা মধুসূদন কবির। পূর্ব্বে আরও দেখান হইয়াছে যে, তালপত্রের পুথি

হইতে উদ্ধৃত গুপ্তের ১৬, ১৯ এবং ৬০ নং পদগুলি যথাক্রমে কবিরতন, গজসিংহ এবং জীবনাথের, কিন্তু সেগুলিতে বিদ্যাপতির ভণিতা দেওয়া হইয়াছে। তালপত্রের পুথি অপেক্ষা অবশ্য নেপালের পুথি অনেকটা প্রামাণিক। তাহাতেও কিছু অন্য কবির পদ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ গুপ্তের ১৬৩, ৩২২, ৪৭৯ এবং ৫০১ নং পদ লওয়া যাইতে পারে। এই চারিটি পদ যথাক্রমে লক্ষ্মীনাথ, ভানু, কংসনারায়ণ ও রুদ্রধরের—যেমন ভণিতায় স্পষ্ট আছে। সুতরাং বিদ্যাপতির পদাবলীর বিশুদ্ধ সংস্করণের জন্য তালপত্রের ও নেপালের পুথির ভণিতাবিহীন পদগুলি ত্যাগ করিতে হইবে। তবে অন্য প্রমাণে যদি কোনও পদ বিদ্যাপতির বলিয়া জানা যায়, তবে তাহা অবশ্য গ্রহণ করা হইবে, যেমন নেপালের পুথি হইতে উদ্ধৃত গুপ্তের ৯২, ২১৮, ৪৪৪, ৫৮৮ ভণিতাহীন পদগুলির মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলীতে (৩৫, ২৭, ৩৯, ৪৫ নং পদে) বিদ্যাপতির ভণিতা আছে। তালপত্রের পুথি হইতে উদ্ধৃত গুপ্তের ২৪০ নং পদের বিদ্যাপতির ভণিতা এই শেষোক্ত পুস্তকের ৭০ নং পদে আছে। গুপ্তের সংস্করণে তালপত্রের পুথি, নেপালের পুথি এবং উভয় হইতে উদ্ধৃত ভণিতাহীন পদের সংখ্যা যথাক্রমে ৩১, ১০৩ এবং ৪। ইহাদের মধ্যে পাঁচটি পদের বিদ্যাপতি ভণিতা পুস্তকান্তরে পাওয়া গিয়াছে। এই মোট ১৩৮টির মধ্যে ১৩৩টি পদ সন্দেহজনক বলিয়া বাদ দেওয়া উচিত।

(২) এতদ্ভিন্ন সম্পাদকগণ পদকল্পতরু, কীর্ত্তনানন্দ, গীতচিন্তামণি, রসমঞ্জরী প্রভৃতি পদসংগ্রহ-পুস্তক হইতে ভণিতাহীন ৫৬টি পদ বিদ্যাপতির পদাবলীতে গ্রহণ করিয়াছেন। পদের সংখ্যা বাড়ান ভিন্ন তাহাদের লওয়ার কি কারণ আছে, জানি না। আমার বিবেচনায় বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সংস্করণে এই ৫৬টি পদ অবশ্য বর্জ্জনীয়।

ঘ। আমি এক্ষণে অন্যের ভণিতাযুক্ত পদগুলির পরিচয় দিতেছি। এগুলি যে বিদ্যাপতির নহে, ভণিতাই তাহার প্রমাণ। সুতরাং এই পদগুলি বিদ্যাপতির পদাবলী হইতে বাদ দিতে হইবে। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণের (নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত) পদসংখ্যা দিব।

১। কবি চম্পতি ৩৪৭, ৪০১, ৪২০। সম্ভবত চম্পতি পতি ও কবি চম্পতি অভিন্ন। চম্পতি পতি—৩৯৪, ৫৭৩।

২। কংসনারায়ণ—৪৭৯ (নেপালের পুথি)।

৩। নৃপসিংহ—৯৪। সম্ভবত সিংহ ভূপতি ও নৃপসিংহ অভিন্ন। সিংহ ভূপতি—১৭৫, ৩৭৮, ৫০৯ (তালপত্র), ৫৯১, ৭৩০, ৮১৫।

৪। পঞ্চানন—৭৮৩।

৫। বল্লভ—৮৯, ৯০, ১৩৬, ১৭৭, ১৯৪, ২৫৭, ২৮৪, ৫৯০।

৬। ভানু—৩২২ (নেপালের পুথি)।

৭। ভূপতি—৩৮০, ৫৩৬, ৭৫৮, ৭৬১। সম্ভবতঃ ভূপতি ও ভূপতিনাথ অভিন্ন। ভূপতিনাথ—৩৭৫, ৪১৯।

৮। রুদ্রধর—৫০১ (নেপালের পুথি)।

৯। লক্ষ্মীনাথ—১৬৩ (নেপালের পুথি)। সম্ভবত লক্ষ্মীনাথ ও লক্ষ্মীনারায়ণ এক। লক্ষ্মীনারায়ণ—৮২৯।

১০। দশ অবধান—৫২৯ পৃষ্ঠা। মিথিলার ঐতিহ্য যে, দশ অবধান বিদ্যাপতির উপাধি। কিন্তু ইহার প্রমাণ কি?

১১। বিদ্যাপতি ও দাস গোবিন্দের মিশ্রিত ভণিতায় ৮৬, ২১০, ৫৩৮, ৫৯৬, ৬৬৯। এইগুলি সন্দেহজনক।

১২। বিদ্যাপতি ও রাধামোহনের মিশ্রিত ভণিতায়—৬১৫। এটি সন্দেহজনক।

এই সমস্ত বিভিন্ন ভণিতাযুক্ত পদের সংখ্যা মোট ৩৯টি। এগুলিও বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সংস্করণে বর্জ্জনীয়।

৬। আমরা এক্ষণে বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত পদগুলির আলোচনা করিব। পূর্ব্বে রাগতরঙ্গিণীর সাহায্যে দেখান হইয়াছে যে, কতকগুলি অবিদ্যাপতির পদ বিদ্যাপতির নামে চালান হইয়াছে। এ স্থলে আমরা বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত কতকগুলি পদের আলোচনা করিব।

৯ নং—পদকল্পতরু ৮৩ সংখ্যায় বিদ্যাপতির ভণিতা আছে বটে, কিন্তু গীতচিন্তামণিতে বিদ্যাবল্লভ পাঠ দেখা যায়।

৪৪ নং—পদটি বিখ্যাত। কীর্ত্তনানন্দের ভণিতা—

নসীর সাহ ভানে
মুঝে হানল নয়ন বানে
চীরেঁ জীব রহু পঞ্চ গৌড়েসর
কবি বিদ্যাপতি ভাণে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিসংরক্ষক সম্প্রতি পরলোকগত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে আমরা পাইতেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮নং পুথিতে ভণিতা—

সাহা হুসেন জানে
জাকে হানল বদন বানে
চিরঞ্জীবী রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভানে।

৺সুধীরচন্দ্র রায় এবং শ্রীঅপর্ণা দেবীর সম্পাদিত কীর্ত্তনপদাবলীর ভণিতা—

ঈসত হাসনি সনে
মুঝে—হানল নয়ন বানে
চীরঞ্জীর রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর
শ্রীকবি রঞ্জন ভনে।

মূলে অবশ্য নসীরা সাহ কিংবা সাহা হুসেনের নাম ছিল। বিদ্যাপতি সুলতান হুসয়ন শাহ কিম্বা নাসিরুদ্দীন নুসরত শাহের সময় বিদ্যমান ছিলেন না। সুতরাং এই পদটি কবিরঞ্জনেরই বটে। তাঁহার অন্যতর উপাধি বিদ্যাপতি ছিল। ইনি বাঙ্গালী বিদ্যাপতি বা ছোট বিদ্যাপতি।

১৩২ নং—পদকল্পলতিকায় কবিশেখর পাঠ আছে। এই পদের টীকায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বলেন, "যেখানে যেখানে কবিশেখর আছে, সেই সেই পদে প্রাচীন অথবা আধুনিক সংগ্রহকারগণ পরিবর্ত্তন করিয়া বিদ্যাপতি করিয়া দিয়াছেন।"

১৬৮ নং—ভণিতার পাঠান্তরে কবিরঞ্জন আছে।

৩৬৬ নং—ইহা উমাপতির পারিজাতহরণ নাটকে আছে। সেখানে ভণিতা—

সুমতি উমাপতি সকল নৃপতি পতি
হিন্দু পতি রস জানে।

৪৬০ নং—ইহার ভণিতার পাঠান্তর—

কহ কবি রঞ্জন শুন বরনারি
প্রেম অমিয় রসে লুবুধ মুরারি।

৪৬৪ নং—সম্পাদক বলেন, "এই পদ হরিপতির ভণিতাযুক্ত পাওয়া গিয়াছে।"

৬২৪ নং—পদকল্পলতিকায় ভণিতা—

হেন বুঝি নিকরুণ ধাতা।
গোবিন্দ দাস গুণ গাথা।

৭১৪ নং—বিখ্যাত পদ। কীর্ত্তনানন্দের পাঠই সঙ্গত—

ভনই সেখর কইসে নিরবহ
সে হরি বিনু ইহ রাতিয়া।

৮৩৪ নং—বিখ্যাত পদ। পদকল্পতরুর (৯৩৭ নং) ভণিতায় কবিবল্লভের নাম আছে।

শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশের অধিক কাল বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদ আলোচনা করিয়া আমার সিদ্ধান্ত এই যে, যে সমস্ত পদে রাধাকে রাজকন্যা, তাঁহার পিতার নাম বৃকভানু, মাতার নাম কীর্ত্তিদা, তাঁহার সখীগণের নাম, যথা—ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি, তাঁহার শাশুড়ী ননদের নাম জটিলা কুটিলা এবং কৃষ্ণের সখাদের নাম সুবল সুদাম ইত্যাদি উল্লেখ করা হইয়াছে, সেগুলি বড়ু চণ্ডীদাসের কিংবা মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদ নহে। ২২ ও ৫৩৪নং পদে জটিলা আছে এবং ২০৮ ও ২০৯ নং পদে সুবল আছে।

পূর্ব্বোক্ত পদগুলিতে বিদ্যাপতির নাম প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। অন্তত তাহাদের অকৃত্রিমতা সন্দেহজনক। এই জন্য এই ১৪টি পদ বর্জ্জনীয়।

চ। অনবধানতাবশতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্করণে বিদ্যাপতির ৪৯২, ৭৪৭ এবং ৭৬৯ নং তিনটি পদ যথাক্রমে ৬৪০, ৭৬৪ এবং ৭৮৪ নং পুনরুক্ত হইয়াছে। গুপ্তের ১৫৮ নং

বিদ্যাপতির বাঙ্গালা দেশের পদ, ইহার মৈথিল পাঠ তালপত্রের পুথি হইতে ১৫৯নং দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে এই ৪ জোড়া পাঠের মধ্যে ৪টি পদ বাদ যাইবে।

ছ। অধ্যাপক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন (Journal of the Department of letters, Calcutta University, vol xvi, p. 23 ff)।

গুপ্তের ১৪৭ নং—নন্দীপতির
" ৩৬৯ নং—রুদ্রনাথের
" ২৮০ নং—চন্দ্রনাথের
" ৬৮৬ নং—ধৈরজপতির
" ৬৯৬ নং—উমাপতির
" ২৭২ নং—হরিপতির।

সুতরাং এই ছয়টি পদও বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ পদাবলী হইতে বর্জ্জন করিতে হইবে।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সংস্করণে বিদ্যাপতির মোট ৯৩৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। তাহা হইতে বাদ দিতে হইবে—

(ক)	১৩
(খ)	৫৪
(গ)	১৩৩ ৫৬
(ঘ)	৩৯
(ঙ)	১৪
(চ)	৪
(ছ)	৬
	৩১৯

অবশিষ্ট ৬১৬টি পদ আমরা বিদ্যাপতির বিশুদ্ধ সংস্করণে স্থান দিতে পারি। ভবিষ্যতে গবেষণা দ্বারা হয় ত ইহা হইতে কিছু বাদ দিতে হইবে। এই ৬১৬টি পদের সহিত আমরা মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলী হইতে বিদ্যাপতির কতকগুলি খাঁটি পদ যোগ করিতে পারি। এই পুস্তকে ৮৬টি সম্পূর্ণ এবং ৫টি খণ্ডিত পদ আছে। এই ৯১টি পদের মধ্যে ২টি অমৃত করের, ৬০টি বিদ্যাপতির এবং অবশিষ্টগুলি ভণিতাবিহীন। এই ৬০টির মধ্যে ১৫টি গুপ্তের সংস্করণে আছে। সুতরাং ৪৫টি নূতন পদ পাওয়া যাইতে পারে। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে (সতীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত) বিদ্যাপতির ৩২টি নূতন পদ আছে। তন্মধ্যে ৬টি কবিশেখর, কবিরঞ্জন ও শেখরের ভণিতায়। অবশিষ্ট ২৬টি পদ বিদ্যাপতির। ইহাতে বর্ত্তমানে বিদ্যাপতির পদসংখ্যা হইবে ৬৮৭। ৺অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের সংগ্রহ হইতে কয়েকটি বিদ্যাপতির নূতন পদ পাওয়া যাইতে পারে।

জ। এখানে আমরা সংক্ষেপে বিদ্যাপতির পদের পাঠ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, বাঙ্গলার বৈষ্ণব পদসংগ্রহে যে সমস্ত বিদ্যাপতির

পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের ভাষায় অনেক বিকৃতি ঘটিয়াছে। মিথিলার প্রাচীন পদসংগ্রহ পুস্তকের সাহায্যে এই সকল পদের পাঠ শুদ্ধ করিতে হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

(১) পদকল্পতরুর ৮৫৫ নং পদের পাঠ—

কতয়ে মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহ শঙ্কর হুঙ বরনারি॥
নাহি জটা ইহ বেণি বিভঙ্গ।
মালতি মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দুর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘছাল।
কেলি-কমল কুল না হয়ে কপাল॥
বিদ্যাপতি কহ এ হেন সু ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহ মলয়জ পঙ্ক॥

গুপ্ত মহাশয়ের ৬৯ নং পদটি তালপত্রের পুথি হইতে উদ্ধৃত। তাহার সহিত নিম্নে উদ্ধৃত রাগতরঙ্গিণীর (৭০ পৃঃ) পদ মিলাইলে খাঁটি পদটি কিরূপ ছিল, বুঝিতে পারা যায়।—

কত ন বেদন মোহি দেহে মদনা,
হর নহি বালা মোরে জুবতি জনা॥
নহি মোহি জটাজুট চিকুরক বেণী,
সিরে সুরসরি নহি কুসুমক সেনী॥
চাঁদ তিলক মোহি নহি ইন্দু-ছোটা,
ললাট পাবক নহি সিন্দূরক ফোটা॥
কণ্ঠ গরল নহি, মৃগমদ চারু,
ফনিপতি মোরা নহি মুকুতা হারু॥
ভণই বিদ্যাপতি সুন দেব কামা,
এক দোস অছ ওহি নামক বামা॥

রাগতরঙ্গিণীতে তালপত্রের পুথির একটি শ্লোক নাই—

বিভূতি ভূষণ নহি চান্দনক রেণু।
বাঘছাল নহি মোরা নেতক বস্থন॥

কিন্তু পদকল্পতরুর পাঠের সহিত তুলনা করিলে এই শ্লোকটি যে মূলে ছিল, তাহা প্রমাণিত হয়। তালপত্রের নবম চরণে আছে—

নহি মোরা কালকুট মৃগমদ চারু।

কিন্তু পদকল্পতরুতে আছে—

কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।

ইহা হইতে বুঝিতে পারি, রাগতরঙ্গিণীর ধৃত পাঠই ঠিক—

কণ্ঠ গরল নহি মৃগমদ চারু।

(২) আর একটি উদাহরণ দিই। পদকল্পতরুর ২০৭ নং পদে আছে—

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচবান॥
চিকুরে গলয়ে জলধার।
মুখ শশি ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ার॥
তিতল বসন তনু লাগি।
মুনিহুক মানস মনমথ জাগি॥
কুচযুগ চারু চকেবা।
নিজ কুলে আসি মিলায়ল দেবা॥
তেঞি শঙ্কা ভুজ পাশে।
বান্ধি ধরল জনু উড়ব তরাসে॥
কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে।
গুণবতি নারি রসিক জন পাওয়ে॥

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তালপত্রের পুথির পাঠ ৩৭ নং পদে দিয়াছেন। রাগতরঙ্গিণীতে (৭৩ পৃঃ) ভণিতাবিহীন ভাবে এই পদ নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়—

কামিনি করএ সনানে,
হেরত হিঁ হৃদএ হন পঁচ বাণে।
চিকুর গরএ জলধারা,
মুখসসি তরেঁ জনি রোঅএ অধারা॥
তিতল বসন তনু লাগূ,
মুনিহুঁক মানস মনমথ জাগূ॥
কুচযুগ চারু চকেবা,
নিঅ কুল মিলত আনি কোনে দেবা॥
তেঁ সঙ্কা-এঞ ভুজ পাসে
বান্ধি ধরিঅ উড়ি জাএত অকাশে॥

গুপ্তের উদ্ধৃত পদে "তিতল বসন" ইত্যাদি শ্লোকটি "বাধি ধএল" ইত্যাদি চরণের পরে আছে। কিন্তু বাঙ্গলা ও রাগতরঙ্গিণীর পাঠ হইতে তাহা যে "মুখসসি" ইত্যাদি চরণের পরে হইবে, তাহা নিশ্চিত বোঝা যায়। পদের অর্থের পৌর্বাপর্য্যের দিক্ দিয়াও ইহা সঙ্গত। তুলনা দ্বারা আমরা আরও স্থির করিতে পারি যে, রাগতরঙ্গিণীর "মুখসসি তরেঁ"

স্থলে "মুখ সসি ভরে" পাঠই শুদ্ধ। বাঙ্গলা পাঠে পদকল্পতরুর "বান্ধি ধরল" ইত্যাদি স্থলে পদরসসারে "বান্ধি ধরল জনী উড়য়ে আকাশে" আছে। তরাসে স্থলে আকাশে পাঠ মূল অনুযায়ী। মৈথিলীতে জনু = যেন না, জনি = যেন। অনেক স্থলে বাঙ্গলার পদে জনু ও জনির ভুল প্রয়োগ দেখা যায়। আমরা আরও দেখিতেছি যে, যদিও রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত পদের পরে "ইতি বিদ্যাপতেঃ" আছে, কিন্তু ভণিতা নাই। তালপত্রের পুথির ভণিতা যে ঠিক, তাহা পদকল্পতরু ও তালপত্রের পাঠ হইতে স্পষ্ট বোঝা যায়।

(৩) যেখানে বিদ্যাপতির একাধিক পদ মিথিলার পুথিতে পাওয়া যায়, সেখানে তুলনা করিয়া উৎকৃষ্টতর বা বিশুদ্ধতর পাঠ নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ গুপ্তের ভণিতাবিহীন ৯২ পদের পাঠ, যাহা নেপালের পুথি হইতে উদ্ধৃত এবং মৈথিলী বিদ্যাপতি বিশুদ্ধ পদাবলীর নিম্নে উদ্ধৃত ৩৫নং পাঠ তুলনা করুন।

তে অতি নাগর তঞে রস সার,
পসরও বীথী পেম পসার।
জোবন নগর বেসাহত রূপ
ততে মুলই হহ জতে সরূপ। ধ্রু।
সাজনি সে হরি রস-বনিজার,
গোপ ভরমে জনু বোলহ গমার।
বিধি বসে অবে করব নহি মান,
জইঅও সোলহ সহস পতি কান্হ।
তহি তোহিঁ উচিত বহুত জে ভেদ,
মনমথ মথথেঁ করব পরিছেদ।
ভনই বিস্তাপতি এহু রস জান,
রাএ সিবসিংহ লখিমা দেবিরমান।

প্রথম চরণে "রসসার" (নেপালের সব-সার স্থলে) শুদ্ধ। দ্বিতীয় চরণে বীথী পাঠ (নেপালের মল্লী স্থলে) শুদ্ধ। তৃতীয়ে "বেসাহত" (আরবী বিধাএত, বাং বেসাত, নেপালের 'বেসাহব' স্থলে) শুদ্ধ। চতুর্থে "মুলই হহ" (নেপালের "মুল হোইহ" স্থলে) শুদ্ধ।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন—

"যৌবন নগরে রূপ বিক্রয় করিবে,
যাহা যথার্থ সেই মূল্য হইবে।"

আমাদের ধৃত পাঠে অর্থ হইবে—"যৌবন নগরে রূপই বেসাত, তুমি সেই দাম চাহিবে, যাহা যথার্থ।" আমরা মৈথিলী পদে ভণিতা পাইতেছি, যাহা নেপালের পুথিতে নাই।

ঝ। বিস্তাপতির খাঁটি পদ উদ্ধার করিতে হইলে মধ্য যুগের মৈথিলী ভাষা ও ব্যাকরণ জানা দরকার। গুপ্ত মহাশয় পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমো ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গঃ" হয়। আমি উদাহরণস্বরূপে নিম্নে কয়েকটি বিচ্যুতি দেখাইতেছি।

৭৫ নং— দসমি দসা পথ অঁগির এ্রো
ন কর এ্রো তেসর কানে।

গুপ্তের অনুবাদ—"দশমী দশার পথ অঙ্গীকার করিবে, (তথাপি) তৃতীয় ব্যক্তির কানে তুলিবে না।" ব্যাকরণ অনুসারে -অএ্রো (-অওঁ) উত্তম পুরুষের এক বচনের বিভক্তি। সুতরাং অনুবাদ হওয়া উচিত—"(বরং) দশমী দশার পথ অঙ্গীকার করিব (করি), (তথাপি) তৃতীয় ব্যক্তির কানে তুলিব (করি) না।"

১৮০ নং এই পদটি রাগতরঙ্গিণী (পৃঃ ১০৯) হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু গুপ্তের প্রতিলিপির ভুলে অর্থেরও ভুল হইয়াছে। মূলে আছে—

অছল জোর সিরীফল ভাঁতি।
কএলহ ছোলঙ্গ নারঙ্গ কাঁতি॥
ভনই বিদ্যাপতি ন কর লাথ।
ভুখল ন খাহ দুহূ হাথ॥

গুপ্তের অনুবাদ—"(পয়োধর) শ্রীফলযুগলের তুল্য ছিল, ছাড়ান নারঙ্গ (ফলের) ন্যায় করিয়াছ। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ছলনা করিও না, নাগরের দুই হস্তের নখসমূহ ক্ষুধিত (ছিল)।" তিনি "ভাঁতি, ছোলঙ্গ, কাঁতি, ন খাহ" স্থানে পড়িয়াছেন "ভাতি, ছোল, কাতি, নখা।"

প্রকৃত অনুবাদ হইবে—"(পয়োধর) শ্রীফলযুগলের তুল্য ছিল, (তাহাতে) ছোলঙ্গ ও নারঙ্গ (ফলের) কান্তি করিয়াছ। বিদ্যাপতি কহিতেছেন, ছলনা করিও না, ক্ষুধার্ত্ত হইলে দুই হাত দিয়া খাইও না।" এই শেষ বাক্যের সহিত তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের—

ভুখিল হয়িলে কাহ্নাঞি দুঈ হাথে না খাইএ। (৪৭ পৃঃ)

১৯৬ নং—বিনু হুত বহে ভেল বারহবান।

গুপ্তের অনুবাদ—"বিনা অগ্নিতে মহামূল্য হইল।" তিনি বারহবানের অর্থ করিয়াছেন "বারো-গুণ মূল্য, অর্থাৎ মহামূল্য।" কিন্তু ইহার অর্থ খাঁটি সোনা। এই অর্থে দশবানও ব্যবহৃত হয়।

২২৫ নং—বহি রতিরঙ্গ লিখাপন মানে। গুপ্তের অনুবাদ—"মানাবস্থায় রুদ্ধ গৃহের বাহির হইতে অনুনয়, রতিরঙ্গ ও মান (কৃষ্ণের) অনুভবজ্ঞাপক (কাহিনী)।" তিনি বহির অর্থ করিয়াছেন "বহির্নতি, রুদ্ধ দ্বারের বাহির হইতে মানিনীকে অনুনয়।" বিদ্যাপতি নিজেই এই চরণটির সংস্কৃত অনুবাদ করিয়াছেন—বহির্নতিরতিক্রীড়া মনোবেদনলেখকঃ। কিন্তু ইহাতে লিপিকরপ্রমাদ আছে। শুদ্ধ পাঠ হইবে—বহির্নতি-রতিক্রীড়া-মান-বেদন-লেখকঃ। অর্থাৎ বহি (পুস্তক) নতি, রতিক্রীড়া, মান, বেদন লেখক। রামকৃষ্ণ শর্ম্মা বেণীপুরী এই পদের বহি শব্দের অর্থ হিন্দীতে করিয়াছেন—"বহি—বহী হিসাব কী পুস্তক।" সুতরাং উদ্ধৃত পংক্তির প্রকৃত অর্থ হইবে—পুস্তক (হইতেছে) রতিরঙ্গ ও মান লেখক।

২৮৭ নং— জগত নাগরী মুখে জিনলা হে
গেলা হে গগন হারি।

গুপ্তের অর্থ—"জগতে (সকল) নাগরীর মুখ জয় করিয়াছিস, (তাহাদিগকে) হারাইয়া গগনে গিয়াছিস।" কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ—ওহে, জগতে নাগরীরা (তোমাকে) (তাহাদের অকলঙ্ক) মুখ দ্বারা পরাজিত করিয়াছে। ওহে, তুমি হারিয়া গগনে গেলে। বেণীপুরীও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

২৮৯ নং—সাএ সাএ কমন বেদন তন্থু জানে।

গুপ্ত "সাএ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন শত। কিন্তু পদাবলীতে বহু স্থানে আক্ষেপসূচক অব্যয় "সাএ সাএ" ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,

সাএ সাএ কহহ কহহ কান্হু (৫০০ নং)
সাএ সাএ হমর পরান নাথ কওঁনে বিরমাওল (৭৩৬ নং)

এই সকল স্থানে "সাএ সাএ" শব্দের অর্থ করা হইয়াছে "সই, সই"।

২৯৪ নং—ঠামহি রহিঅ ঘুমি পরসে চিহ্নিঅ ভূমি দিগমগ উপজ সন্দেহ।

গুপ্তের অর্থ—"এক স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া থাকি, সন্দেহ উৎপন্ন হইয়া (চিত্ত) দোলায়মান হয়।" ইহার প্রকৃত অর্থ—(এক) স্থানেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া রহি, স্পর্শের দ্বারা ভূমি চিনি। দিক্ ও পথ (সম্বন্ধে) সন্দেহ উৎপন্ন হয়। বেণীপুরীও এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

৪০৮ নং— নারঙ্গি ছোলঙ্গি কোরি কি বেলী।
কামে গাস হল আচর ফেলী॥

গুপ্তের অর্থ—"নবীন অবস্থায় নারঙ্গী ছোলঙ্গীর (তুল্য পয়োধর) কাম অঞ্চল ফেলিয়া (আবৃত করিয়া) সাজাইল।" তিনি "কোরি কি বেলী"র অর্থ করিয়াছেন "নবীন সময়ে।" সম্বন্ধ পদে স্ত্রীলিঙ্গ সম্বন্ধীয় পদের পূর্ব্বে "কী" হিন্দী ভাষায় আছে; মৈথিলীতে "ক" হয়। সুতরাং নবীনতার বেলায় বা নবীন অবস্থায়, এইরূপ অর্থ হইতে পারে না। ইহার প্রকৃত অর্থ—(কৈশোরে পয়োধর) নারঙ্গী, ছোলঙ্গী, কুল কিংবা বেল (সদৃশ ছিল)। কাম আঁচল ফেলিয়া (আবৃত করিয়া) তাহা সাজাইয়াছিল। "কোরী" কুল অর্থে অন্যত্র পদে ব্যবহার আছে—কুচ কোরী ফল নখ খত রেহ (১৮৫ নং)।

৪৮২নং— কত মহি অহি দেহে দমসল
চরণে তিমির ঘোর।

গুপ্তের অর্থ—"দেহ দ্বারা ধরাতলে কত সর্প দলিত করিলাম, চরণে ঘোর তিমির।" ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে—ধরাতলে কত সর্প দেহ দংশন করিল, চরণে ঘোর তিমির।

৬২৬নং— শূন সেজ হিয় শালয় রে
পিয়ারে বিনু ঘর মোয়ে আজি।

বিনতি করউ সহি লোলিনিয়ে
মোহি দেহ অগি হর সাজি ॥

গুপ্তের অর্থ—"আজ আমার ঘরে প্রিয় নাই, শূন্য শয্যা হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে। সখি, মিনতি করিতেছি, অগ্নি সাজাইয়া আমার দেহ হরণ (দাহ) কর।"

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৫ পৃ.) এই পদ আছে। তাহাতে শুদ্ধরূপে পদটি লিখিত হইয়াছে—

সুন সেজ হিঅ সাল এ রে
পিয়াঞে বিনু মরব মোঞে আজি।
বিনতি করঞো সহি লোলিনি রে
মোহি দেহে অগি হর সাজি।

ইহাতে প্রকৃত অর্থ হইবে—শূন্য শয্যা হৃদয় শল্যবৎ বিদ্ধ করে। প্রিয় বিনা আমি আজ মরিব। প্রিয় সখি রে, মিনতি করি, আমার জন্য অগ্নিগৃহ (চিতা) সাজাইয়া দাও।

৬৫১নং— পাতহি সঞো ফুল ভমরে অগোরল
তরুতর লেলহি বাসে।
সে ফল কাটি কীটে উপভোগল
ভমরা ভেল উদাসে।

গুপ্তের অনুবাদ—"ফুল হইতেই ভ্রমর আগুলাইল, তরুতলে বাস লইল; সে ফল কাটিয়া কীট উপভোগ করিল, ভ্রমর উদাসীন হইল।" তিনি "পাতহি" অর্থ করিয়াছেন "পড়িতেই," কিন্তু "পাতহি সঞো" ইহার অর্থ হইবে "পত্র হইতেই"। তৃতীয় পংক্তিতে "ফল" ভ্রান্ত পাঠ, শুদ্ধ ফুল হইবে। তাহাতে প্রকৃত অর্থ হইবে—পত্র (উদ্‌গম) হইতেই ভ্রমর ফুল আগুলাইল, তরুতলে বাস লইল। সে ফুল কাটিয়া ইত্যাদি।

৬৬৬নং— আব ভেল ঝাল কুসুম সব ছুছ
বারি বিহন সবকেও নহি পুছ।

রাগতরঙ্গিণীতে (৭৯ পৃঃ) এই পদ আছে। সেখানে শুদ্ধ পাঠ আছে "সরকেও" (সবকেও স্থলে)। গুপ্ত মহাশয় "ঝাল" ও "ছুছ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন যথাক্রমে কটু বা গন্ধশূন্য এবং অস্পৃশ্য। তিনি শ্লোকটির অর্থ করিয়াছেন—"এখন কুসুম গন্ধশূন্য ও সকলের অস্পৃশ্য হইল। বারি বিহনে (শুষ্ক কুসুমকে) কেহই জিজ্ঞাসা করে না।" কিন্তু "ঝাল" ও "ছুছ" শব্দের প্রকৃত অর্থ "নিদাঘ" এবং "শূন্য"। "কুসুম সবে ছুছ" স্থানে বেণিপুরী (১৯৮ পৃ.) "কুসুম রস ছুছ" পড়িয়াছেন। তাঁহার মতে এই চরণটির অর্থ "এখন কুসুম কটু (গন্ধহীন) ও রসহীন হইল।" কিন্তু "কুসুম সবে" স্থলে সম্ভবতঃ "কুসুমসরে" পাঠ গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে শ্লোকটির প্রকৃত অর্থ হইবে—এখন নিদাঘ (উপস্থিত) হইল,

সরোবর কুসুমশূন্য হইল। বারি বিহনে কেহ সরোবরকে জিজ্ঞাসা করে না। ঝাল সংস্কৃত ঝল্লিকা বা ঝল্লা শব্দজাত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঝালিআ।

৬৮১নং— নারি পরখি নেহ বঢ়াবয়
সুনহ পুরুখ থোরা।

ইহা কীর্ত্তনানন্দ হইতে উদ্ধৃত। ইহার অর্থ গুপ্ত মহাশয় করিয়াছেন—"নারী পরোক্ষেও স্নেহ বাড়ায়, শুনিতে পাই, পুরুষের (স্নেহ) অল্প।" কীর্ত্তনানন্দ আমার কাছে নাই। কিন্তু মনে হয়, শুদ্ধ পাঠ এইরূপ ছিল—

নারি পুরুখে নেহ বড়াবয়
সিনেহ পুরুখ থোরা।

ইহার অনুবাদ হইবে—নারী পুরুষের প্রতি প্রেম বাড়ায়। পুরুষের প্রেম অল্পই।

৭৩৬নং— বিসম কুসুম সর ভাবে।

গুপ্তের অর্থ—"কুসুমশরের ভাব বিষম।" কিন্তু "ভাবে" ইহার অর্থ "বোধ হয়"। তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—"আন পানী মোকে একো না ভাএ" (৩৪৯ পৃ.)। ইহাতে অর্থ হইবে—কুসুমশর বিষম বলিয়া বোধ হয়।

৭৪৮ নং—কোমল অরুণ কমল কুম্হিলায়ল। গুপ্ত "কুম্হিলায়ল" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়াছে," কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ হইবে "ম্লান হইয়াছে," হিন্দীতে "কুম্হলানা" ক্রিয়া পদের অর্থ ম্লান হওয়া, শুকাইয়া যাওয়া।

৭৫৪ নং—অরে অরে অরে কাহ্নু কি রহসি বোরি। গুপ্তের অর্থ—"ওরে ওরে ওরে কানাই, কি কৌতুকে ডুবিয়া আছিস," "ডুবিয়া" অর্থ হইলে "বুরি" পাঠ হইত। বেণীপুরী "বোরি" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "বোলি," রলয়োরভেদঃ এই সূত্রানুযায়ী। তাঁহার মতে শুদ্ধ পাঠ হইবে—অরে অরে অরে কাহ্নু কী রভসে বোরি। ইহার অর্থ—ওরে ওরে ওরে কানাই, কি রহস্য করিয়া বলিতেছ? (ক্যা রভস কর বোল রহে হো)। তুং—'তুহ সখি রভসে মোহে জনি বোলবি লোক করব পতিয়ারা' (৩২০ নং)।

৮০০ নং—বৈসলি ভমরী হর উদ্গারএ। গুপ্ত ইহার কোন অর্থ দিতে পারেন নাই। কিন্তু বেণীপুরী (১৩২ পৃঃ) ইহার পাঠ এইরূপে শুদ্ধ করিয়াছেন,—

বৈসলি ভমরী হরউদ গাবন।

তিনি "হরউদ"-এর অর্থ করিয়াছেন—"পলনে কা গীত" অর্থাৎ দোলনার গীত।

এ। গায়কদের মুখে ও লিপিকরপ্রমাদে বিদ্যাপতির পদে অনেক অশুদ্ধি প্রবেশ করিয়াছে। বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের পদসংগ্রহে ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে। এই জন্য মিথিলার প্রাচীন পুথির সহিত বাঙ্গলা দেশের পদ মিলাইয়া বিদ্যাপতির খাঁটি পদ যত দূর সম্ভব উদ্ধার করিতে হইবে। একটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) মল্লার রাগ।
মলিন চকুর তনু চীরে।
করতলে বয়ন নয়ন ঝরু নীরে ॥
শুন মাধব কি বোলব তোয়।
তুয়া গুণে লুবধি মুগধি ভেল মোয় ॥
কোই কমল-দলে করই বতাস।
কোই চতুর ধনি হেরই নিশাস ॥
কোই কহে আওল হরি।
শুনি চেতন ভেল নাম তোহারি ॥*
উরে দোলে শামর বেণী।
কমলিনী কোরে জনু কাল সাপিনী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে।
বিরহিনি বেদন সখি সমুঝাওয়ে ॥ (পদকল্পতরু, ১৯৪৩ পদ)
মলিন কুসুম তনু চীরে।
করতল কমল নয়ন ঢর নীরে ॥
কি কহব মাধব তাহী।
তুয় গুনে লুবুধি মুগুধি ভেলী রাহী ॥
উর পর সামরি বেণী।
কমল কোষ জনি কারি নাগিনী ॥
কেও সখি তাকএ নিশাসে।
কেও নলিনীদলে কর বতাসে ॥
কেও বোল আএল হরী।
সমরি উঠলি চির নাম সুমরি ॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহ বেদন নিঅ সখি সমঝাবে ॥
(নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, তালপত্রের পুথি, ৭৫৭ নং)

ধনছী গীত

মলিন কুসুম তনু চীরে,
করপর বদন নয়ন চরু নীরে ॥
কি কহব মাধব তাহী,
তুঅ গুন লুবুধি মুগুধি ভেলী রাহী ॥

---

* পাঠান্তর। চমকি উঠল শুনি নাম তোহারি।

উরঁ লুর সামরি বেণী,
কমল কোষ জনি কারি নাগিনী ॥
কেঅও সখি তাকএ সাঁসে,
কেঅও নলিনীদলেঁ করএ বতাসে ॥
কেঅও বোল আএল হরী,
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী ॥
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে,
বিরহিনি বেদন সখি সমঝাবে ॥ (রাগতরঙ্গিণী, ১০৩-৪ পৃঃ)

এই তিনটি পাঠ তুলনা করিয়া এবং ছন্দ লক্ষ্য করিয়া নিম্নলিখিত বিশুদ্ধ পদ সম্পাদন করিতে পারা যায়—

মলিন কুসুমতনু চীরে।
করতর বয়ন নয়ন ঢরু নীরে ॥
কি কহব মাধব তাহী।
তুঅ গুন লুবুধি মুগুধি ভেলি রাহী ॥
উরঁ লুর সামরি বেণী।
কমল কোস জনি কারি নাগিনী ॥
কেঅও সখি তাকএ সাঁসে।
কেঅও নলিনী দলেঁ করএ বতাসে ॥
কেঅও বোল আএল হরী।
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী ॥
বিদ্যাপতি কবি গাবে।
বিরহিনি বেদন সখি সমঝাবে ॥

এই পদে "লুর" শব্দটি অনেকের নিকট দুর্বোধ্য। ইহা "লুলএ" শব্দের মৈথিল রূপ, অর্থ "দোলে"।

(২) মিথিলার প্রাচীন পুথির মধ্যে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের ব্যবহৃত নেপালের পুথি ও তালপত্রের পুথি অধিকতর নির্ভরযোগ্য। কিন্তু যেখানে উভয়ের মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ দেখা যায়, সেখানে অন্য পুথির সাহায্য অপরিহার্য্য। নিম্নে একটি উদাহরণ দিতেছি।

অম্বরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ শুনইছিঅ চাঁদক চোরি ॥
ঘরে ঘরে পহরী গেল অছ জোহি।
অবহী দূখন লাগত তোহি ॥
কতএ মুকাএব চাঁদক চোর।
জতহি লুকাওব ততহি উজোর ॥

হাস সুধারসে ন কর উজোর।
বনিকে ধনিকে ধন বোলব মোর॥
অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিন্দুরক সীম বেসাউলি মোতি॥
ভণই বিদ্যাপতি হোহু নিসঙ্ক।
চাঁদহু কা থী ভেদ কলঙ্ক॥—(গুপ্তের ২২৮ নং, তালপত্রের পুথি)
লোলুঅ বদন সিরি ধনি তোরি।
জনু লাগিহ তোহি চাঁদক চোরি॥
দরসি হলহ জনু হেরহ কাহু।
চাঁদ ভরমে মুখ গরসত রাহু॥
ধবল নয়ন তোর কাজরে কার।
তীখ তরল তঁহি কটাখ ধার॥
নিরবি নিহারি ফাসগুন জোলি।
বাঁধি লেত তোহি খঞ্জন বোলি॥
সাগর সার চোরাওল চন্দ।
তা লাগি রাহু বরএ বড় দন্দ॥
ভণই বিদ্যাপতি হোউ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁ কিছু লাগু কলঙ্ক॥
(গুপ্তের ২২৯, নেপালের পুথি ও মিথিলার পদ)
আঁচরে বদন ঝপাবহু গোরি।
রাজ সুনৈছিঅ চাঁদক চোরি॥
ঘরেঁ ঘরেঁ পেঁ হরি গেলহ জোহি।
একনে দূষণ লাগত তোহি॥
বাহর সুতহ হেরহ জনু কাহু।
চাঁন ভরমে মুখ গরাসত রাহু॥
নিরভি নিহারি ফাঁসগুন তোলি।
বাহ্নি হলত তোঁহি খঞ্জন বোলি॥
ভনহি বিদ্যাপতি দোহু নিশঙ্ক।
চান্দ হুঁ কাঁ কিছু লাগু কলঙ্ক॥—(রাগতরঙ্গিণী, ৫৬ পৃঃ)
আঁচরে বদন ঝাঁপায়হ গোরি।
রাজা শুনইছে চান্দকি চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরি ছোড়ি গেল জোয়।
অবহি দেখব ধনি নাগরি তোয়॥

হাসি সুধামুখি না কর বিজোরি।
বাণিক ধনি ধনি বোলবি মোরি॥
অধর সমীপ দশন কর জোতি।
সিন্দুর সমিপ বসায়লি মোতি॥
শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ।
স্বপনে হোয়ে জনি বিপদকলেশ॥
চান্দক আছুয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কিত তুহুঁ নিকলঙ্ক॥
রাজা শিবসিংহ লছিমা দেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহ বিশঙ্ক॥—(পদকল্পতরু, ১৮৬১ পদ)

এই চারিটি পদপাঠ হইতে আমরা একটি আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করিতে পারি।—

আঁচরে বদন ঝপাবহ গোরি।
রাজ সুনইছিঅ চাঁদক চোরি॥
ঘরে ঘরে পহরি গেল অছ জোহি।
অবহী দুখন লাগত তোহি॥
দরসি দুলহ জম্মু হেরত কাহু।
চাঁদ ভরুমে মুখ গরাসত রাহু॥
হাস সুধারসে না কর উজোর।
বনিকে ধনিকে ধন বোলব মোর॥

অধরক সীম দসন কর জোতি।
সিঁদুরক সীম বেসাউলি মোতি॥
ধবল নয়ন তোর কাজরে কার।
তীখ তরল তহিঁ কটাখ ধার॥
নিরবি নিহারি ফাঁসগুন জোলি।
বান্ধি হলত তোহি খর্জ্জন বোলি॥
ভনই বিদ্যাপতি হোহ নিসঙ্ক।
চাঁদহু কাঁ থী ভেদ কলঙ্ক॥

(৩) যেখানে তালপত্রের পুথি ও নেপালের পুথির মধ্যে গুরুতর পাঠভেদ দেখা যায়, সেখানে আদর্শ পাঠ অন্য পুথির সাহায্যেও প্রস্তুত করা অনেক সময় অসম্ভব। উদাহরণ-স্বরূপ আমরা গুপ্তের ৫৮নং পদটি লইতে পারি। ইহাতে গুরুতর পাঠভেদের সহিত ভণিতারও ভেদ আছে। তালপত্রের পুথির ভণিতা—

ভন বিদ্যাপতি সুনহ নাগর
ও নহি ও রস জান।
রাজা শিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমা দেবী রমান॥

নেপালি পুথির ভণিতা—

ভনে বিদ্যাপতি জে জন নাগর
তা পর রতলি নারী।
হাসিনি দেবিপতি দেবসিংহ নরপতি
পরসন হোথু মুরারি॥

তান্ত্রিক কার্যে বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগ

অধ্যাপক শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগের ইতিহাস অতি বিচিত্র ও কৌতুককর। মনে হয়, যুগে যুগে প্রদেশে প্রদেশে এই প্রয়োগের ধারা অল্পবিস্তর নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনও ব্যাপক আলোচনা হয় নাই।

অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন, বহু প্রাচীন কাল হইতেই বেদের মন্ত্র এমন সব কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে, যাহাদের সহিত মন্ত্রের অর্থগত প্রত্যক্ষ কোন যোগ নাই।[১] পরবর্তী যুগে এ রীতির অনুসরণে অবৈদিক কার্যেও বেদের মন্ত্র ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্তমান সময় পর্যন্ত দেবপূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বৈদিক মন্ত্রের বহুল প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ দেবপূজা এবং বিশেষ করিয়া পূজিত দেবতার মধ্যে অনেকের কোন উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় না।

বিষ্ণু, শিব, লক্ষ্মী, নবগ্রহ প্রভৃতি দেবতার পূজায় প্রত্যেকতঃ স্বতন্ত্র মন্ত্র বা সূক্ত[২] ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া অধিবাস, ঘটস্থাপন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি পূজার বিভিন্ন অঙ্গেও বেদের মন্ত্র ব্যবহার করা হয়। মন্ত্রের সহিত দেবতা বা অনুষ্ঠানের যোগ অনেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন বিষয়ে ধ্বনিসাম্য মাত্র। 'কেতুং কৃণ্বন্নকেতবে' (ঋগ্বেদ. ১।৬।৩) এই সূর্যমন্ত্রটি কেতুপূজায় ব্যবহৃত হইবার কারণ বোধ হয় ইহার মধ্যের কেতু শব্দ, যদিও ইহার সহিত নবগ্রহের অন্তর্গত কেতুর কোনও যোগ নাই। 'শং নো দেবীরভীষ্টয়ে' (ঋ. ১০।৯।৪) জলদেবতার এই মন্ত্রটি শনির হোমে ব্যবহৃত হয়। ইহা নাকি কোন সময়ে শনির অভিষেকে প্রযুক্ত হইত। 'শং নো'র সহিত শনির ধ্বনিসাদৃশ্য অবশ্য লক্ষণীয়। 'সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসঃ' (ঋ° ৪।৫৮।৭) এবং 'দধিক্রাব্ণো অকারিষং' (ঋ° ৪।৩৯।৬) এই মন্ত্র দুইটি যথাক্রমে সিন্দুর ও দধি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইলেও ঐ দুই দ্রব্যের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই। তবে 'সিন্ধোরিব' ও সিন্দুরের ধ্বনির অনেকটা মিল আছে— 'দধিক্রাব্ণো' পদের দধির সঙ্গে আমাদের পরিচিত পরম উপাদেয় দধির ধ্বনিসাদৃশ্য ছাড়া আর কোন যোগ নাই।

অবৈদিক কার্যে বৈদিক মন্ত্র প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা কৌতুককর নিদর্শন তন্ত্রের পঞ্চ মকার শোধনে ইহাদের ব্যবহার। ব্রহ্মানন্দের তারারহস্য (ষোড়শ শতাব্দী), পূর্ণানন্দের

১। ওলডেনবার্গ, গৃহ্যসূত্রস্, সেক্রেড বুক্স্ অব্ দি ঈষ্ট্, ৩০, পৃ. ১১৪ পাদটীকা; ব্লুমফিল্ড, হিম্ন্স্ অব দি অথর্ববেদ, সেক্রেড বুক্স্ অব দি ঈষ্ট, ৪২, পৃ. ৪৮০; ভাণ্ডারকার, সার্চ ফর ম্যানুস্ক্রিপ্টস্ (১৮৮৩-৪), পৃ. ৩৭; উইন্টারনিট্স্, হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ান্ লিটারেচর, ১ খণ্ড, পৃ. ২৭৬।

২। বাংলা দেশে মন্ত্র অর্থেও এই শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয়। যথা, সংকল্পসূক্ত, লক্ষ্মীর সূক্ত, নারায়ণের সূক্ত প্রভৃতি।

শ্যামারহস্য (ষোড়শ শতাব্দী), কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার (ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী)[৩] এবং প্রাণ-কৃষ্ণ রামতোষণের প্রাণতোষিণী (উনবিংশ শতাব্দী) প্রভৃতি বাংলা দেশের বিভিন্ন তান্ত্রিক নিবন্ধে এই বিষয়ে বিধিব্যবস্থা সঙ্কলিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে প্রমাণরূপে বিভিন্ন গ্রন্থে স্বতন্ত্র তন্ত্র, ভৈরবতন্ত্র ও উত্তরতন্ত্রের নাম ও বচন উদ্ধৃত হইয়াছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন দ্রব্যের শোধন প্রসঙ্গে যে যে মন্ত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। অবশ্য মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রার সহিত এই সব মন্ত্রের অর্থগত দূরতম সম্পর্কও আবিষ্কার করা সম্ভবপর নহে।

প্র তদ্ বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্যেণ (ঋগ্বেদ ১ । ১৫৪ । ২)	মাংসশোধন
ত্র্যম্বকং যজামহে (ঋ° ৭ । ৫৯ । ১২)	মৎস্যশোধন
তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং (ঋ° ১ । ২২ । ২০)	মুদ্রাশোধন
তদ্ বিপ্রাসো বিপণ্যবো (ঋ° ১ । ২২ । ২১)	মুদ্রাশোধন[৪]
হংসঃ শুচি সদ্ বসুরন্তরীক্ষং (ঋ° ৪ । ৪০ । ৫)	মদ্যশোধন[৫]
বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু (ঋ° ১০ । ১৮৪ । ১)	শক্তিশোধন[৬]
গর্ভং ধেহি সিনীবালি (ঋ° ১০ । ১৮৪ । ২)	

পরশুরামকল্পসূত্রেও উপরিনির্দিষ্ট সাতটি মন্ত্রই তান্ত্রিক পূজায় মদ্যবিশিষ্ট বিশেষার্ঘ্যদান প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। 'আর্দ্রং জ্বলতি' (তৈঃ আঃ ১০ । ১ । ১৫) মন্ত্রটি এই উপলক্ষ্যে মদ্যপান সম্পর্কে বিহিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুথিতে সম্পৎ-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে শ্রীসূক্তের (ঋ° ১ । ১৬৫) তান্ত্রিক প্রয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে। এই সূক্তের বিভিন্ন মন্ত্র সহযোগে লক্ষ্মীপূজার ও বিভিন্ন ন্যাসের অনুষ্ঠানের বিধানও ইহাদের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে।

এগুলি ছাড়া অন্য কোন বৈদিক মন্ত্র তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় বলিয়া জানি না। তবে বৈদিক সংস্কার ও হোম তন্ত্রমতে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে—কতকগুলি বৈদিক মন্ত্র তান্ত্রিক কর্মে কিছু কিছু পরিবর্তিতরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিভিন্ন দেবতার গায়ত্রী প্রসিদ্ধ

৩। বহুপরিচিত এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের সময় লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায় (শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ও ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী, শ্রাবণ, ভাদ্র ১৩৫৪, পৃঃ ৩৮২, ৫০৬, পি. কে. গোড়ে, জার্নাল, গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট ১।১৭৭, শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, জার্নাল অব দি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৪।৭৪)।

৪। শ্যামারহস্য ও প্রাণতোষিণীর মতে দুইটি মন্ত্রই মুদ্রাশোধনে প্রযোজ্য—তারারহস্যের মতে দ্বিতীয় মন্ত্রটি মদ্যশোধনে ব্যবহার্য। বস্তুতঃ তারারহস্যে পঞ্চমকার শোধন প্রসঙ্গে এই একটি মন্ত্রই উদ্ধৃত হইয়াছে।

৫। এই মন্ত্রটি উত্তরতন্ত্রের প্রমাণবলে কেবলমাত্র প্রাণতোষিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

৬। মাংসাদিদ্রব্য শোধনমন্ত্রের পরে এই মন্ত্র দুইটী শ্যামারহস্য ও প্রাণতোষিণীতে উদ্ধৃত হইয়াছে—কিন্তু ইহাদের প্রয়োগস্থল উল্লিখিত হয় নাই। মৈথুন বা শক্তির শোধনেই ইহাদের ব্যবহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। গর্ভাধান সংস্কারে ইহাদের ব্যবহারের স্পষ্ট নির্দেশ প্রাচীন গ্রন্থেও পাওয়া যায়।

বৈদিক গায়ত্রীমন্ত্রের অনুকরণে রচিত বলিয়া মনে হয়[৭]—ইহাদের মধ্যে বৈদিক গায়ত্রীর কয়েকটি শব্দ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। বৈদিক স্বস্তিবাচনের একটি তান্ত্রিক রূপও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কালীপূজায় ব্যবহৃত তান্ত্রিক স্বস্তিবাচনের মন্ত্রটি এইরূপ :

হ্রীঁ হূঁ স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণা হূঁ
স্বস্তি নঃ কালী মেধামৃতময়ী।
হ্রৌঁ স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু ॥

ইহার সহিত নিম্নোদ্ধৃত বৈদিক স্বস্তিবাচনের মন্ত্রের সাদৃশ্য লক্ষণীয় :

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ
স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।
স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ
স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু ॥

৭। ভৈরবীর গায়ত্রী—'ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ' তুলনীয়।

'গোরক্ষবিজয়ে'র রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—সেখ ফয়জুল্লা নহেন

শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ এম-এ, বি-টি, সাহিত্যভারতী

বিগত ১৩২৪ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত 'গোরক্ষবিজয়' পুস্তকের সম্পাদকীয় ভূমিকার অন্তর্গত কয়েকটি অংশ অত্যন্ত আপত্তিকর মনে করায় যথার্থ যুক্তির সাহায্যে ঐ ঐ অংশের অযৌক্তিকতা নির্ণয়পূর্ব্বক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক সমাজে উহার যথাযথ স্বরূপ প্রকাশ করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

'গোরক্ষবিজয়ে' যোগিগুরু মীননাথের পতন ও তৎশিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহার পুনরুদ্ধারকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। ইহা নাথধর্ম্মের একখানি প্রধান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহা হইতে বাঙ্গালীর তৎকালীন সমাজ, ধর্ম্ম, ভাষা ও ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারা যায়। 'গোরক্ষবিজয়' সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্য-আচার্য্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন,—

> গোরক্ষবিজয়ের মত এরূপ অপরূপ গ্রন্থ যে বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগে রচিত হয়েছিল, ইহা আমাদের গৌরবের কথা। গোরক্ষযোগীর চরিত্র শরৎ-শেফালিকা বা যূথিকার ন্যায় শুভ্র; তাঁহার চরিত্রমাহাত্ম্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগের একটি প্রধান দিক্‌-নির্দ্দেশক স্তম্ভ। ইহা বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চ নীতি, গুরুভক্তি প্রভৃতি মহৎ গুণরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে। বিশাল অদ্রিশ্রেণী যেরূপ বঙ্গদেশের সীমাচিহ্ন, গোরক্ষবিজয় এদেশের সাহিত্যের সেইরূপ যুগনির্দ্দেশক চিহ্ন।...যে চরিত্রবল এবং নিঃস্বার্থ ও অহেতুকী ভক্তির উপর এই গ্রন্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাহা বঙ্গীয় অন্য কোন পুস্তকে নাই। যেমন অশোকস্তম্ভ বৌদ্ধযুগের নিদর্শন, এই পুস্তক তেমনই নাথধর্ম্মের একটি গৌরবজনক নিদর্শন।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬০-৬১ পৃষ্ঠা।

যোগী পুরুষদিগের যে কায়াসাধনা ("Kayasadhana is the most important thing in the Natha Literature and Kayasiddhi or the perfection of body may be taken to be the summum bonum after which the jogins were aspiring."—Obscure religious cults as background of Bengali Literature by Dr. S. B. Dasgupta, M.A., P. 256. তাহাও এই গ্রন্থে পরম নৈপুণ্যের সহিত আলোচিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ কি সাহিত্যের দিক্‌ দিয়া, কি বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের দিক্‌ দিয়া, কি নাথধর্ম্মের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক্‌ দিয়া এই গ্রন্থখানি অতীব মূল্যবান্‌। এরূপ একখানি অমূল্য গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে—স্থিরভাবে তাহার সিদ্ধান্ত হওয়া অত্যন্ত উচিত।

এই গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা কে, তাহা লইয়া এক বিষম সমস্যা উপস্থিত। গোরক্ষ-বিজয়ের সম্পাদক মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার ভূমিকায়

দেখাইয়াছেন যে, সেখ ফয়জুল্লাই 'গোরক্ষবিজয়ে'র প্রকৃত রচয়িতা। সম্পাদক মহাশয় 'গোরক্ষবিজয়ে'র যে ভণিতাগুলির উপর নির্ভর করিয়াছেন, সেগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাই—গ্রন্থখানি কবীন্দ্র দাস, সেখ ফয়জুল্লা, ভীমদাস ও শ্যামদাস সেন—এই কবিচতুষ্টয়েরই রচিত; কিন্তু চারি জন কবি মিলিত হইয়া এরূপ একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়; এবং নানারূপ প্রমাণ-সহকারে ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই চারি জন কখনও সমসাময়িক ছিলেন না। ইঁহাদের মধ্যে ভীমদাস বা শ্যামদাস সেনও যে গ্রন্থখানির প্রকৃত রচয়িতা হইতে পারেন না—সে সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয়ের সহিত আমিও একমত। এখন প্রশ্ন হইতেছে—কবীন্দ্র ও সেখ ফয়জুল্লা—এই দুই জনের মধ্যে কে এই গ্রন্থের প্রণেতা ?

এই প্রশ্নের উত্তরে মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় নানারূপ মনগড়া অগ্রহণীয় ও অবান্তর যুক্তির অবতারণা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সেখ ফয়জুল্লাই গোরক্ষ-বিজয়ের প্রকৃত রচয়িতা।

এ সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন—

ফয়জুল্লাকে আমরা গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন পুস্তকের আদিলেখক বলিয়া মাল্যচন্দন দিতে প্রস্তুত, কিন্তু "আদিলেখক" অর্থে আমরা শুধু সঙ্কলয়িতা বুঝাইতে চাই। যেরূপ শীতান্তে বকুলগাছের নীচে অজস্র ফুল পড়িয়া থাকে, বালিকারা আসিয়া সুতা পরাইয়া সেগুলি দিয়া মালা গাঁথিয়া দেয়; সেইরূপ গোরক্ষবিজয় ছড়ার মত দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গ্রাম্য-সাহিত্যের এক কোণে পড়িয়া ছিল, ফয়জুল্লা প্রভৃতি লেখকগণ হয় ত পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহা কুড়াইয়া লইয়া সেগুলি কাব্যে পরিণত করিয়াছেন।"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬০ পৃষ্ঠা।

রচয়িতা নির্ণয় সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন বলেন,—

সম্ভবতঃ শ্যামদাস ফয়জুল্লা ভীমদাস ইত্যাদি গায়ক ছিলেন মাত্র, মূল রচয়িতা হয় ত আর কেহ হইবেন।—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম সংস্করণ), ৯৬৯ পৃষ্ঠা।

আমার মনে হয়, মদীয় শিক্ষাগুরু ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতই গোরক্ষবিজয়ের প্রকৃত ও মূল রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—এই অভ্রান্ত সত্যের কাছ ঘেঁষিয়া গিয়াছে। তাঁহার মনে প্রকৃত মূল রচয়িতা কবীন্দ্র দাস কি না, সে সম্বন্ধে অতি সামান্য মাত্র সন্দেহ আছে। কিন্তু দ্বিধার কোনই হেতু নাই—সন্দেহ করিবার বিন্দুমাত্রও অবকাশ নাই; কারণ, যখন আমরা পড়ি—

(১) কহেন কবিন্দ্র দাস সুন নরগণ।
সিধার (সিদ্ধার) সঙ্গীত বাণী সুন বিবরণ॥
কবিন্দ্রবচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥—গোরক্ষবিজয়, ১৩০ পৃষ্ঠা।

(২) গোর্খের বিজয়কথা কবিন্দ্র রচিল।
সঙ্গীত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল॥—গোরক্ষবিজয়, ১৫৩ পৃষ্ঠা।

তখন কবীন্দ্র দাসই যে গোরক্ষবিজয়ের মূল রচয়িতা ও ফয়জুল্লা উহার শুধু নামমাত্র সঙ্কলয়িতা, সে বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

'কবিন্দ্র বচন শুনি'—অর্থাৎ কবীন্দ্র দাসের রচিত গোরক্ষবিজয়ের বচন শ্রবণ করিয়া ফয়জুল্লা জনগণসাধারণ্যে গুরু মীননাথের চরিত্র বুঝাইয়া দিলেন, ইহা ত উপরি উক্ত ভণিতা হইতে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে। তবুও সকলের ক্ষীণতম সন্দেহ দূরীকরণার্থ আরও কতকগুলি যুক্তি প্রমাণ সুধী পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। প্রথমতঃ—

ওঁ হরি। নমো গণেশায় নমঃ॥
বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চান্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥

গোরক্ষবিজয় হিন্দু কবির ব্যবহৃত এই বাক্যাবলীর দ্বারাই আরম্ভ করা হইয়াছে; কিন্তু মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, জানি না—কোন্ অদ্ভুত যুক্তিবলে বলিয়াছেন যে—ইহা নকলনবীশগণের দ্বারাই লিখিত হইয়াছে। আমি মনে করি—ইহা তাঁহার মনগড়া কল্পনা বই আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ তাহা যদি না হইত—এই হরিবন্দনা যদি কোন হিন্দু কবিকৃত না হইয়া, শুধু মাত্র নকলনবীশেরই কার্য্য হইত, তবে উহার পরবর্ত্তী হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণ-অনুমোদিত "স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল" ত্রিভুবনস্রষ্টা ঈশ্বর-বন্দনা, সৃষ্টিপত্তন বর্ণনা, হর-গৌরীর বিবাহ প্রভৃতি কিরূপে গোরক্ষবিজয়ের প্রথমে স্থান পাইল, তাহা বাস্তবিকই বুঝিয়া উঠা যায় না। গোরক্ষবিজয়ের প্রথমে হিন্দুর দেবাদিদেব মহাদেব ও তৎপত্নীর যে লীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ অনুপম বর্ণনা কোন ইসলামীয় সাহিত্যে আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

দ্বিতীয়তঃ গোরক্ষবিজয়ে হিন্দু যোগশাস্ত্রের যে সমস্ত গূঢ় কথা আলোচিত হইয়াছে, উহা যদিও প্রাচীন বা আধুনিক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ, তবুও উহা হিন্দুর নিজস্ব সম্পত্তি বৈদিক ও তৎপরবর্ত্তী যুগের সংস্কৃত সাহিত্যে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, গোরক্ষবিজয়োক্ত যোগশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক বর্ণনা দেওয়া একমাত্র সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু কবির পক্ষেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সম্ভব।

তৃতীয়তঃ গোরক্ষবিজয়ে যে কয়েকটি অধ্যাত্মতত্ত্বঘটিত আরবী-ফারসী শব্দ আছে, তাহা বাদশাহী আমলের মুসলমানী ভাষাপ্রাধান্যের জন্যই সম্ভবপর হইয়াছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই গ্রন্থখানিকে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বের রচনা বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাই ভাবিয়া যুগপৎ আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইতে হয় যে, সেই মুসলমানী আমলে এইরূপ একখানি খাঁটি হিন্দুভাবাপন্ন কাব্য কিরূপে রচিত হইয়াছিল। কবীন্দ্র দাসের মূল রচনায় হয় ত এই কয়েকটি মুসলমানী শব্দও ছিল না, কিন্তু সেখ ফয়জুল্লার সঙ্কলনে এই বিদেশী শব্দের আমদানী সম্ভবপর হইয়াছে। ডাঃ সুকুমার সেন ঠিকই বলিয়াছেন—"যে পুথি বা পুথিগুলি অবলম্বনে পুস্তকটি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার রচনায় বা সংস্কারে ফয়জুল্লার হাত ছিল বলিয়া মনে হয়।"—বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস, ৯৬৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থতঃ 'গোরক্ষবিজয়' গ্রন্থের ভিতর একটু অভিনিবেশ সহকারে তলাইয়া দেখিলে অতি অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যেই বুঝা যাইবে যে, ইহা হিন্দু কবি কবীন্দ্র দাসেরই লেখা। প্রার্থিত বর লাভ করিবার আশায় কুমারী কন্যার শিবপূজাপ্রথা এখনও যেমন বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রচলিত আছে, গোরক্ষবিজয় রচনার সময়ও উহা প্রবর্ত্তিত ছিল এবং তাহার উল্লেখ হিন্দু কবি স্পষ্টই করিয়াছেন :—

গর্ব্বস্থর রাজসুতা বিরহিণী নাম।
স্বামী হেতু শিব পুজে মাগে মনস্কাম ॥—গোরক্ষবিজয়, ৩৪ পৃঃ।

গুরু মীননাথকে কদলীরাণীদের "ভোল" বা মোহ হইতে বাঁচাইবার জন্য গোরক্ষনাথের প্রথমে যমপুরীতে গমনও হিন্দু কবির হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞানেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

তাহার পশ্চাতে গেলুম যমের ভুবন।
তথাতে দেখিলুম গিয়া তাহার লিখন ॥
তিন দিন আয়ু তার আছএ বিশেষ।
নিবারে যমের দুতে করিছে আদেশ ॥—গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ৪২।

এবং

গোর্খের দেখিয়া কোপ যম কাপে ডরে।
জতেক কাগজ আনি দিলেক গোচরে ॥
একে একে জথ কাগজ চাহে বিচারিয়া।
আপনা গুরুর লেখা নেয়ন্ত উধারিয়া ॥
শুনিয়া যমের কথা হরষিত মন।
কাগজ চাহিয়া লেখা পাইল তখন ॥
লিখন মুছিয়া নাথ বলিল বিশেষ।
আর না করিয় যম এমন সাহস ॥—গোরক্ষবিজয়, ৪৭-৪৮ পৃঃ।

এইরূপ যমরাজের খাতায় পাওয়া মীননাথের অবশিষ্ট আয়ু তিন দিন কাটিয়া দিয়া, তাঁহার আয়ু বাড়াইয়া দেওয়ার কাহিনী—"যমপুরী ও নচিকেতা"র কাহিনীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। এইরূপ হিন্দু পুরাণোক্ত উপাখ্যানে বিশ্বাস (belief in Hindu Mythology) একমাত্র হিন্দু কবির পক্ষেই স্বাভাবিক বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পঞ্চমতঃ গোরক্ষবিজয়ে বর্ণিত অসংখ্য হিন্দু উপাখ্যান হিন্দু কবি কবীন্দ্র দাসের পক্ষেই জানা ও কাব্যে ঢুকাইয়া দেওয়া স্বাভাবিক। স্বীকার করি, ফয়জুল্লার পক্ষেও তাহা জানা অস্বাভাবিক নয়; কারণ, আমরা বৈষ্ণবভাবাপন্ন অনেক মুসলমান কবিদেরও সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, কিন্তু এই গ্রন্থমধ্যে কোথাও কোনওরূপ মুসলমানী উপাখ্যান বর্ণিত নাই। যদি সেখ ফয়জুল্লাই ইহার প্রকৃত রচয়িতা হইতেন, তবে তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মীয় উপাখ্যান একেবারে বাদ দিয়া, সম্পূর্ণই হিন্দু পুরাণোক্ত কাহিনীর উপর নির্ভর করিবেন কেন? গ্রন্থের ভিতর যত উপমা, তাহাও অধিকাংশ হিন্দুভাবাপন্ন। যথা—

মুখপদ্ম সম তোহ্মার পূর্ণিমার শশী।
মোর রূপে জিনিতে পারি স্বর্গের উর্ব্বসি॥
মোর রূপে জিনিতে পারি ইন্দ্র সুরেশ্বরী।
লিলাএ জিনিতে পারি গঙ্গা আর গৌরী॥—গোরক্ষবিজয়, ১৬৬ পৃঃ।

গ্রন্থোক্ত সমস্ত দেবতারাই হিন্দুর দেবতা। যথা—

হরি হর আদি করি দেবতা সকল।— ঐ, ১৬৬ পৃঃ।
রাধা কানু বঞ্চিল এহি ক্ষিতিতলে॥
দেবের দেবতা হেন তাহা জানি।
সেহ রতি ভুঞ্জিল লইয়া রমণী॥
... ...
দেবতা গন্ধর্ব্ব য়াদি তার সেবইতি।
... ...
সিদ্ধ বিদ্যাধর জথ য়াছে চরাচর।— ঐ, ১৬৮ পৃঃ।
হরগৌরি চলি যাও পৃথিবীর মাজ।— ঐ, ৯ পৃঃ।
আত্ত গুরু মহাদেব পাছে আর সব।
সাধন্ত সকল সিদ্ধা তরিবারে ভব॥
মহাদেব চলি গেল পর্ব্বত কৈলাস।
তথা গিয়া মহাদেবে করে গৃহবাস॥— ঐ, ১৪ পৃঃ।
চল যাই তোহ্মি আহ্মি ব্রহ্মার সদন।— ঐ, ৪৬ পৃঃ।
মোর গুরু মোহাদেব জগত ঈশ্বর।
গঙ্গা গৌরি দুই নারী থাকে নিরন্তর॥
য়ার দুই নারী তার সাক্ষাতে দিগম্বর।
হেনরূপে করে গুরু কেলি কুতুহল॥— ঐ, ১১১ পৃঃ।
ভাবসিদ্ধি বলি মীনে বলে রাম রাম॥
হাসিয়া বলিলা মীনে নাম মহানাম।— ঐ, ১৮৯ পৃঃ।
উড়িয়া পরম হংস জায় ব্রহ্মপুর॥— ঐ, ১৯৪ পৃঃ।
শিব শক্তি চলি গেলা প্রভু দরশনে।— ঐ, ১৯৫ পৃঃ।

উপরি উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, প্রসিদ্ধ হিন্দু দেবদেবীর বিশেষ কেহই বাদ পড়েন নাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখা যায় যে, পৃথিবীর আদি গুরু হইতেছেন দেব-আদি-দেব মহাদেব। সত্যই যদি এই কাব্য সেখ ফয়জুল্লা কর্ত্তৃক লিখিত হইত, তবে তাঁহার স্বধর্ম্মীয় আল্লাহ-আকবর থাকিতে হিন্দুর মহাদেবকে পৃথিবীর আদিগুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাঁহার সতর্ক বিবেক কি তাঁহার লেখনীকে আঘাত করিত না? এ কথা ভাবিয়া দেখিবার পরেও যিনি গোরক্ষবিজয় সেখ ফয়জুল্লা কর্ত্তৃক রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন, বুঝিতে হইবে—তিনি গোড়া হইতেই যেন এইরূপ পক্ষপাতগ্রস্ত

ত জাহির করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু যে সত্য দ্বিপ্রহরের দিবাকরের ন্যায় প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর, তাহাকে আর কত ক্ষণ অসত্য অন্ধকারের কুক্ষিতে ঢাকিয়া রাখা যাইবে? বস্তুতঃ আজ প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের স্বর্ণযুগে যাহা খুশী প্রচারিত মত চালাইয়া দিবার সুযোগ মিলিবে না। আজ আমরা প্রত্যেকটি মতই সূক্ষ্ম যুক্তি-তর্কের দ্বারা যাচাই করিয়া লইব। যে মত সত্যের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহাকে আমরা সাদরে গ্রহণ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি। গোরক্ষবিজয়ের প্রকৃত রচয়িতা যে কবীন্দ্র দাস—এ সম্বন্ধে এখন আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না—তবুও "অধিকন্তু ন দোষায়" মনে করিয়া বিজ্ঞ সুধী জনের জ্ঞাতার্থে নিম্নোক্ত যুক্তির অবতারণা করিতেছি। ষষ্ঠতঃ—

রামের জানকী ছিল অনঙ্গের রতি।
কৃষ্ণের রুক্মিণী সত্যভামা জাম্বুবতী॥
চন্দ্রের রোহিণী শচী ইন্দ্রের জে নারী।
রাবণের মন্দোদরী শিবের গঙ্গা গৌরী॥
গন্ধর্ব্বের রম্ভা নারী শাস্ত্রেত যে দেখি।
পৃথিবীত কেবা আছে এ সব উপেখি॥—গোঃ বিজয়, ১৬৯ পৃঃ।

ইহা ত পরিষ্কারই হিন্দু কবির লেখনীপ্রসূত বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। যদি কোন মুসলমান কবির রচিত হইত, তবে এতগুলি হিন্দু নারীর পার্শ্বে এবং শুধু তাই নয়, এই সমগ্র গ্রন্থখানির মধ্যে একটিও ইসলামী বিবির নামোল্লেখ না থাকিবার কি কারণ থাকিতে পারে? ইস্‌লামী সাহিত্যে আমরা ত অনেক বিবিকে সাক্ষাৎ করিয়াছি, কিন্তু ফয়জুল্লার কাব্যে আমরা তাহাদিগকে ক্ষণেকের জন্যও দেখিতে পারিলাম না কেন?

সপ্তমতঃ, গোরক্ষবিজয়ে নিষিদ্ধ সঙ্গম সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ জোর দেওয়া হইয়াছে—

অমাবস্যা পালিয় সংক্রান্তি পালিয়
ডানে পাশে না শোয়াইয় নারী॥
নারীর নিশ্বাসে শরীর শুখাইব রে
দিনে দিনে জাইব গাভুরালী॥—গোঃ বিঃ, ১৮৬ পৃঃ।

এবং

রবি শশী অমাবস্যা এ তিথি পূর্ণিমা।
প্রতিপদ নবমী না জাইয় নারীসীমা॥
জতনে মাসান্ত পাল দশমীরে।
বাঘিনী শোয়াসে আউ জায় ধীরে ধীরে॥
বৎসরেতে বার মাস তাতে একদিন।
তত্ত্ব জানিবা যদি গুরু মুখে চিন॥
সন্ধ্যা পালিয় জান বামেতে পবন।
মন বন্দি করিয়া জে রাখহ জীবন॥

কদাচিত নিজ চন্দ্র না করিবা ব্যয়।
বার বৎসরের আয়ু একদিনে ক্ষয় ॥—গোঃ বিঃ, ১৮৮ পৃঃ।

এইরূপ উপদেশ ত সংস্কৃতে প্রসিদ্ধ—

ষষ্ঠ্যষ্টমীমমাবস্যামুভে পক্ষে চতুর্দ্দশীম্।
মৈথুনং নোপসেবেত দ্বাদশীঞ্চ মম প্রিয়াম্॥

দারোপগমন সম্বন্ধে উপরি উদ্ধৃত রচনা একমাত্র সংস্কৃত কামশাস্ত্রাভিজ্ঞ হিন্দু কবির পক্ষেই লেখা স্বাভাবিক। যদি এ গ্রন্থখানি সেখ ফয়জুল্লার রচিত হইত, তবে তাঁহার স্বধর্ম্মীয় ঐশ্লামিক বিধি কি তাঁহার লেখনীকে প্রভাবান্বিত করিত না?

ইসলামে শুধু ঋতুস্নানে তিন দিন, প্রসবের পর চল্লিশ দিন এবং রোজার সময়ে দিবসে মাত্র সহবাস নিষিদ্ধ।—যৌনবিজ্ঞান, আবুল হাসান, ১ম সংস্করণ, ৪০১ পৃঃ।

কোরানের এই উদার উক্তি শাস্ত্রবিৎ ফয়জুল্লার পক্ষে জানা অতি স্বাভাবিক। তৎসত্ত্বেও তাঁহার কাব্যে উদার কোরানোক্তি স্থান পাইল না,—স্থান পাইল বিধর্ম্মীদের শাস্ত্রানুশাসন! ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। অবশ্য, ফয়জুল্লা গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা—এই মতের স্বপক্ষে বলা যায় যে, এখানে মুসলমান কবি হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিধিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু আজি হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বেকার অন্ধতামস যুগে—যখন স্বধর্মে দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস ও পরধর্মে অসহিষ্ণুতাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের চরমতম ও পরমতম বৈশিষ্ট্য, তখনকার সেই অসভ্য বর্ব্বরোচিত ধর্ম্মান্ধতার দিনে মুসলমান কবি ফয়জুল্লার পক্ষে 'কাফের' হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধিকে তদীয় কাব্যে প্রচারিত করা সম্পূর্ণই অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস। অতএব এই কাব্যরচনা কোন মুসলমান কবির পক্ষে অসম্ভব এবং হিন্দু কবির পক্ষেই সম্পূর্ণ ন্যায়োচিত স্বাভাবিক বলিয়াই আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়।

বস্তুতঃ এই 'গোরক্ষবিজয়' হিন্দু পুরাণবর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের পটভূমিকায় হিন্দু আদর্শোদ্‌বোধিত একখানি কাব্য। ত্যাগবাদী হিন্দুর যে সনাতন আদর্শ—আত্মার মুক্তি (salvation of the soul)—তাহাই এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

"The story of the fall of Mina-nath among the women of Kadali signifies that worldly enjoyment in the form of the satisfaction of carnal desires leads a man to disease and decay ; and death in that case becomes the inevitable catastrophe of the drama of life. The self-oblivion of Mina-nath symbolises man's oblivion of his true immortal nature ; and the charms of Kadali represents the snares of life. What was repeatedly emphasised by Gorakh in his enigmatic songs in the guise of the dancing girl to recall his self-forgotten Guru to his true judgment is that the life of pleasure in company of beautiful women leads to the inevitable end of death, while the only way of escaping death and being immortal even in this very life and body is to have recourse to the path of Yoga." Obscure relegious Cults as background of Bengali Literature. Dr. S. B. Dasgupta, page 255.

ইস্‌লামীয় ভোগবাদ এ কাব্যে স্থান পায় নাই। ইহাতে হিন্দুর চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শ ই জীবন্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। কদলীরাজ্যের ষোল শত নারীর আপাতমধুর মোহ হইতে শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক গুরু মীননাথের উদ্ধার, ভোগ হইতে ত্যাগের ব্রত গ্রহণের ও দেহ হইতে আত্মার মুক্তি-সাধনার রূপক বলিয়া ধরিলে, বোধ হয়, এই কাব্যখানির প্রতি সাহিত্যিক অবিচার করা হইবে না। কিন্তু দৈহিক কামনাবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া আত্মার মুক্তি-সাধনায় সোনার ফসল ফলানোর স্বপ্নই ত অধ্যাত্মবাদী হিন্দুর চিরন্তন আত্মিক আদর্শ। এই মধুরতম আধ্যাত্মিক স্বপ্নকে কাব্যে বাস্তব রূপ দেওয়া জন্মান্তরের সংস্কার-অর্জ্জিত আজন্ম-হিন্দুভাববাদী কবির পক্ষেই একমাত্র স্বাভাবিক ও সম্ভবপর। কারণ, কাব্য জীবনদর্শন। ("Poetry is the criticism of life"—Mathew Arnold.) অতএব আমরা যে দিক্ দিয়াই এই কাব্যের রচয়িতা সম্বন্ধে বিচার করি না কেন, শেষ পর্য্যন্ত ইহা হিন্দু কবির রচিত বলিয়াই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। এবং এই হিন্দু কবি যে কবীন্দ্র দাস ভিন্ন আর কেহই নহেন, তাহা তাঁহার বিভিন্ন ভণিতাই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। অতএব কবীন্দ্র দাসই গোরক্ষবিজয়ের অবিসংবাদিত মূলরচয়িতা বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেন।

———

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৫৯ ভাগ, তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

কলিকাতা, ২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৭শ বর্ষের কর্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
আচার্য্য শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ ঃ শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা
কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীগণপতি সরকার
পুথিশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ ঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ ঃ শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীইন্দ্রজিৎ রায় ৪। ফাদার এ. দোঁতেন, ৫। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীত্রিদিবনাথ রায়, ১২। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভপাদার, ৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৫। শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র, ১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৭। শ্রীবরদাশঙ্কর চক্রবর্ত্তী, ১৮। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১৯। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ২০। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু, ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৫৯ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা

সূচি

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা
৫১ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা
১৩৫১

ভারতচন্দ্রের পাঠদ্দশা

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কাব্যরচনার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট 'কাব্যপ্রকাশে' একটি কারিকা লিখিয়াছেন :—

শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে ॥

এই ত্রিবিধ হেতুর মধ্যে কবিত্বের বীজস্বরূপ জন্মগত স্বাভাবিক শক্তি না থাকিলে কেহই কবি হইতে পারে না। মহাকবি ভারতচন্দ্রে এই ভগবদ্দত্ত কবিত্বশক্তি প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল, তাঁহার কাব্য অধ্যয়ন করিলে তাহা সহজই প্রতিভাত হয়। কোন্ অজ্ঞাত কাব্যজ্ঞের হস্তে কাব্যরচনায় ভারতচন্দ্রের প্রথম হাতেখড়ি হইয়াছিল, অধুনা তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পড়িয়া তিনি যে আত্যন্তিক অভিনিবেশ সহকারে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কোন্ কোন্ শাস্ত্র তিনি রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ংই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—

ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক ।
অলঙ্কার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥
পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী ।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী ॥ (অন্নদামঙ্গলের শেষে, পৃ. ৩১৭)

এ স্থলে একটি তথ্যের উপর কাহারও দৃষ্টি এ যাবৎ পতিত হয় নাই—অন্নদামঙ্গল রচনাকালে (১৬৭৪ শক = ১৭৫৩ খ্রীঃ) ভারতচন্দ্রের পূর্ণ অভ্যুদয় এবং তৎকালে তিনি "অধ্যাপক" ছিলেন। অর্থাৎ তিনি রীতিমত চতুষ্পাঠী করিয়া ব্যাকরণাদি ব্যুৎপত্তিশাস্ত্রের অধ্যাপনাও কিছুকাল করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের পৌত্রের নিকট জানিয়া তাঁহার পাঠদ্দশার অতি মূল্যবান্ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র পলায়ন করত মণ্ডলঘাট পরগণার অধীন গাজীপুরের সান্নিধ্য 'নওয়াপাড়া' নামক গ্রামে আপনার মাতুলালয়ে বাস করত তাজপুর গ্রামে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ এবং অভিধান পাঠ করিতে লাগিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে এই উভয় গ্রন্থে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়া, নিজালয়ে প্রত্যাগত হইয়া ঐ মণ্ডলঘাট পরগণার তাজপুরের সান্নিধ্য সারদা নামক গ্রামের কেশরকুণি আচার্য্যদিগের একটি কন্যাকে বিবাহ করিলেন, সেই বিবাহের পর তাঁহার অগ্রজ সহোদরেরা অতিশয় ভর্ৎসনাপূর্ব্বক কহিলেন, 'ভারত! তুমি আমারদের সকলের কনিষ্ঠ হইয়া এমন অনিষ্টকর কার্য্য কেন

করিবে ? সংস্কৃত পড়াতে কি ফলোদয় হইবে ? তোমার এ বিদ্যার গৌরব কে করিবে ? শিষ্য নাই ও যজমান নাই যে, তাহারদিগের দ্বারা সমাদৃত হইবে ও প্রতিপালিত হইবে'।" (জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ৪-৫)। এই বিবরণ প্রণিহিতভাবে আলোচনা করা আবশ্যক। নিতান্তই পরিতাপের বিষয় যে, মণ্ডলঘাট পরগণায় অবস্থিত ভারতচন্দ্রের বাল্যলীলার আবাসস্থল মাতুলগৃহ, গুরুগৃহ ও শ্বশুরগৃহ সম্বন্ধে কোনই গবেষণা হয় নাই। কোনও স্থানীয় ব্যক্তি এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অদ্যাপি নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ভারতচন্দ্র কোন্ সময়ে নিজগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া মাতুলাশ্রয়ে আসিয়া অধ্যয়ন করেন, তাহা অনুমান করা যায়। ১১১৯ বঙ্গাব্দে দুর্দ্দান্ত বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্র (রাজত্বকাল ১১০৯-৪৫ সন), "যাঁহাকে 'তরোয়ার বাহাদুর' বলা যায়" (সংবাদপ্রভাকর, ২৫ আষাঢ়, ১২৫৯ সংখ্যা), ভুরসুট পরগণা আক্রমণ করিয়া দখল করিয়াছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই আক্রমণের যে জনশ্রুতিমূলক বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। আমরা প্রামাণিক বিবরণ অন্যত্র লিখিয়াছি (প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৫৯, পৃ. ৫৩৭-৮)। ১১২৫ সনের পূর্ব্বে ভুরসুটে শান্তি স্থাপিত হয় নাই, প্রমাণ আছে। সুতরাং ১১২০-২৪ সনের মধ্যে কোন সময়ে ভারতচন্দ্র পলায়ন করিয়া মাতুলগৃহে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। শিক্ষারম্ভকালে তাঁহার বয়স প্রায় দশ ধরিলে মাতুলগৃহে থাকিয়া তাঁহার অধ্যয়নকাল ৮।১০ বৎসরের কম ছিল না, অনুমান করা যায়। লক্ষ্য করা আবশ্যক, তাঁহার সহোদরগণ তাঁহাকে সংস্কৃত শিক্ষালাভের জন্যই তিরস্কার করিয়াছিলেন; বিবাহের জন্য নহে। তাঁহার মাতুলাশ্রয়েই বিবাহ হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাঁহার শ্বশুরকুল রাঢ়ীয় শাণ্ডিল্যগোত্র "কেশরকোণি" নামক শ্রোত্রিয়বংশ। নবদ্বীপের রাজবংশও কেশরকোণি শ্রোত্রিয়। অনেকে ভ্রান্তিবশতঃ বলিয়া থাকেন, ভারতচন্দ্র স্বেচ্ছায় "আচার্য্য"- (অর্থাৎ গ্রহবিপ্র) বংশে বিবাহ করিয়া জাতিপাত করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই ভ্রাতৃগণের নিকট তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ "আচার্য্য" উপাধি অদ্যাপি অনেক রাঢ়ী-বারেন্দ্র সম্ভ্রান্ত বংশে বিদ্যমান আছে।

তিরস্কারের ফলে ভারতচন্দ্র দেবানন্দপুরে আসিয়া পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া জীবনের গতিকে অনেকটা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। নতুবা হয় ত উৎসাহ পাইলে তিনি স্মৃতিশাস্ত্রাদি পড়িয়া পাকা ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইয়া যাইতেন এবং বাঙ্গালী জাতি একজন মহাকবিকে হারাইয়া ফেলিতেন। দেবানন্দপুরে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মুন্সীবংশের বিবরণ বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এ যাবৎ সঙ্কলিত হয় নাই। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রিরচিত "বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাসে" (২য় খণ্ড, ১৯৩৫ খ্রীঃ, পৃ. ২১৫-২৩) এবং তদনুযায়ী "হুগলী জেলার ইতিহাসে" (পৃ. ৩১৬-২১) এই বংশের বিবরণ যেটুকু পাওয়া যায়, তাহা অভ্রান্ত নহে। আমরা সংশোধনপূর্ব্বক একটি প্রামাণিক বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুঃখের বিষয়, নবাবী সনন্দ, পারসী পুথি প্রভৃতি বংশের ঐতিহাসিক উপকরণ বহুকাল বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থবংশীয় "কামদেব দত্তচৌধুরী" সর্ব্বপ্রথম দেবানন্দপুরে আগমন করেন। হুগলী কালেক্টরীর ৬০০২৭নং তায়দাদ দৃষ্টে জানা যায়, তিনি অজ্ঞাতনামা নবাবের নিকট

"লাখরাজী পাইয়া গড়বাটী করেন" (ভূমির পরিমাণ ৩/০ বিঘা)। লাখেরাজপ্রাপ্তির তারিখ তায়দাদে লিখিত নাই, বংশের কুরছীনামায় লিখিত আছে "১০০১ হিজরী সনে" (অর্থাৎ ১৫৯২-৩ খ্রীঃ) কামদেব আগমন করিয়াছিলেন। ইহা অসম্ভব নহে ; কারণ, ১২০৯ বঙ্গাব্দে কামদেবের অধস্তন "৭ম পুরুষ" দখলকার ছিলেন। কামদেবের দুই পুত্র—দেবীদাস ও কল্যাণপ্রসাদ (ওরফে পরমানন্দ)। এই কল্যাণপ্রসাদের ধারায়ই ভারতচন্দ্রের দুই জন পৃষ্ঠপোষকের নাম পাওয়া যাইতেছে। তাহা নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের প্রাথমিক রচনা সত্যনারায়ণের দুইটি ব্রতকথা হইতে শেষ ভণিতাস্থল উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। কারণ, তৎসম্বন্ধে কিছুটা ভ্রান্ত ধারণা চলিতেছে। ত্রিপদী ছন্দের ব্রতকথার শেষ এই :—

> দেবানন্দপুর গ্রাম, দেবের আনন্দ ধাম, **হীরারাম রায়ের** বাসনা ॥
> ভারত ব্রাহ্মণ কয়, দয়া কর মহাশয়, নায়কেরে গোষ্ঠীর সহিত।
> ব্রতকথা সাঙ্গ হলো, সবে হরি হরি বলো, দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত ॥
>
> (গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪৪৩)

চৌপদী ছন্দের কথাশেষ যথা,—

> ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ, সদা ভাবে হতকংস, ভুরসুটে বসতি।
> নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুকুটী খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥
> দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, **রামচন্দ্র মুনসী**।
> ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥
> সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পুঁথি, তেমনি করিয়া গতি, না করিও দূষণা।
> গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হোন্ বরদায়, ব্রতকথা সাঙ্গ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা ॥
>
> (গ্রন্থাবলী, পৃ. ৪৪৫)

আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিয়াছিলাম, ভারতচন্দ্রের "নায়ক" হীরারাম রায় তাঁহার এক রাজ্যভ্রষ্ট জ্ঞাতি হইতে পারেন (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১৮৯)। অধুনা তাহা নিষ্প্রমাণ প্রতিপন্ন হইতেছে। "ভারত ব্রাহ্মণ কয়" ভণিতা হইতে উক্ত নায়কের ব্রাহ্মণেতর জাতিই সূচিত হয় এবং জানা যায়, মুন্সীবংশেই তৎকালে ঐ নামে একজন ছিলেন। দুইটি ব্রতকথার পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত অনুমানে স্থির করিয়াছিলেন--ত্রিপদীটিই প্রথম রচিত। কারণ, চৌপদীর রচনা "অল্লাংশেই উত্তম"। পক্ষান্তরে আমরা মনে করি, চৌপদীতে নিজের এবং নায়কের যেরূপ সুস্পষ্ট পরিচয় লিখিত হইয়াছে, প্রথম রচনায়ই তাহা সম্ভাবিত হয় এবং ত্রিপদীতে উভয়ের বিন্দুমাত্র পরিচয় না থাকায় বুঝা যায়, তাহার রচনাকালে ঐরূপ পরিচয় প্রদানের আবশ্যকতা ছিল না। সুতরাং তাহা পরে রচিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। চৌপদী কথাটি স্থলে স্থলে বিলুপ্তাক্ষর ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ একটি মাত্র আদর্শ পুথি হইতে "বহুকষ্টে" সংগৃহীত এবং তজ্জন্য অনেক স্থলে পাঠ সংশয়াকুল রহিয়াছে। নায়কের পরিচয়ে একটি পঙ্ক্তির পাঠ -"ভারতে নরেন্দ্র রায়"—নিশ্চিতই ভ্রান্ত। ইহার কোন অর্থই হয় না। সম্ভবতঃ প্রকৃত পাঠ হইবে "ভারতনরেন্দ্র-রায়"—

অর্থাৎ যিনি ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক "রায়" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইহাতেও কষ্টকল্পনা রহিয়া গেল। তবে ইহা সত্য যে, এই সম্রান্ত দত্তবংশে ঐ সময়ে দুইটি সম্মানসূচক উপাধিই বিদ্যমান ছিল—'রায়' ও 'মুন্‌শী'। বর্দ্ধমানরাজ চিত্রসেন এই বংশের "রামভদ্র রায় মুনশী"কে দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন—দানপত্রের তারিখ ২১ পৌষ ১১৪৮ বঙ্গাব্দ (হুগলী কালেক্টরীর ৩৭০১৩ নং তায়দাদ)। দ্বিতীয়তঃ, চৌপদী ব্রতকথার নায়ক ছিলেন "রামচন্দ্র মুনশী"—ঈশ্বর গুপ্তের সুস্পষ্ট লেখানুসারে ইহাই এত কাল সুবিদিত ছিল। হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত "পারিবারিক ইতিহাসে" লিখিত হইল, ঐ নায়কের নাম "রামরাম মুনশী" (রামচন্দ্র নহে) এবং সম্রাট্ মাহাম্মদ সাহ ১১২৩ হিজরিতে রামরামকে জায়গীরাদি দান করিয়াছিলেন। উক্ত ইতিহাসলেখকের মতে ১১২৩ হিজরি ১১৫১ বঙ্গাব্দের সমান!! এই ভ্রান্তিপূর্ণ উক্তিই পরে হুগলী জেলার ইতিহাসে (পৃ. ৩১৬-১৮) স্থান লাভ করিয়াছে এবং ভ্রান্তির পরিবর্দ্ধন করিয়া লিখিত হইয়াছে, রামরাম ছিলেন কল্যাণপ্রসাদের পুত্র (অর্থাৎ কামদেবের পৌত্র)! ঈশ্বর গুপ্ত ভণিতায় যাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন ("তাহে অধিকারী রায়, রামচন্দ্র মুনশী"), তাহা হইতে রামচন্দ্র নামই পাওয়া যায় এবং তাঁহার রূপকস্বরূপ পৌরাণিক রামনাম চৌপদীর প্রথম পদে গৃহীত হইয়াছে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে "রামরামচন্দ্র" একটা নাম হইতে পারে না এবং হইলেও ভাঙ্গিয়া দুই পদে লেখা কবির অক্ষমতা সূচনা করে।

দেবানন্দপুরে বর্ত্তমানে যে নামমালা রক্ষিত আছে, আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়াছি।[১] তদনুসারে কল্যাণপ্রসাদের পুত্র রামনারায়ণ, তৎপুত্র রঘুনাথ, জয়কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ ও ঘনশ্যাম চারি জন। জয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র পূর্ব্বোক্ত রামভদ্র। রাধাকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ও রামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র হীরারাম। পিতা পুত্র, এই দুই জনই ভারতচন্দ্রের নায়ক ছিলেন সন্দেহ নাই। রাধাকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র (অর্থাৎ রামচন্দ্রের ভ্রাতা) রামেশ্বরের পুত্রের নাম রামরাম। তাঁহার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কথা লিখিত আছে যে, তাঁহার নামান্তর ছিল রামচন্দ্র। ইহা ভ্রমাত্মক, কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না—পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের এক নাম কখনই হইতে পারে না। যে কারণে এই নামান্তর কল্পিত হইয়াছিল, তাহা এইরূপ—ঈশ্বর গুপ্তের ভারতজীবনী প্রকাশের পর উক্ত নামমালার অধুনালুপ্ত আদর্শ রচিত হয় এবং তাহাতে রামরামের সম্বন্ধে মূল্যবান্ স্মারকলিপি লিখিত আছে যে, সম্রাট্ মাহম্মদ সাহ ১১৩৩ হিজরী সনে (অর্থাৎ ১৭২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহাকে পুরুষানুক্রমে "মুনশী" পদবীতে ভূষিত করেন এবং তিনিই ভারতচন্দ্রের নায়ক ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের লেখার সহিত বিরোধ হয় এবং তাহার সমাধানের জন্য রামরামেরই রামচন্দ্র নামান্তর কল্পিত হয়। আমরা অনুমান করি, দিল্লীর সম্রাটের দানভাজন ছিলেন রামচন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামরাম নহে। কারণ, রামচন্দ্রের এক পিতৃব্যপুত্র রামভদ্রের রায়-মুনশী উপাধি এবং দানপ্রাপ্তিকাল (১৭৪১ খ্রী)

১। কল্যাণপ্রসাদের বংশধর শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ. বি এল্ মহাশয়ের নিকট এই দুর্লভ নামমালা রক্ষিত আছে, আমরা তাঁহার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইহা বহু পূর্ব্বেই মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল।

তাহাই সূচনা করে। রামভদ্রের পূর্ব্বে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কিত রামরায়ের উচ্চ সম্মান ও উপাধিপ্রাপ্তি সম্ভাবিত হয় না। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কল্যাণপ্রসাদের ধারার আরম্ভে এক পুরুষের নাম অতিরিক্ত হইয়া গিয়াছে—যাহা সংশোধন করার কোন উপায় নাই। কামদেবনামীয় তায়দাদের সঙ্গে একটি দানপত্রের উল্লেখ আছে—কামদেবের "প্রপৌত্র" হরেকৃষ্ণ ১১৬৯ সনে দেবীদাসের বংশধর (যজ্ঞেশ্বরের পিতা) প্রাণকৃষ্ণকে ভূমি দান করেন। হরেকৃষ্ণ ঘনশ্যামের পুত্র অর্থাৎ বর্ত্তমান নামমালানুসারে কামদেবের "বৃদ্ধপ্রপৌত্র" হইতেছেন। আমরা রামনারায়ণকে রঘুনাথ প্রভৃতির ভ্রাতা ধরিয়া ইহার সংশোধন করিতে চাই।[২] সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে, কামদেবের প্রপৌত্র রামচন্দ্রই ভারতচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষক ও পারসীশিক্ষক ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ রামচন্দ্রের পুত্র হীরারাম ভারতচন্দ্রের সমবয়স্ক ও সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধে পৃথক্ ব্রতকথা পরে রচনা করেন।

ব্রতকথা দুইটির ভণিতায় "দ্বিজপদে সুমতি" ও "দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত"—এই দুইটি পঙ্‌ক্তি দেখিয়া আমাদের অনুমান হইতেছে, দেবানন্দপুরেও ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। দেবানন্দপুরে পূর্ব্বে অনেক চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল—শেষ পণ্ডিত চন্দ্রকুমার ন্যায়রত্ন প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। এখানে অবস্থানকালেই সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র "গঙ্গাষ্টক" রচনা করিয়াছিলেন। গঙ্গাষ্টকে ছাত্রসুলভ কয়েকটি ব্যাকরণের ভুল লক্ষিত হয় এবং রচনাও উৎকৃষ্ট নহে। তুলনায় নাগাষ্টকের রচনা অত্যুৎকৃষ্ট এবং ভ্রান্তিবর্জ্জিত। ভারতচন্দ্রের পঠদ্দশা ২০ বৎসরের কম হইবে না (১১২৪ হইতে ১১৪৪ সন পর্য্যন্ত)—তিনি অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, ইহা অমূলক কথা।

উল্লিখিত আলোচনার ফলে ভারতচন্দ্রের জন্মসন সম্বন্ধে পুনর্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্রের পৌত্রের নিকট জানিয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন, "রায় গুণাকর মহাশয় ১৬৩৪ শকে শুভক্ষণে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।" (জীবনবৃত্তান্ত, ১২৬২, পৃ. ৩)। এ বিষয়ে গুপ্তকবি নিঃসংশয় ছিলেন এবং পরেও লিখিয়াছেন, "শকের সহিত সালের গণনা করাতেই নির্দ্দিষ্ট হইল তিনি বাঙ্গালা ১১১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন।" (ঐ, পৃ. ৩)। গ্রন্থশেষে গুপ্তকবি যে ভারতচন্দ্রের জীবনপঞ্জীর পুনর্বিচার করিয়াছেন (পৃ. ৫৮-৬০), তাহাতেও ঐ জন্মসন ধরিয়াই গণনা হইয়াছে। লক্ষ্য করা আবশ্যক, গুপ্তকবি তৎস্থলে জন্মসনটিকে অভ্রান্ত ধরিয়া বাধ্য হইয়া একটি কষ্টকল্পনার আশ্রয় করিয়া লিখিয়াছেন —"৪০" বৎসর বয়সে তিনি কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন "এবং সেই বর্ষেই রাজাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল রচনা করেন।" (পৃ. ৬০) আমরা বহু পূর্ব্বেই ভারতচন্দ্রের জন্মাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছিলাম, এই জন্মাব্দনির্ণয় অভ্রান্ত নহে এবং "১৮শ শতাব্দীর

২। বংশের দুইটি ধারায় পুরুষগণনায়ও একটি বিস্ময়কর ভুল ধরা পড়ে, দেবীদাসের ধারায় শ্রীশৈলেন্দ্রমোহন দত্ত কামদেব হইতে নবম পুরুষ, কিন্তু তিনি কামদেব হইতে একাদশ পুরুষ শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পর্কে খুড়া ঘটেন। প্রস্তাবিত সংশোধন দ্বারা এই ভুলও কাটিয়া যায়।

প্রথম দশকের শেষার্দ্ধে (১৭০৫-১০খ্রীঃ) তাঁহার জন্মকাল স্থূলতঃ নির্ণয় করিতে হইবে।" (সা-প-প, ৪৮, পৃ. ১৯০)। এ বিষয়ে পরে দৃঢ়তর প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ৪০ বৎসর বয়সে ভারতচন্দ্র নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা "নাগাষ্টকে" তিনি স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়াছেন— "বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া" (দ্বিতীয় শ্লোক)। কিন্তু লক্ষ্য করা আবশ্যক, রাজসভায় "৪০ টাকা মাসিক বেতন" (জীবনবৃত্তান্ত, পৃ. ২১) পাইয়া তিনি কৃষ্ণনগরেই বেশ কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন এবং পরে মূলাযোড়ে বাটী করেন। মূলাযোড়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে ভূমি দান করেন, ঐ দানপত্রের নকল নদীয়া কালেক্টরীতে আবিষ্কার করিয়া আমরা প্রকাশ করিয়াছি (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৬)—দানপত্রের তারিখ ১ অগ্রহায়ণ ১১৫৬ (১৭৪৯ খ্রী.)। ভূমির পরিচয়স্থলে লিখিত আছে—"পং হাবেলিশহরের মূলাজোড় শং বাস্ত দী ৩২৴০" (নদীয়ার ২০৩৩৭ নং তায়দাদ)। সুতরাং বর্দ্ধমানরাজের নায়েব রামদেব নাগের সহিত সঙ্ঘর্ষ ও "নাগাষ্টক" রচনা ১১৫৭ সনের ঘটনা—পূর্ব্বেও নহে, পরেও নহে। কারণ, নাগাষ্টক রচনাকালে কবির পিতা জীবিত ছিলেন এবং একটি মাত্র শিশু পুত্র জন্মিয়াছিল (৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য)। আর, ১১৫৯ সনে রচিত অন্নদামঙ্গলের শেষ পঙ্‌ক্তিতে তিন পুত্রের নামোল্লেখ আছে ("পরীক্ষিৎ তন্থু ভগবানে")। মূলাজোড়ে বাস স্থাপনের তিন বৎসর পূর্ব্বে ৪০ বৎসর বয়সে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় আগমন ধরিয়া আমরা ঠিক ১৬২৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ১১১৩ সন ও ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের জন্ম নির্ণয় করিব। কোন কোন লিপিকর ২ ও ৮ সংখ্যার অঙ্ক এমন ভাবে লিখিতেন যে, তাহা ৩ ও ৪ অঙ্কের সদৃশ দেখায়। আমাদের নিকট সৃষ্টিধরাচার্য্যরচিত "ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতি" নামক ব্যাকরণগ্রন্থের একাংশের প্রতিলিপি রক্ষিত আছে, ইহাতে ৩ সংখ্যার অঙ্ক প্রায় অবিকল দুইয়ের অঙ্কের মত এবং আটের অঙ্ক অবিকল বর্ত্তমান চারির অঙ্কের মত দেখিতে, কেবল আটের চিরপরিচিত মধ্যস্থ সমরেখাটি অতিরিক্ত। আমাদের এক্ষণে কোন সংশয় নাই যে, এইরূপ কোন লিপিকরের হস্তলিখিত অস্পষ্ট ১৬২৮ অঙ্ক ভুল করিয়া ১৬৩৪ শকাব্দ পড়া হইয়াছিল। ঐ পুথির বিচিত্র পত্রাঙ্ক দেখিলে এইরূপ ভুলের জন্য কাহাকেও বেশী দোষ দেওয়া যায় না। এই নবনির্ণীত জন্মাব্দের প্রমাণবলে ১১৬৭ সনে মৃত্যুকালে ভারতচন্দ্রের বয়স হয় ৫৪ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ককাল হয় ১৪ বৎসর। তাঁহার "গুণাকর" উপাধি ১৭৪৬-৪৯খ্রী মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বোক্ত দানপত্রে ঐ উপাধির নির্দ্দেশ আছে। আমরা সংক্ষেপে ভারতচন্দ্রের বিচিত্র জীবনযাত্রার একটি কালসূচি লিখিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

১১১৩ বঙ্গাব্দ—জন্ম (জন্মস্থান পাঁড়ুয়া ওরফে রাধানগর)।

১১১৯ কীর্ত্তিচন্দ্রকর্তৃক ভুরশুটরাজ্য অধিকার।

১১২৩-২৪ মাতুলগৃহে পলায়ন।

১১২৪-৪৪ পঠদ্দশা।

১১৪৩	সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা (চৌপদী)।
১১৪৪-৫	সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা (ত্রিপদী)।
১১৪৫-৪৮	বৰ্দ্ধমানে মোক্তারী।
১১৪৮	বর্গীর হাঙ্গামার সূত্রপাত।
১১৪৮-৫২	উড়িষ্যাদি পরিভ্রমণ (৫ বৎসর)।
১১৫২-৫৩	চন্দননগরে।
১১৫৩	কৃষ্ণনগরে।
১১৫৬	মূলাযোড়ে বাটীনির্ম্মাণ।
১১৫৭	নাগাষ্টকরচনা।
১১৫৯ (চৈত্র)	অন্নদামঙ্গলরচনা (১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ)।
১১৬৭	মৃত্যু।

বাংলা ভাষায় পালি শব্দ ও ইডিয়ম্

শ্রীরমাপ্রসাদ চৌধুরী, এম. এ.

বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত, এবং প্রাকৃত ভাষাগুলির মধ্যে পালি সর্বপ্রাচীন। এই প্রবন্ধে বাংলা ভাষার উপর পালি ভাষার শব্দগত প্রভাব বিচার করা হইবে। অন্যান্য প্রাকৃত ভাষারও বাংলা ভাষার উপর অনুরূপ প্রভাব দৃষ্ট হয়, কিন্তু এখানে, যত দূর সম্ভব, পালি ভাষার নিজস্ব দানটুকু দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। পালি ভাষার জ্ঞানের অভাবে অনেক বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি অজ্ঞাত রহিয়াছে। আভিধানিকগণ অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তি পালি হইতে জানিতে পারিবেন, এবং প্রাকৃত বা পালি মূল শব্দের উল্লেখ অভিধানে দেওয়া থাকিলে সুন্দর হয়।

বাংলা ভাষায় প্রাকৃতের ছাপ যথেষ্ট থাকিলেও বৈয়াকরণগণ সংস্কৃতের দাবিকেই প্রাধান্য দান করিয়া বাংলা ব্যাকরণ রচনা করিয়াছেন, তবে প্রাকৃত ভাষাগুলির অধিকতর চর্চার ফলে বাংলা ব্যাকরণের ধারার পরিবর্তন হইবে, আশা করা যায়।

পালি সাহিত্য ভগবান্ বুদ্ধের কথিত ভাষণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে ইহাতে অনেক শব্দের কথ্য ও গ্রাম্য রূপ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

* * *

পালি ভাষায় দুই তিনটি স্বর অবিদ্যমান; চলিত বাংলায়, এমন কি, সাহিত্যেও অনেক স্থলে তাহাদের ব্যবহার হয় না, যেমন পশ্চিম-বঙ্গে কেহ "তেল"কে "তৈল" বলে না, "ওষুধ"কে "ঔষধ" বলে না। পালিতে ঋকার ইকারে পরিবর্তিত হয়, যেমন বাংলায়ও হয়, যথা শিয়াল, শিঙ। পালি √পুচ্ছ হইতে বাংলায় "পুছায়" শব্দ আসিয়াছে—এখানে সং "পৃচ্ছতি"র ঋকার উকারে পরিণত হইয়াছে।[১] "ড়" "ঢ়" বৈদিক ভাষায় বর্তমান, কিন্তু সংস্কৃতে অবলুপ্ত; পালিতে কিন্তু বৈদিক ধারা বজায় রহিয়াছে, যেমন "আসাঢ়" (আষাঢ়), "গাঢ়," "বিড়ার" (বিড়াল)। "য়"কার একটি নূতন বর্ণ; ইহা সংস্কৃতে নাই—ইহা য-শ্রুতি, পূর্ণ "য"কার নহে। পদমধ্যস্থিত লুপ্ত বর্ণের স্থানেই সচরাচর ইহার ব্যবহার হয়। তবে কখনও কখনও "য" ও "য়"এর পার্থক্য অগ্রাহ্য করা হইয়া থাকে। পালিতে খাদতি ও খাযতি, সায়তি (√স্বাদ্) প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়। বাংলায় বর্গীয় "ব" ও অন্তস্থ "ব" একাকার হইয়া গিয়াছে; উহাদের উচ্চারণের পার্থক্য নাই; অভিধানেও অন্তস্থ "ব"এর পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, অথচ "কিম্বা," "এবম্বিধ," "সম্বরণ" ইত্যাদি বানান লিখিলে ছাত্রদের নম্বর কাটা হয়। অন্তস্থ "ব"এর অনাদর বহু প্রাচীন। পালিতে অনেক শব্দে,

১। বাং "উপর"এর গ্রাম্য উচ্চারণ "ওপর"; তুঃ অনুপম<পালি "অনোপম"। এই প্রকার স্বরবিকৃতির দৃষ্টান্ত সকল ভাষায় অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বিসর্গ পালিতে নাই; বাংলায় অনেকে বিসর্গ লিখেন না, যেমন প্রায়শ, সাধারণত, নিশ্বাস ইত্যাদি।

বিশেষত শব্দের আদিতে "ব"এর স্থানে "ব"এর প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন ব্যাধি= ব্যাধি, ব্যাপাদ=ব্যাপাদ, এবং পালি "বব" সর্বত্র "ব্‌ব" হইয়া থাকে, যদিচ অন্য প্রাকৃতে এরূপ হয় না।

আমরা লিখি সংস্কৃত অনুযায়ী, কিন্তু উচ্চারণ করি প্রাকৃতের ন্যায়—"শিক্ষা"কে বলি "শিক্‌খা," "দিব্যকে" বলি "দিব্‌ব," "দুঃখকে" বলি "দুক্‌খ," "ধর্মকর্ম"কে বলি "ধম্মকম্ম"। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"বানানের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দিলেই দেখা যাবে বাংলায় তৎসম শব্দ নেই বলিলেই হয়।"

* * *

প্রাকৃত শব্দের আদিতে একাক্ষর এবং শব্দমধ্যে স্বক্ষরিক যুক্ত বর্ণ, ইহাই নিয়ম, ব্যতিক্রম কচিৎ দৃষ্ট হয়। উচ্চারণক্ষেত্রে বাংলা শব্দেরও এই রীতি— √জ্বল= √জল্, স্ব=স, ক্ষমা= খমা, শ্বশুর=শশুর। (পালি "সস্‌সুর"), শ্মশান=শশান (পালি "সুসান"), স্ফোট=ফোড়া (পালি "ফোট"), দ্বীপ=দীপ, জ্যোতি=জোতি (পালি "জুতি"), স্বর্গ=সর্গ (পালি "সগ্‌গ"), স্বামী=সামী; "প্রত্যেক" শব্দের গ্রাম্য উচ্চারণ পত্যেক (পালি "পচ্চেক"); এমন কি, লেখ্য ভাষায় আমরা "খোদিত" (এবং "ক্ষোদিত"), "খুর" (এবং "ক্ষুর"), "খুদ," থালা (স্থাল), থলি (স্থলী) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু সকল ক্ষাদি শব্দ এরূপ ভাবে লেখা হয় না। যেগুলি হয় না, তাহা ক্রমে ক্রমে চালাইয়া দিতে হইবে। কতকগুলি চলিবে আর কতকগুলি চলিবে না, এ কিরূপ ব্যবস্থা?[২]

পালি শব্দমধ্যে ত্র্যক্ষরিক যুক্তবর্ণ নাই বলিলেই হয়। বাংলায় শব্দমধ্যস্থিত ত্র্যক্ষরিক বর্ণ আমরা লিখিয়া থাকি, যথা "লক্ষ্মণ," কিন্তু বলি "লক্‌খণ"; সেইরূপ তীক্ষ্ণ="তীখ্ন" (পালি তিখিণ), ঊর্ধ্ব=উর্ধ (পালি উদ্ধ), আকাঙ্ক্ষা=আকাঙ্খা (পালি আকঙ্খা), উজ্জ্বল=উজ্জল, সংখ্যা=সংখা, সন্ধ্যা=সন্ধা ইত্যাদি। উচ্চারণ অনুযায়ী বানানসংস্কার কি হইবে না? দ্বিত্ব বর্ণ যেখানে অতিরিক্ত বিবেচিত হইয়াছে, সেই স্থলেই কি কেবল সংস্কারের প্রয়োজন? এই বর্ণদ্বিত্বের আবির্ভাব বহু পুরাতন। পালিতে দেখিতে পাই যে, "য"-ফলা বহু ক্ষেত্রে লিখিত হইত। বানান ত উচ্চারণ অনুসরণ করিয়া চলে—সং "দেয়"=পালি দেয্য, শ্রেয়ঃ= সেয্য, বৈয়াকরণ=বেয্যাকরণ, পূজনীয়=পূজনেয্য (এবং পূজনীয়) ইত্যাদি। দ্বিত্ব "ব"এর দৃষ্টান্ত দুই একটি মাত্র শব্দে পাওয়া যায়—যৌবন=যোব্‌বন, সীবনী=সিব্‌বনী, অন্য অক্ষরের মধ্যে—প্রত্যেক=পাটিযেক্ক (এবং পচ্চেক)—তুঃ প্রাকৃত "এক্ক"। এই দ্বিত্ব উচ্চারণ ও লিখন ব্যবস্থা প্রাকৃত হইতে সংস্কৃতে সঞ্চারিত হইয়াছে।

প্রাকৃতে ব্যঞ্জনান্ত শব্দ নাই; সাধারণত অন্তস্থিত ব্যঞ্জনটির লোপ সাধন করিয়া শব্দটি স্বরান্ত করিয়া লওয়া হয়—মনস্, তেজস্, আয়ুস্, ধনুস্ ইত্যাদি শব্দগুলি পালির ন্যায় বাংলাতেও কখনও কখনও স্বরান্ত এবং কখনও কখনও, বিশেষত সমস্ত পদে ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া গৃহীত হয়; যেমন মনস্ শব্দের একবচনে পালিতে মনং ও মনো হয়—সমাসে হয়

২। গ্রাম্য উচ্চারণে আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণ অনেক সময়ে লুপ্ত হয়—রামবাবু>আমবাবু—তুঃ পালি রুক্ক=উক্ক।

মনো-ময়, মনান্তর, যশগান, নভতল ইত্যাদি শব্দ অশুদ্ধ বিবেচিত হয়। চক্ষুগোচর, আয়ুক্ষয়, মনমোহন প্রভৃতি বানান চালাইয়া দিলেই হয়। পালি ব্যাকরণ অনুসারে "মনোকষ্ট" পদ অশুদ্ধ নহে; মনোপুব্ব (মনঃপূর্ব), মনোসেট্‌ঠ (মনঃশ্রেষ্ঠ) প্রভৃতি শুদ্ধ সমস্তপদ; সুতরাং ইতোপূর্বে লিখিলে দোষের হইবে না। বাংলায় আমরা "জগবন্ধু," "জগমোহন" বলি, "জগদ্বন্ধু," "জগন্মোহন" বলি না। আবার কয়েকটি শব্দ পালিতে ও বাংলায় একেবারে স্বরান্ত বলিয়া গৃহীত হয়, যেমন "কর্ম," সর (সরস্) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জনান্ত শব্দে অকার বা আকার যুক্ত করিয়া তাহা স্বরান্ত শব্দে পরিণত করা হয়, যথা—সুহৃদ্ হইতে পালি "সুহদ" শব্দ আগত; তুলনীয় বাংলা "হৃদে," "হৃদ্" শব্দের সপ্তমীর একবচন।

পরবর্তী প্রাকৃতগুলিতে যে যে লক্ষণ পরিস্ফুট, তাহাদের পূর্বাভাস পালিতে দৃষ্ট হয়। স্বরমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনের লোপ প্রাকৃতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়; কয়েকটি মাত্র পালি শব্দে এরূপ দেখা যায়, যথা, চতুর্দশ = চুদ্দস>বাং "চোদ্দ," বাতুল>বাং "বাউল"। পদমধ্যস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হইলে সময় সময় দুইটি স্বর প্রাকৃতে পৃথক্ ভাবে পাশাপাশি থাকে, কিন্তু পালিতে তাহাদের সন্ধি হইয়া যায়, যথা স্থবির>থইর (অশোক অনুশাসন)>থের> বাং থুড় থুড়। অধিকাংশ স্থলে লুপ্ত বর্ণের স্থানে "য"শ্রুতির প্রয়োগ হয়, যেমন নিজ>নিয, খাদিত>খায়িত; সেইরূপ বাংলায় শিয়াল, কুয়া, অমিয়। "ন"এর "ণ"এ পরিবর্তন, যেমন "মাণবক," পালি দুই চারিটি শব্দে দেখা যায়—প্রাকৃতে প্রায় নকার "ণ" হয়।

* *

প্রাকৃত শব্দাবলীর একটি প্রধান লক্ষণ সমীকরণ (assimilation) বাংলা কথ্য ভাষায় বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চলিত বাংলা ভাষা প্রাকৃত শব্দে ভরা—সর্ব>সব্ব>সব, মুদ্গ>মুগ্গ>মুগ, যক্ষ>যক্খ>যক, ভোজ্য>ভোজ্জ>ভোজ ইত্যাদি। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনসন্ধিতে বা প্রত্যয়-যোগে মাত্র সমীকরণের দৃষ্টান্ত মিলে।[৩]

পালি শব্দে স্পর্শবর্ণের প্রথমটি সচরাচর সমীভূত হয়। এইরূপ পরিবর্তনের সহিত প্রায়ই ক্ষতিপূরণ (compensation)এর প্রয়োগ দেখা যায়—সপ্ত>সত্ত>সাত, ভক্ত>ভত্ত>ভাত,[৪] দুগ্ধ>দুদ্ধ>দুধ ইত্যাদি। স্পর্শবর্ণের সহিত অনুনাসিক যুক্ত হইলে পরবর্তী বর্ণের সমীভবন হয়—লগ্ন>লগ্গ>লাগা। য্ র্ ল্ ব্ সংযুক্ত বর্ণ প্রায়শ সমীভূত হয়—অগ্র>অগ্গ>আগ, দুর্গ>দুগ্গ>, তুঃ বাংলা উচ্চারণ "দুগ্গা," কৈবর্ত>কেবট্ট>কেবট, শল্য>সল্ল>শাল,[৫] কর্ম>কম্ম>কাম, চর্ম>চম্ম>চাম, পুত্র>পুত্ত>পুত, সূত্র>সুত্ত[৬]>সূতা, অম্বর>অম্ময়; অভ্যন্তর>

৩। যেমন উদ্+স্থা—উত্থা, শরচ্চন্দ্র ইত্যাদি।

৪। সমীভবনের সহিত ক্ষতিপূরণ থাকিলে তাহা পরবর্ত্তী কালের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু প্রাচীন পালি গ্রন্থে এই তথাকথিত পরবর্ত্তী রূপ কয়েকটি শব্দে দৃষ্ট হয়, যথা, দীর্ঘ>দিগ্‌ঘ>দীঘ (যাহা হইতে পালি "দিগ্‌ঘিকা" ও বাং "দীঘি" শব্দ), মূল্য>মূল ইত্যাদি।

৫। অভিধানে এই শব্দটির উল্লেখ নাই।

৬। পালিতে যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্বর হ্রস্ব হয়।

অত্তন্তর, পক্ব > পালি বানান ও বাংলা উচ্চারণ "পক্ক" > পাকা, বিশ্বাস > বিস্সাস, ভদ্র > ভল্ল > ভাল, আর্দ্র > অল্ল—শেষোক্ত দুইটি শব্দে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে—"র"এর পরিবর্ত্তে "ল" সমীভূত হইয়াছে।[৭] সেইরূপ "ক্ষুদ্র" হইতে "খুল্ল"—পালি "চুল্ল" বা "চূল" (শব্দের আদিতে "ক্ষ" "খ" বা "ছ" (১)কারে পরিণত হয়; নিম্নে দ্রষ্টব্য)। পণ্ডিতী ব্যুৎপত্তি অনুসারে "খুল্ল" শব্দ √খু ধাতুনিষ্পন্ন। "খুড়া," "কুলি"। যেমন কুলি বেগুন এবং গ্রাম্য "কুল্লে" শব্দ "মাত্র" অর্থে, "খুল্ল" হইতে ব্যুৎপন্ন বলিয়া মনে হয়। খুল্লতাত শব্দের পালি চুল পিতা। চুণো (-মাছ) শব্দটি "চুল্ল" হইতে উদ্ভূত ধরা যাইতে পারে।

তবর্গের সহিত যকার যুক্ত হইলে তবর্গের বর্ণ চবর্গে পরিণত হয়, এবং যকার সমীভূত হয়—সত্য > সচ্চ > সাচ্চা, মিথ্যা > মিচ্ছা > মিছা, অদ্য > অজ্জ > আজ, মধ্য > মজ্ঝ > মাঝ।[৮]

শ, ষ, স যুক্ত বর্ণে সমীভূত হয় এবং অপর বর্ণটি ঘোষবরে পরিণত হয়—অক্ষর > অক্খর, কাষ্ঠ > কট্ঠ > কাঠ, অষ্ট > অট্ঠ > আট, বেষ্টন > বেঠন > বেড়া, দংষ্ট্রা > দাঠা > দাঁড়া (অনুনাসিক সংস্কৃত হইতে), ঘৃষ্ট > ঘুট্ঠ > ঘোঁট, হস্ত > হত্থ > হাত, মস্তক > মত্থক > মাথা। "ৎস" "চ্ছ" হয়—মৎস্য > মচ্ছ > মাছ, বৎস > বচ্ছ > বাছা, চিকিৎসা > তিকিচ্ছা > বাংলা গ্রাম্য তিকিচ্ছা, বিচিকিৎসা > বিচিকিচ্ছা > বাং গ্রাম্য বিতিকিচ্ছি, কুৎসিত > কুচ্ছিত, পালি ও বাংলা গ্রাম্য, কুৎসা > বাংলা কুচ্ছো।

কয়েকটি শব্দে "ক্ষ" "চ্ছ"এ পরিণত হয়—ঋক্ষ > অচ্ছ; সেইরূপ মক্ষী > বাং মাছি। "ছারখার" শব্দের "ছার"এর "ক্ষ" "চ্ছ" এবং "খার"এর "ক্ষ" "ক্থ" হইয়াছে।

"স্থ" "ট্ঠ" হয়—অস্থি > অট্ঠি > আঁঠি।

সমীভবন দ্বারা যেমন কঠিন যুক্তবর্ণ সহজে উচ্চারিত হয়, স্বরভক্তি দ্বারাও সেই উদ্দেশ্য অন্য উপায়ে সাধিত হয়—"রত্ন" "ভগ্নী" পালিতে যথাক্রমে "রতন," "ভগিনী" হয়; বাংলাতেও। শ্রী > সিরী > গ্রাম্য বাংলা ছিরি, হর্ষ > হরিস > বাংলা পদ্যে হরিষ।

বিসমীকরণের (dissimilation) উদাহরণ দুই চারিটি মিলে—ললাট > নলাট; বাংলা পল্লী অঞ্চলেও এই উচ্চারণ। সেইরূপ পালি "নঙ্গল" = বাংলা নাঙ্গল। "চিকিৎসা" শব্দের পালি "তিকিচ্ছা," বাংলা গ্রাম্য উচ্চারণ ঐ।[৯]

৭। বাংলা "এলো" (-চুল) পালি "অল্ল" হইতে আগত হওয়া অসম্ভব নহে। কারণ, ভিজা চুলই ছড়ান থাকে। "অল্লবথ" (বস্ত্র), অল্ল কেস (°কেশ); সীসং নহাত্বা অল্ল কেস (মাথা ধুইয়া আর্দ্র কেশ) এই সব পদ দৃষ্ট হয়।

৮। কিন্তু "ন"এর সহিত যুক্ত অনুনাসিক পালির ন্যায় "ঞ্ঞ"হয় না—"কন্যা" "কন্যা"ই থাকে, "কঞ্ঞা" হয় না। সেইরূপ "জ্ঞ" বাংলাতে পালির ন্যায় "ঞ্ঞ"তে পরিণত হয় না—"প্রজ্ঞা" "পঞ্ঞা" হয় না। বাংলা "ঞ্জ" কচিৎ "ন্ন" হয়—ব্যঞ্জন > গ্রাম্য "ব্যন্নন"— তুঃ পালি "জ্ঞ" ও "ণ্য" দুই একটি শব্দে "ণ্ণ"এ পরিণত হয়—আজ্ঞা > অণ্ণা > আণা, পঞ্চদশ > পণ্ণরস > পনেরো। কথ্য বাংলায় "র্ য" যুক্ত বর্ণের সমীভবন হইয়া থাকে; পালিতে এরূপ স্থলে স্বরভক্তি হয়—যেমন আচার্য = আচরিয়। "শ্ন" বাংলায় "ঞ্হ" হয় না—"প্রশ্ন" "পঞ্হ" হয় না।

৯। তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, "পল্লী" শব্দ হইতে "পালি" শব্দের উৎপত্তি সমর্থনযোগ্য।

বর্ণবিপর্য্যাসেরও দুই একটি উদাহরণ দৃষ্ট হয়—"হ"এর সহিত যুক্ত বর্ণের স্থানপরিবর্ত্তন হয়; বাংলা উচ্চারণও একইরূপ—জিহ্বা > জিব্‌হা, আহ্বান > অব্‌হান; বাংলা উচ্চারণ "ব্‌হ"। যদিও পালিতে ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণ শব্দের বানান সংস্কৃতের ন্যায়, তথাপি মনে হয়, শব্দদ্বয় অনুরূপ শব্দের ("ম্‌হ"এর) ন্যায় উচ্চারিত হইত, যেমন বাংলায়।[১০] সেইরূপ মুহ্যমান > মুয্‌হমান—বাংলা উচ্চারণ (য = জ) "মুজ্‌ঝমান," গহ্বর > গব্ভর—বাংলায় একইরূপ উচ্চারণ।

পালি "গচ্ছি" (√গম্ লুঙ্) স্থানে "গঞ্ছি" রূপ দৃষ্ট হয়। বাংলা রূপকথায় ও ব্যঙ্গে পক্ষি-(পক্‌খি)রাজকে বলে পক্ষিরাজ; তুলনীয় হিন্দী "পাঙ্খা"; <পক্‌খ<পক্ষ, সেইরূপ চক্কা > ডঙ্কা।

"ভ" স্থানে ক্বচিৎ "হ" হয়—প্রভূত > পহুত > বহুত ("বহু"র সহিত সাদৃশ্যবশত উকার হ্রস্বীকৃত হইয়াছে।

শ, ষ, স কখনও কখনও "ছ" হয়—শাবক > ছাপ > ছা, ষড্ > ছ (পালি ও বাংলা), শ্রী > সিরী > বাংলা গ্রাম্য ছিরি, বিচ্ছিরি, শীর্ণ > বাং "ছিনে"।

পালিতে ক্বচিৎ "ধোবন"কে "ধোপন" বলে; তুলনীয় বাংলা "ধোপা"।

শব্দের অন্তস্থিত 'য'এর লোপ কয়েকটি শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন "অনুপাদায় আসবেহি" = অনুপাদা আসবেহি, "সযম্ অভিঞ্ঞায় সচ্ছিকত্বা" = "সযমভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্বা" ইত্যাদি; বাংলায়ও অনুরূপ বর্ণলোপের দুই একটি উদাহরণ মিলে—আমরা লিখি ব্যবসায়, বলি ব্যবসা।[১১]

* * * *

কতকগুলি দেশী শব্দ পালি ভাষার অন্তর্গত হইয়াছে, যাহার সন্ধান সংস্কৃতে মিলে না—টট্টিকা (টাট); আঢ়া; চাটি (চাটু); পাতি, পাতী—"সরা" অর্থে (পাতিল); পচ্ছি (পেছে, পেতে); মজ্জুর (গ্রাম্য "মাজুর," সহরে "মাদুর"); পেড়া (ঝাঁপি অর্থে) = পেড়া, পেটে, তুলনীয় পিটক, সং পেট; চঙ্গোটক, চঙ্গোবার (চাঙ্গারি)[১২]; পুটোলি, পোট্টলি, পোট্টলিকা (পুঁটলি), তুলনীয় পুট; পিল্লক—শূকর°—তুঃ (ছেলে)-পিলে, পোলা, কচবর (কাচরা), মঙ্গুস (mongoose, বেঁজি), কুড়—স্তূপ—পংসুকুড় (পাঁশকুড়)।[১৩]

* * * *

১০। পালি "ব্রহ্মা" শব্দের তৃতীয়া "ব্রহ্মুনা"—তুলনীয় বাংলা "বামুন"।

১১। বাংলা ভাষার অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃত হইতে আগত, কিন্তু স্থানে স্থানে অর্থবৈষম্য দৃষ্ট হয়। যদিও এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শব্দের রূপবিচার, তথাপি অর্থানৈক্যের দুই একটি উদাহরণ দিতেছি—"জুগুপ্‌সা" সংস্কৃতে "নিন্দা" অর্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাংলা ও পালিতে তৎভব "ঘৃণা" অর্থেও ব্যবহৃত হয়। পালি "দক্‌খিণা" শব্দ সচরাচর "দান" অর্থে ব্যবহার হয়; সংস্কৃত ও বাংলায় "দক্ষিণা" অর্থে পুরোহিতের প্রাপ্য বুঝায়। বাংলা ধাত = পালি ধাতু; ইহার একটি অর্থ "আশয়"—"নানা ধাতু" = "নানা আসয়"। বাংলায়ও "ধাত" শব্দের ঐরূপ অর্থ হয়।

১২। এই শব্দটির আলোচনা করিয়াছেন Johnson; J R A S. '31 দ্রষ্টব্য।

১৩। সুনীতিবাবুর Origin and development of the Bengali language, ৬৭ পৃ. দ্রষ্টব্য।

কতকগুলি অসংস্কৃত ধাতু পালি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয়— √পুথ্ —পোথেতি বা পোঠেতি—প্রহার করা। বাংলা "মেরে পুতে ফেলব" বাক্যে "পুতে" শব্দটি "প্রোথিত" (গর্তে নিহিত করা) অর্থে গৃহীত হয়। কিন্তু মারা ও পোথা একার্থবোধক শব্দ।

√কুট্ট=কোট্টেতি বা কোট্টেতি—ইহার অন্যতম অর্থ প্রহার করা বা মারিয়া ফেলা ("হন্তি")—"বধেন মারণেন বা কোট্টনেন"। "মেরে কুটে ফেলব" বাক্যের অর্থও "খুব প্রহার করিব বা একেবারে মেরে ফেলব"; টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা অর্থ নহে। √কুট ধাতু ছেদন অর্থেও পালিতে ব্যবহার আছে।

√কড্ঢ্ হইতে কাড়া শব্দের উৎপত্তি, √কৃষ্ হইতে নহে; √পুঞ্ছ্ হইতে "পোঁছা" শব্দের উৎপত্তি, যদিচ ইহা সং প্র+ √উঞ্ছ হইতে আগত মনে করা হয়; "অক্খীনি পুঞ্ছিত্বা"—চোখ মুছে, "পুঞ্ছিত্বা" রূপও পাওয়া যায়। √দিক্খ ধাতু হইতে দেখা—"দক্খতি"— √দৃশ্ ধাতু হইতে নহে। √অচ্ছ্ ধাতু হইতে বাংলা "আছে"; √আস্ বা √অস্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করা ঠিক নহে। √বিন্ ধাতু হইতে "বিনাতি" (="সং সিব্যতি")—"বিনিত্বা কতং" বিনাইয়া করা। বাংলা "বিনান," "বিনুনি" ইত্যাদি শব্দ এই ধাতুনিষ্পন্ন। √ফাড্=ফাড়া, ফাটা—কট্ঠং ফাড়েতি=কাঠ ফাড়া। √হু (সং √ভূ)=হওয়া। √তিম্=ভিজা, তিম্ব—বাংলা পদ্যে "তিতা"। √নিড্ড্=নিড়ান—"নিদ্দায়িতব্ব," "নিদ্দেহি" বা "নিড্ডেহি" (তিণানি—তৃণানি); "নিস্তৃণ" হইতে ইহার ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত। সং ধ্বংস্ <* ধস <ধংস (যেমন "লোমহর্ষণ" হইতে পালি "লোমহংস"; বাংলা "ধামসানো" শব্দ এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

* * * *

অনেক বাংলা শব্দের ব্যুৎপত্তি পালি হইতে নির্ধারণ করা সহজ, এবং অভিধানে তাহার উল্লেখ থাকা বিধেয়।[১৪]

হেঁট, হাঁটু, হেঁটো <হেট্ঠা <সং অধস্তাৎ ('অ' ও অন্ত্য ব্যঞ্জনের লোপ, "ধ"এর "হ"এ ও "স্ত"এর "ট্ঠ"এ পরিবর্তন হইয়াছে। শব্দটি "অবহিত্থ" হইতে নিষ্পন্ন নহে।

পাচন (-বাড়ি) —পালি পাচন, √অজ্ নিষ্পন্ন—জকার চকারে পরিবর্তিত হইয়াছে।

ঝামা <ঝাম— √ঝা=পোড়া; তুঃ ঝাম্প, ঝুনো। একজন লেখকের মতে "ঝন্ঝনিয়া" শব্দ হইতে "ঝুনা" আসিয়াছে।

লাঠি লট্ঠি।

ভাঁব (কলিকাতা অঞ্চলে প্রচলিত) অম্ব। অভিধানে এ শব্দটি নাই।

অম্বল <অম্বিল। সংস্কৃত "অম্ল" শব্দে বকার নাই; সেইরূপ তাঁবা <তম্ব <তাম্র।

দহ, দ, দক (শেষোক্ত শব্দের উল্লেখ অভিধানে নাই। <দহ <* হদ <হ্রদ। দোহারা

১৪। কতকগুলি পালি শব্দ হুবহু বাংলায় স্থান পাইয়াছে, যেমন ঘর, বাহির, রক্তকম্বল (পালি—রত্তকম্বল, পুপ্ফবি:), বারিত্র <বারিত্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খ <পোংখানুপোংখ ইত্যাদি।

<দহর। "দহর" (বৈদিক দহ্র) = ছোট, তরুণ। পালি দহর পক্‌খী, দহরী কুমারী। দোহারা শব্দটি "দহর" হইতে কিংবা "দুই হরা" হইতে নিষ্পন্ন, সুধীগণ বিচার করিবেন। মনে হয়, যেন "দহর"এর "দ," "দো"কে "দুই" অর্থে ধরিয়া "একহারা"র সৃষ্টি হইয়াছে।

কসটে<কসট<সং সকট (তিক্ত) বর্ণবিপর্যয়; "কষায়" শব্দের সহিত গোল বাঁধিয়া "তাঁবাটে," "পাগলাটে" প্রভৃতি বিশেষণ-পদের অনুকরণে নিষ্পন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহার পৈশাচী রূপও 'কসট'—"কষ্ট" শব্দ হইতেও ব্যুৎপত্তি ধরা হয়।

গেরুয়া<গেরুক গৈরিক।

উপোস উপোসথ V উপবসথ।

খিল<খীল কীল।

সুঠাম<সুসণ্ঠান<°সংস্থান।

পাড়<পাড়ি, পালি।

বাট<বটুম<বর্ত্মন্।

বোঁটা, বাঁট<বণ্ট<বৃন্ত।

ননী<নোনীত<নবনীত। "নোনী" বানান হইলেই অশুদ্ধ হয় না।

লাউ<লাবু<অলাবু।

বাকল<বাক<বল্কল।

ঘুঁটি<ঘটিকা<গুটিকা।

নেলা (-ক্ষেপা)<পালি "লাল" = স্থূলবুদ্ধি (লালু উদাসী)।

লোনা<লোণ<লবণ।

সোনা<সোণ্ণ<স্বর্ণ।

নাটা (হিন্দী)<লকুণ্টক।

আঠার<অট্ঠারস।

ভূষি<ভুস<বুষ।

থাম<থম্ভ<স্তম্ভ।

পেথম<পেখুম।

শেজ<সেয্যা<শয্যা।

ওলন<ওলম্বন<অবলম্বন।

ত্রিপল<তিপ্পল (তিনপাট)।

যত, তত, কত, এত<(যথানুক্রমে) যত্তক, তত্তক, কিত্তক, এত্তক।

বাঁঝা<বঞ্ঝা; সেইরূপ সাঁঝ<সঞ্ঝা। অনুনাসিকের সহিত স্পর্শবর্ণ থাকিলে এইরূপ বিকৃতি হয়—তুঃ সাঁড়াশি<সণ্ডাস, কুঁড়া<কুণ্ড, পাঁতি<পন্তি<পঙ্‌ক্তি।

পালকি<পাটঙ্কী। সংস্কৃত পল্যঙ্কিকা।

মেদা<পালি মিদ্ধ = জড়তা। ইহার সহিত "মেদ" চর্বি জড়িত হইয়াছে।

থুথ্‌ড়ে, থুথ্‌ড়ী < থের, থেরী < স্থবির, স্থবিরা।

দাঁড় (কাক) < ধ্বঙ্ক < সং ধ্বাংক্ষ; দণ্ড শব্দের সহিত সাদৃশ্যবশতঃ "দাঁড়"এ দাঁড়াইয়াছে।

না < নাবা < নৌ।

ছকা, ছক < ছক্ক < ষট্‌ক।

নাওয়া < √স্না < স্না।

দু-(আনি) < দুঃ "দু"পট্ট (দোপাট্টা), "দু"বিধ।

কণা < কণ (কুঁড়া; "খুদ" অর্থ নহে)—খুদ কণা = খুদকুঁড়া।

বিশ < বীস < বিংশ।

হে দে < হন্দ < সং "হন্ত"।

গাভী < গাবী < গবী।

পুঁটকে < পোতক; অশোকানুশাসন, শিলা ৯ "পুতিক"।

ধাঁধা < দন্ধ (মন্থর)। "চলন্তিকা"মতে "ধন্দ"শব্দনিষ্পন্ন।

হেথা < এথ < অত্র।

পাউস (গ্রাম্য < পাবুস < প্রাবৃষ্‌।

শিমুল < সিম্বলি (বৈদিক "শিম্বল") সংস্কৃত শাল্মলী।

কিসে < কিস্‌স—"কিস্‌স পন মে ত্বং অম্ভো পুরিস ভবিস্সং নেসি ?= কিসের জন্য, ওহে মানুষ, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছ ?

বেল < বেলুব < বিল্ব।

তুমি < পদ্যে তুবং।

(হিম-) সিম < সীন < শীন = জমিয়া যাওয়া—'সিম' শব্দটি প্রতিধ্বনিসূচক নহে। রেখে, ঢেকে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের অনুরূপ অভিশ্রুতি পালি দুই একটি শব্দে দেখিতে পাওয়া যায়—"পাটিহারিয় বা পাটিহের," "অচ্ছরিয় বা অচ্ছের"।

"অপর্য্যাপ্ত" শব্দটি অত্যধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়—এইরূপ অর্থে পালিতে শব্দটির প্রয়োগ আছে—"অপরিযত্তি (অপর্য্যাপ্তি)-কর" শব্দের অর্থ "অতিতিত্তিকর" (অতিতৃপ্তিকর)। অতএব, "অ" বা "অন্" শব্দের অন্য এক অর্থ "অতি"। এই শ্রেণীর শব্দ "অনুত্তম," "অনাবৃষ্টি," অনাসৃষ্টি।[১৫] বাংলায় অকার কচিৎ দীর্ঘ হইয়াছে; পালি "অনভাব"(= অবড্‌ঢি—অবৃদ্ধি), অনচ্ছরিয় = অত্যন্ত আশ্চর্য—ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষের মতে এই শব্দটি অনু + অচ্ছরিয় হইতে নিষ্পন্ন; তাহা মোটেই নহে। "অনমতগ্গ"—যাহার অগ্র অজ্ঞাত—শব্দটি সংসারের বিশেষণ, সংসার—যাহার আদি অবিদিত। এই শব্দের ব্যাখ্যা নানা জনে নানা প্রকার করিয়াছেন, যথা—অনু + অমতগ্গ; অন্ + অমত; অ + নমৎ; অন্ + আমত (°মৃত)

১৫। যোগেন্দ্রবাবুর বাংলা শব্দকোষ দ্রষ্টব্য।

ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু "অন্" এখানে অভাবাত্মক পদ নহে ; দুই "না" মিলিয়া এক "হাঁ"— তাহাও নহে ; "অন্" বা "অ" এ স্থলে অত্যন্তার্থে ব্যবহৃত ; অর্থাৎ যাহা একেবারে অজ্ঞাত। তুলনীয় এডমূক = অনেডমূক।

শ্রীঈশান ঘোষ-কৃত জাতকের অনুবাদের উপক্রমণিকায় (১৷৵০ পৃঃ) কতকগুলি বাংলা শব্দের পালি ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। ঐ তালিকাভুক্ত "জুজু" শব্দের ব্যুৎপত্তি সঠিক হইলে উহা কোনও ফারসি শব্দের বিকৃতি হইতে পারে না, এবং উ "ঊ" হইবে ; কারণ, মূল নামের বানান "জূজক"। "ছন্দ" শব্দ হইতে চাঁদা, সেইরূপ "চাঁদা" শব্দেরও উৎপত্তি হইয়াছে— যাহা ইচ্ছা করিয়া লওয়া হয় ; ইহার আভিধানিক ব্যুৎপত্তি কিন্তু √ছাদ (বণ্টন) হইতে ধরা হয়।

* * *

পালি ইডিয়ম সংস্কৃত হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাক্য-বিন্যাসের অনেকগুলি প্রাকৃত সাহিত্যে ধরা পড়িয়াছে ; অপাংক্তেয় বলিয়া আভিজাত্যপূর্ণ সংস্কৃত সাহিত্যে তাহাদের স্থান হয় নাই।

ভাত বাড়ছে < ভত্তং বড্ঢেতি ; সেইরূপ "কুম্ভং বড্ঢেতি" ; "ভাত বাড়াইতেছে" হওয়া উচিত, যেমন "গাড়ি বাড়াও"। শব্দটি "বণ্টন" হইতে আসে নাই ; "বণ্টন"এর অর্থ ভিন্ন।

এঁড়ে কথা < অণ্ডক বাচা—"স-দোসবাচা" দোষযুক্ত কথা (জাতক নং ৩৮২)।

নরকে পচিতেছে < নিরয়ে পচ্চতি (ণিজন্ত)।

ওহে, আমি আসি < আযামি, আবুসো।

সূতা কাটিতেছে < সুত্তং কত্তেতি। সংস্কৃত √কৃৎ।

রাজ্য দুই ভাগ করিয়া < রজ্জং দ্বে ভাগে কত্বা।

একটি দেবতাকে জরাজর্জ্জর করিয়া দেখাইয়াছিলেন < একং দেবপুত্তং জরাজজ্জরং কত্বা দস্সেসুং।

হাত করে < হত্থগতং কত্বা।

দেরী করিতেছে < চিরং করোতি।

প্রস্রাব করিতেছে < পস্সাবং করোতি।

সঙ্কেত করিতেছে > সঞ্ঞং করোতি।

কলহ করিতেছে < কলহং করোতি।[১৩]

হাতে ক'রে পরখ করা < হত্থে করিত্বা পচ্চবেক্খেয্য।

প্রশংসা করিতে করিতে বলিয়াছিল < থুতিং কত্বা কত্বা কথেসি।

শত সহস্র করে (দিনে দিনে দান করেন) < সতসহস্সং কত্বা।

চার চার করে হাজার ঘা < চতুক্কে চতুক্কে পহারসহস্সং।

১৩। কৃ ধাতুর এইরূপ প্রয়োগ সংস্কৃতেও অপরিচিত দেখা যায়।

রূপ যেন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে<যাতা ছিজ্জিত্ব ছিজ্জিত্বা পতন্তি বিয়।

রথ তালবন কাটিতে কাটিতে (চলিল)<রথো তালবনং ছিজ্জিত্বা ছিজ্জিত্বা।

ঠেস দিয়া দিয়া কথা বলিল<আসজ্জ আসজ্জ অবচাসি; সেইরূপ "উপনেয্য উপনেয্য অবোচ"।

এই এই কর<ইদঞ্চ ইদঞ্চ করোথ।

তোমায় আমি বার বার জিজ্ঞাসা করেও<তং অহং পুচ্ছন্তো পুচ্ছন্তো।

সংক্ষেপ করিয়া করিয়া<সংখিপিত্বা সংখিপিত্বা।

সময় কাটিতে লাগিল<গচ্ছন্তে গচ্ছন্তে কালে।

তোমরা গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করিয়া নিদ্রা দাও<তুম্হে গহপতিকেন দিন্নং ভুঞ্জিত্বা ভুঞ্জিত্বা সুপথ।

এই প্রকারের নিরন্তরতাপ্রকাশক দ্বিরুক্ত শব্দ অনেক পাওয়া যায়।

খান্ খান্ (টুকরো টুকরো) হয়ে ভেঙে গেল<খণ্ডং খণ্ডং ভিজ্জিংসু।

সাক্ষ্য দেওয়া<তুলঃ সক্খি করোতি—ইহার সংস্কৃত করা হইয়াছে, "সাক্ষাৎ করোতি," কিন্তু বাংলা ইডিয়ম "গা করে না" ইত্যাকার বাক্যের সহিত "সক্খি করোতি"। স+অক্খি—"সাক্ষি করা" বা "সাক্ষি দেওয়া" বলিয়া যায়।

জলজীয়ন্ত বেঁচে আছে<জলমানো জীবতি।

হাতের পাশে<হত্থ পস্সে।

আলাপ সালাপ<অল্লাপ সল্লাপ।

আঁকু পাঁকু<অকুল, পকুল।

কাঠের আগুন, খড়ের আগুন, ঘুঁটের আগুন, তুষের আগুন<কট্ঠগ্গি, তিণগ্গি, গোময়গ্গি, থুসগ্গি।

সে আমার অনেক করেছে<বহুকারো সো।

কাজ কি, কাজ নেই<কিচ্চং নত্থি, কম্মং নত্থি।

হেলাখেলা<হীড়িত খীড়িত।

পড়িয়া গেল<পতিত্বা গতং।[১৭]

মৃত্যু লইয়া যায়<মচ্চু আদায় গচ্ছতি।

যবাগু পাক করিয়া দিয়াছিল<যাগুং পচিত্বা অদাসি।

কাজ করিয়া দিয়াছিল<সম্পাদেত্বা অদংসু।

লিখিয়া রাখে<লিখিত্বা ঠপেন্তি।[১৭]

আসিতে দিবে না<আগন্তুং ন দস্সন্তি।

১৭। এই প্রকার ইডিয়ম হিন্দী কেন, বর্মাভাষায়ও বহু পাওয়া যায়—"চা ত্বা" পড়িয়া যাওয়া, "যে ত্বা" ভুলিয়া যাওয়া, "পে ঠা" দিয়ে রাখা, "পেহ্ ঠা" ভেজিয়ে রাখা, "তে পিট্" মেরে ফেলা।

সন্ন্যাসী হইতে দিই নাই < পব্বজিতুং নাদাসিং।

দাড়ি ছাঁটা < মস্সুং কপ্পেতি।

চুলচেরা < বালবেধী।

সুদখোর < লঞ্চখাদক।

খড়কে খাওয়া < তুলঃ দন্তকট্ঠং খাদতি (দাঁতন খাওয়া)।

এদের ঠকিয়ে খা'ব < ইমে বঞ্চেত্বা খাদিস্সামি।

দেবতা বর্ষায় < দেবো বস্সতি। তুলঃ "দেবতা ডাকছেন"।

ধারা বর্ষণ < ধারা পবস্সেয্য।

রাখা ঢাকা < রক্খাবরণ = রক্খা + আবরণ।

ঋণ শোধ করা < ইণং সোধেতি।

ক'ষে মালকোচা মেরে < গাঢ়ং কচ্ছং বন্ধিত্বা। তুলঃ "কোমর বেঁধে"।

বড় অসুস্থ < বাঢ় গিলান।

বেলাবেলি < দিবা দিবস্স।

বেলা ক'রে উঠা < দিবা বুট্ঠাতি।

অসুখ থেকে উঠা < গিলানা বুট্ঠিত।

পর্ণগ্রাহী < পণ্ণগ্গাহী।

রাগে টর্ টর্ করা < রোসেন তটতটায়তি।

সখী তিন জন < সখিনো তীণি জনিও।

পাঁচ জনের সঙ্গে < পঞ্চন্নং সদ্ধিং।

গান বাঁধা, ছড়া বাঁধা < তুলঃ গাথং বন্ধাপেত্বা, বণ্ণং বন্ধাপেত্বা।

যখন চ'লে ফিরে বেড়াতে পারে < আধাবিত্বা পরিধাবিত্বা বিচরণকালে।

আজ থেকে < অজ্জতগ্গে (অন্ততঃ অগ্রে)।[১৮]

বুক চাপড়ান < উরত্তালি।

গ্রাসাচ্ছাদন < ঘাসচ্ছাদন।

তার পায়ের ধূলার যোগ্য নয় < পাদরজং ন অগ্ঘতি।

দেবদত্ত চিকিৎসার বাহিরে < দেবদত্তো অতেকিচ্ছো।

আপনারা থামুন < তিট্ঠথ তুম্হে, অম্বট্ঠো মাণবো ময়া সদ্ধিং মন্তেতু (যুবক অম্বষ্ঠ আমার সঙ্গে বিচার করুক)। তুলঃ ইদানি ব্রহ্মা তাব তিট্ঠতু—এখন ব্রহ্মা তা'লে থাকুন, তিট্ঠতু ভবং গোতমো, আপনি দাঁড়ান, গৌতম।

এখন তাঁহার ধর্মকথা শুনিতে পাইব < ইদানস্স ধম্মং সোতুং লভিস্সামি।

১৮। "'আজ থেকে' শব্দের সঙ্গে ধ্বনি ও অর্থের মিল আছে জানিলে পণ্ডিতদের কাছে এ ইঙ্গিত গ্রাহ্য হবে কি না..."—শ্রীরবীন্দ্রনাথ—বাংলা ভাষাপরিচয়, ১৪৬ পৃঃ।

নিজেরই আসিতে হইবে<অত্তনো ব আগন্তব্বং।

কিন্তু কে তার সঙ্গে মামলা করবে<কো পন তেন সদ্ধিং অট্টং করিস্সতি।

তাঁর দেখা পাওয়া ভার<(বিহারং গন্ত্বা) দট্ঠব্বং নাম ভারো।

যেমন কি<যথা কিং।

এই যে পূজা বন্দনা<যা অয়ং বন্দনপূজনা।

সেই ব্যক্তি যে<যো সো পুরিসো।

এ ধর্ম নয় যে, আমি তোমায় ত্যাগ করিতে পারি<ন সো ধম্মো যং তং জহে।

কি করিবে সেই কামুকের বিবিক্তিসেবা ?< কিং করিস্সতি তস্স বিবেকতা কামগুণগিদ্ধস্স ?

কাল যাবেন এখন<যস্স' দানি ভবং উপসংকমিস্সতি।

এই এক সময়ে, মশাই<একং ইদাহং (ইদং+অহং), ভন্তে, সময়ং।

তুমি এটা কি মনে কর ?<তং কিং মঞ্ঞসি ?

এ কি তুমি শুনেছ ?<কিন্তি তে সুতং ?

রাজা যা (খুশি) তা করুন<রাজা যং বা তং বা করোতু।

যা হবার হোক<যং হোতু তং হোতু।

যা ইচ্ছা, তাই বলছে<ইচ্ছিত ইচ্ছিতং কথেতি।

ওহে, তুমি যে আত্মার কথা বলছ, তা আছে, তা নেই যে তা বলি না<অথি চ খো সো ভো অত্তা যং ত্বং বদেসি, নে' সো নথীতি বদামি।

অতীতে তুমি ছিলে, না ছিলে না ?<অহোসি ত্বং অতীতং অদ্ধানং, ন ত্বং নাহোসি ? এখানে একটি "ন" জিজ্ঞাসার্থক ("এথ একো নকারো পুচ্ছনথো হোতি"।) তুমি তবে আছ, না তুমি নেই ?<অথি ত্বং এতরহি ন ত্বং নথি ?

প্রথম ব্যক্তিও দেখিতে পায় না, দ্বিতীয় ব্যক্তিও দেখিতে পায় না, শেষ ব্যক্তিও দেখিতে পায় না<পুরিমোপি ন পস্সতি, মজ্ঝিমোপি ন পস্সতি, পচ্ছিমোপি ন পস্সতি। প্রত্যেক শব্দের পরে "ও"এর ব্যবহার, যেমন তুমিও ছোট ছিলে, ওও ছোট ছিল। "ভগবা পি অসীতিকো, অহম্পি অসীতিকো" = ভগবান্ বুদ্ধেরও আশী বৎসর বয়স, আমারও।

সমানে বৃষ্টি পড়ছে, সমানে দাঁড়িয়ে ভিজছে—ধনিয়সুত্তে "সমানবাস" শব্দের অর্থ করা হয়, সমান ব্যক্তির সহিত বসবাস, কিন্তু বাংলা অনুযায়ী ইহার অর্থ "বহুকাল ধরিয়া" বাস সঙ্গত মনে হয়। কারণ, "সমানবাস"এর সহিত পরবর্তী শ্লোকের "এক রাত্রি বাস"এর তুলনা করা হইয়াছে, এবং ধনিয়সুত্তে সর্বত্র গৃহী ও সন্ন্যাসী জীবনের তুলনা করা হইয়াছে।

"টাকার কুমীর" প্রবাদটির ব্যুৎপত্তি করা হয়—কুবের ও কুম্ভীর, এই শব্দদ্বয়ের সংমিশ্রণ হইতে।[১১] কিন্তু "সে টাকার কুবের" এরূপ বাক্য অপেক্ষা "সে কুবের" এইরূপই ব্যবহার

১১। শ্রীসুকুমার সেনের "ভাষার ইতিবৃত্ত," ৮৪ পৃ. দ্রষ্টব্য।

হয়। সুমঙ্গলবিলাসিনী নামক পালি ভাষ্যগ্রন্থে কুম্ভীর নামে রাজগৃহবাসী জনৈক যক্ষরাজের উল্লেখ আছে। তিনি শত সহস্র যক্ষের অধিপতি ছিলেন। "রাজগহ নগরে নিব্বত্তো কুম্ভিরো নাম যক্‌খো" (৬৮৬ পৃ.)। কথায় বলে "যখের ধন"। এখন জন্তু কুম্ভীর, না যক্ষ কুম্ভীরের সহিত গোল বাধিল, তাহাই বিবেচ্য।

কতকগুলি ধ্বন্যাত্মক, দৃশ্যাত্মক ও ভাবাত্মক শব্দ বাংলার নিজস্ব সম্পদ্‌রূপে পরিগণিত হয়। পালিতে অনুরূপ শব্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়—ভর ভর, সর সর, সস্‌সর (কাঁচা চামড়ার শব্দ), চিচ্চিটায়তি, চিটিচিটিয়ায়তি (উত্তপ্ত লৌহে জল ছিটাইলে), গড়গড়ায়তি (আকাশ), বিড়িবিড়িকা (বিড়বিড় করিয়া বকা—থেরগাথা, ১১৯), তিণতিণায়তি (বেদনাত্মক), তটতটায়তি (রাগে)।

* * * *

ব্যাকরণেও প্রাকৃতের প্রভাব বিলক্ষণ বিদ্যমান। প্রাকৃত ব্যাকরণের নিয়মাবলী সংস্কৃতের ন্যায় কঠোর নহে। শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন এইরূপ সন্ধি সংস্কৃত অনুযায়ী না হইয়া পালি নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। "এক" শব্দ যোগে বাংলাতে আমরা "ক্ষণেক," "বারেক," "শতেক," "তিলেক" ইত্যাদি সন্ধিবদ্ধ পদ পাই—ইহাও পালি সূত্রানুযায়ী। প্রাকৃতে যেরূপ, বাংলায়ও তদ্রূপ সন্ধির নিয়মের বাঁধাবাঁধি নাই। পালি "হথি আদি" বা "আযস্মা আনন্দ" শব্দদ্বয়ে সন্ধি হয় নাই, বাংলায় সেইরূপ হিত উপদেশ (ও হিতোপদেশ), পরম আনন্দ (ও পরমানন্দ), উপরি উক্ত বা উপর্যুক্ত ইত্যাদি দুই প্রকার ব্যবহারই দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলায় অশুদ্ধ সন্ধিবদ্ধ পদ—দুরাদৃষ্ট, যদ্যাপি ইত্যাদির সহিত পালি সো + অহং = স্বাহং, খো + অহং = খ্বাহং তুলনীয়। পালি সন্ধিবিশেষে পদদ্বয়ের মধ্যে একটি ব্যঞ্জনের আগম হয়—যথা, ইতো + আয়াতি = ইতো—ন্—আয়াতি; সেইরূপ বাংলা কুল—ন্—পাড়; পালি অঞ্ঞ + অঞ্ঞস্‌স = অঞ্ঞমঞ্ঞস্‌স, বাংলা খোলাম্‌ কুচি।

সমাসের নিয়মও প্রাকৃত ভাষায় শিথিল। সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে দাসিপুত্র, সুন্দরিগণ প্রভৃতি পদ অশুদ্ধ, কিন্তু পালিতে দাসিদাস, নদিতীর ইত্যাদি সমাসবদ্ধ পদ শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং প্রাকৃত নিয়মানুসারে কালিদাস, দেবিদাস শুদ্ধ সমস্তপদ। "শারীপুত্র" পদ পালিতে "সারিপুত্ত" হয় বলিয়া সংস্কৃতেও চালু হইয়া গিয়াছে। কবিকল্পনায় শুকের স্ত্রী শারী।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে নিরহঙ্কারী, কলহশীলা ইত্যাকার পদ অশুদ্ধ; পালিতে কিন্তু আমরা নিদ্দাসীলী (°শীলী), সভাসীলী, সত্তপন্নী (সপ্তপর্ণী) প্রভৃতি পদের ব্যবহার পাই। নির্দোষী ইত্যাদি পদ সংস্কৃতে অশুদ্ধ, কিন্তু পালিতে নিক্কামী (নিক্কামিন্) পদ পাওয়া যায়। অতএব বহুরূপী ইত্যাদি পদ মোটেই অশুদ্ধ নহে।

বাংলায় "ইচ্ছিত," "স্পর্শিত" প্রভৃতি 'ক্ত'প্রত্যয়যুক্ত শব্দ ব্যাকরণসম্মত নহে, কিন্তু পালিতে "ইচ্ছিত," "ফস্‌সিত," উব্বিলিত (উদ্বেলিত) প্রভৃতি শব্দ শুদ্ধ—পাশাপাশি তদ্ভব

ইট্‌ঠ (ইষ্ট) ও ফুট্‌ঠ (স্পৃষ্ট) শব্দের ব্যবহার আছে, যদিও ইট্‌ঠ ও ইচ্ছিত, ফুট্‌ঠ ও ফস্‌সিত শব্দদ্বয়ের অর্থের তারতম্য আছে। পালিতে "ক্ত" ইত্যাদি প্রত্যয় ধাতুর উত্তর প্রয়োগ করিতে হইবে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নাই—বপিত (√বপ্), বুসিত (√বস্), ইত্যাদি অনেক পদ পালিতে ব্যবহৃত হয়।

মৃগিণী, সিংহিণী সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে অশুদ্ধ, কিন্তু পালিতে মিগিণী, সীহিণী প্রভৃতি পদ পাওয়া যায়। "রজকিনী" যদি চালু হয়, মৃগিণী, বাঘিনী, কুরঙ্গিণী, বিহঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী, চাতকিনী প্রভৃতি অশুদ্ধ বলা গোঁড়ামি ছাড়া কিছু নহে। "অশুদ্ধ কিন্তু সুপ্রচলিত", অভিধানের এইরূপ শব্দবিভাগ উঠাইয়া দেওয়া উচিত। বাংলা পেত্নী শব্দ পেতিনী (তুলঃ পালি "মিগিনী") শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন, "প্রেতী" শব্দ হইতে হয় নাই।

"উচ্ছন্ন' শব্দটি অশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হয়। পালিতে বহুশঃ "ৎস" "চ্ছ"এ পরিণত হয়—মৎস্য > মচ্ছ, বৎস > বচ্ছ (বাচ্চা), কুৎসিত > কুচ্ছিত—বাংলায়ও কুচ্ছিত, মহোচ্ছব প্রভৃতি শব্দ কথিত হয়। পালিতে কিন্তু উৎসন্ন = উস্‌সন্ন।

মহারাজা পদ সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত নহে। পালিতে শুদ্ধোদন মহারাজা পদ শুদ্ধ।

পালি শব্দরূপে মহৎ শব্দের প্রথমার একবচনে "মহা" হয়, সেই হেতু সমস্ত পদ ছাড়াও বিশেষণরূপে "মহা" ব্যবহৃত হয়, যেমন "মহা হি এসো সমাগমো," সেইরূপ বাংলায় "মহা আদর," "মহা মুস্কিল।"

বাংলায় যেমন "ঈ" প্রত্যয় ভক্তিসূচক, যথা—শ্রীদুর্গার আগমনী, পালিতে সেইরূপ "বেরমণী" ইত্যাদি পদ দৃষ্ট হয়—"পাণাতিপাতা বেরমণী" (প্রাণিহত্যা হইতে বিরতি)। "ইন্" প্রত্যয়ান্ত শব্দে পালিতে কখনও কখনও 'ঈ'কারের পরিবর্ত্তে 'ই' ব্যবহার হয়, যেমন সেট্‌ঠি (শ্রেষ্ঠী); বাংলায়ও "হাতি" ইত্যাদি শব্দে 'ই'কারও ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতে যেখানে বিধিলিঙের ব্যবহার হয়, পালি ও বাংলায় সে স্থলে ভবিষ্যৎকালের প্রয়োগ প্রায়ই দেখা যায়, যথা, "তা হবে" = পালি "ভবিস্‌সতি" = সং "ভবেৎ"।

কথ্য বাংলায় অন্ত্য স্বরের উকারে পরিবর্ত্তন আদরসূচক—রামু, হাবু ইত্যাদি; পালিতে উকার সম্মানজ্ঞাপক—সব্বঞ্‌ঞু (সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ), বিঞ্‌ঞু (বিজ্ঞ), পারগূ (পারগ), বেদগূ (বেদজ্ঞ)। বাংলায় উকার কিন্তু নিন্দাবাচক যেমন বিচ্ছু, ছেচো।

পরিশেষে বক্তব্য, সংস্কৃত মতে শুদ্ধ না হইলেই বাংলা পদ বা ইডিয়ম্ অশুদ্ধ হয় না। আর কত কাল আমরা সংস্কৃতের শৃঙ্খল ধারণ করিয়া চলিব ?

পঞ্চম বেদসার নির্ণয়

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাংলা দেশে অগণিত তন্ত্রনিবন্ধ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে বাংলার তন্ত্রসাধনার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। তবে ইহাদের অল্প কয়েকখানি মাত্রই আজ সুপরিচিত।[১] অবহুপরিচিত অনেকগুলি গ্রন্থের কথা বিভিন্ন পুথিশালার বিবরণের মধ্যে ছড়ান রহিয়াছে।[২] যাহাদের কোন বিবরণ বা আলোচনা এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই, এ জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যাও নিতান্ত কম বলিয়া মনে হয় না। এইরূপ একখানি গ্রন্থের[৩] পরিচয় আমি কিছু দিন পূর্বে এই পত্রিকায় দিয়াছি। বর্তমানে আর একখানির পরিচয় দিতেছি।

আলোচ্য গ্রন্থখানির নাম—পঞ্চমবেদসার নির্ণয়। রচয়িতার নাম—হরগোবিন্দ রায়। ইহা একখানি বিরাট্ গ্রন্থ—ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার রচনাকাল খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষার্ধ। গ্রন্থকারের প্রপৌত্র রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের যে পুথি দেখিয়াছি, তাহাতে পুথির লিপিকাল ও অনেক স্থলে গ্রন্থের রচনাকাল উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের দুইখানি পূর্ণাঙ্গ পুথি ও একখানি পুথির খণ্ডিত শেষ পত্রে ইহার রচনাকাল ১৭০১ শকাব্দ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, বিভিন্ন পুথিতে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পৃথক্ পৃথক্।[৪] একখানি পুথির লেখক রামচন্দ্র,[৫] আর একখানির সর্বেশ্বর। সর্বেশ্বরের লিখিত পুথির লিপিকাল—১৭৪৫ শকাব্দ।[৬]

দ্বিতীয় খণ্ডের দুইখানি পুথির মধ্যে একখানি খণ্ডিত। সম্পূর্ণ পুথিতে লিপিকরের

১। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসার, ব্রহ্মানন্দের শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও তারারহস্য, পূর্ণানন্দের শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি ও শ্যামারহস্য, প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রাণতোষণী ইত্যাদি।

২। কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের শ্যামাসপর্যাবিধি, কৃষ্ণমোহনের আগমচন্দ্রিকা, যদুনাথ চক্রবর্তীর মন্ত্ররত্নাকর, রঘুনাথ তর্কবাগীশের আগমতত্ত্ববিলাস, রঘুনাথ আগমাচার্যের সুন্দরীরহস্যবৃত্তি, রামগোপাল শর্মার তন্ত্রদীপনী, শঙ্কর আগমাচার্যের তারারহস্যবৃত্তিকা, চন্দ্রশেখরের পুরশ্চরণচন্দ্রিকা ও কুলপূজনচন্দ্রিকা, জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারীর তত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি।

৩। অমর মৈত্রের জ্ঞানদীপিকা (সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৫৮ খণ্ড, পৃ. ৪০-১)।

৪। শাকে ভূমিবিধাতৃবক্ত্রমুনিভূমানে গতে হায়নে চৈত্রে মাসি পলাশধামবিলসৎশ্রীহট্টদেশেহতুলে।
যোগিবান্তনিতান্ততোষণকরং জ্ঞানৈকমোক্ষপ্রদং বিদ্বন্মোদনসৃষ্টিকাণ্ডকথিতং তন্ত্রং সমাপ্তিং গতম্ ॥
শাকে ভূবেদভূভৃদ্ভূমিতে শরদি চৈত্রকে। সৃষ্টিকাণ্ডং পলাশে তু শ্রীহট্টীয়ে সমাপিতম্ ॥
শাকে গোবেদস্রাতৃচ্চন্দ্রমা পরিমাণকে। সমাপ্তং সৃষ্টিকাণ্ডঞ্চ শ্রীমদীশপ্রসাদতঃ ॥

৫। লিখিতং পুস্তকং চেদং রামচন্দ্রদ্বিজাতিনা। শ্রীমতো হরগোবিন্দ রায়ধীরস্য হেতুনা।

৬। শাকে শৈবাস্তবেধোমুখমুনিরজনিনাথসংগণ্যবর্ষে পুস্তীং রম্যাং লিলেখাবনিবিবুধ ইমাং শ্রীলসর্ব্বেশ্বরাখ্যঃ।

নাম রামচন্দ্র ও লিপিকাল বা রচনাকাল ১৭৪ শকাব্দের উল্লেখ আছে[৭]। ইহার কাগজ কলে প্রস্তুত—ইহা হাতে তৈয়ারি কাগজে লেখা খণ্ডিত পুথির নকল হইতে পারে।

তৃতীয় খণ্ডের পুথিখানির কিছু অংশ প্রাচীন ও কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত নবীন। একখানি পাতার লেখা কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আরম্ভ অন্তরূপ। ইহা গ্রন্থকারের মুগাবিদার নিদর্শন হইতে পারে। পুথির শেষে রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি অংশতঃ ত্রুটিত[৮]—পাতার উপরের দিকে অন্য শ্লোকে[৯] রচনাকাল (১৭৪৩) ও লিপিকরের নাম (রতিকান্ত) উল্লিখিত হইয়াছে। একই বিষয় এই ভাবে দুই রকমে নির্দেশ করিবার কারণ বুঝা যায় না।

চতুর্থ খণ্ডের রচনাকাল ১৭৪৪ (?) শকাব্দ—পুথির লিপিকর রামচন্দ্র।[১০] পঞ্চম খণ্ডের রচনাকাল উল্লিখিত হয় নাই। ইহার পুথি ১৭৪৫ শকাব্দে সর্বেশ্বর কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল।[১১] ষষ্ঠ খণ্ডেও রচনাকালের উল্লেখ নাই—পুথির লিপিকাল ১৭৪৪ শকাব্দ—লিপিকর সর্বেশ্বর[১২]

এই বিশাল গ্রন্থের রচয়িতা গ্রন্থমধ্যে তাঁহার বিশেষ কোনও পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। নিজের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে তিনি প্রতি খণ্ডের প্রতি অধ্যায়ের পুষ্পিকায় সগৌরবে কেবল গুরুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায়, তিনি শ্রীনাথ দেবস্বামী মহামহোপাধ্যায় শ্রীলশ্রীসর্বচন্দ্র ভট্টাচার্যের শিষ্য ছিলেন। পুথির লিপিকর সর্বেশ্বর ইঁহাকে প্রবলপ্রতাপান্বিত খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থকারের লেখা হইতে বুঝা যায়, শ্রীহট্টের অন্তর্গত পলাশ পরগণা তাঁহার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এইখানেই তিনি তাঁহার গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের অন্যতম সুযোগ্য বংশধর ও গ্রন্থের পুথির একমাত্র রক্ষক শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে জানা যায় যে, হরগোবিন্দ ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত শ্রীবাড়ীর রঘুনাথ (দত্ত) রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, বাল্যকালে

৭। শাকে দ্বিবেদশৈলেন্দৌ দীক্ষাকাণ্ডং সমাপ্তকম্। লিখিতং পুস্তকমেদং রামচন্দ্রদ্বিজাতিনা।

৮। ...ত্রোদধিক্ষ্মাভৃদবনিপগ্নিগণিতে...স্বভুক্ তীক্ষ্ণ রশ্মের্বৈর...শেহি ভেবে ময় সম্যুবিপিনে শ্রীশ্রায়শাস্ত্রে পলাসে। দেশে গ্রন্থং সমাপি বুধবর...র্মকাণ্ডাভিধানং বিদ্বন্মঞ্জুং প্রশস্তাদ্বুধনতহরগোবিন্দরায়ঃ সুধীরঃ। আজ্ঞয়া হরগোবিন্দরায়স্যৈব দয়ানিধেঃ। ব্যলিখৎ শ্রীরতিকান্ততর্কাসদ্ধান্তনামকঃ ॥

৯। শাকে ত্রিবেদক্ষ্মাভৃচ্চন্দ্রমাপরিমাণকে। সমাপ্তং কর্মকাণ্ডঞ্চ শ্রীমদীশপ্রসাদ[তঃ]। লিখিতং পুস্তকমেদং রতিকান্তদ্বিজাতিনা। শ্রীলশ্রীহরগোবিন্দরায়ধীরস্য হেতুনা।

১০। শাকে বেদব্রহ্মক্ষ্মাভৃচ্চন্দ্রমাপরিমাণকে। ইষে মাসি পঞ্চমাংশে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে। সমাপ্তং বৈ জ্ঞানকাণ্ডং শ্রী[মদীশপ্রসাদতঃ]। লিখিতং পুস্তকমেদং রামচন্দ্রদ্বিজাতিনা ॥

১১। কীর্তিজ্যোতিতবিশ্বজনিঃখলক্ষ্মাপালভূপালকস্বৌজঃখবিতবৈরিদর্পহরগোবিন্দাখ্যরায়াজ্ঞয়া। শাকে বাণযুগাদ্রিচন্দ্রগণিতে বর্ষে শুচীশাংশকে। শ্রীসর্বেশ্বরভূসুরো বুধদিনে পুস্তীমিমামালিখৎ ॥

১২। শাকে বেদকৃতর্ষিচন্দ্রগণিতে মাসে মধৌ কৃষ্ণকে পক্ষে চন্দ্রদিনে লি[লে]খ নিভৃতাং পুস্তীমিমাং সাদরঃ। শ্রীসর্বেশ্বরভূসুরো হরিতিথৌ কীর্তীন্দুদীপ্তাখিল-শ্রীলশ্রীযুত ভূমিপালহরগোবিন্দরায়াজ্ঞয়া।

হরগোবিন্দ চঞ্চলপ্রকৃতি ও পাঠাভ্যাস বা অন্য কার্যে অমনোযোগী ছিলেন। একদিন অগ্রজ কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া হরগোবিন্দ গৃহত্যাগ করেন এবং দক্ষিণ-বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র চণ্ডীপুরে যাইয়া বিদ্যাচর্চায় মনোনিবেশ করেন। শিক্ষার্থী অবস্থায় হরগোবিন্দ ১১৮৯ বঙ্গাব্দে প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের একখানি নকল প্রস্তুত করেন। নকলখানি শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে। প্রথম শিক্ষার্থীর লেখা বলিয়া ইহাতে বর্ণাশুদ্ধির প্রাচুর্য দেখা যায়। কালক্রমে হরগোবিন্দ সংস্কৃত ও ফার্সীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তিনি পশ্চিমে গাজিপুর হইতে রাজমহল, যশোহর, বাখরগঞ্জ, ঢাকা ও শ্রীহট্ট, এই কয়েকটি জেলায় কালেক্টরের দেওয়ান হিসাবে কাজ করিয়াছেন। ইহাদের অনেক স্থানে তিনি ভূসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়া প্রচুর বৈভব ও প্রতিপত্তির অধিকারী হন। তবে লক্ষ্মীর কৃপা তাঁহাকে সরস্বতীর অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত করে নাই। অবসরমত তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন এবং নিজে গ্রন্থরচনায় ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় প্রদত্ত হইয়াছে। সেগুলি আলোচনা করিলে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিরক্ষক স্বর্গত সুবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হরগোবিন্দের পুথিপত্রের মধ্যে তাঁহার একখানি অভিধানরচনার পরিকল্পনা দেখিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। উহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় রক্ষিত হইয়াছে কি না, অনুসন্ধান করা দরকার। তন্ত্রশাস্ত্র ও তান্ত্রিক সাধনায় হরগোবিন্দ বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। নানা স্থানে তিনি কালীপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পলাশে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীপীঠে আজ পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তন্ত্রশাস্ত্রে হরগোবিন্দের গভীর শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের নিদর্শন তাঁহার পঞ্চমবেদসার নির্ণয় গ্রন্থ। তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতির ব্যাপক পরিচয় এই গ্রন্থে উপনিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা ছয় খণ্ড বা কাণ্ডে বিভক্ত। বিষয় অনুসারে কাণ্ডগুলির নাম —সৃষ্টিকাণ্ড, দীক্ষাকাণ্ড, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সাধনকাণ্ড এবং যোগকাণ্ড। এরূপ বিরাট্ তন্ত্রনিবন্ধগ্রন্থ আর আছে কি না জানি না। দুঃখের বিষয়, ইহার কোনও প্রচার হয় নাই। ইহার কোনও পরিচয় এ পর্যন্ত কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। ইহার কোনও পুথিও কোন প্রসিদ্ধ পুথিশালায় রক্ষিত আছে বলিয়া মনে হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নব্য জ্ঞান বিজ্ঞান যখন আমাদের দেশে সাদরে বরণ করিয়া লওয়া হয় এবং প্রাচীন বিদ্যা উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত হইতে থাকে, সেই সময় সুদূর পল্লীগ্রামে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। তাই ইহার প্রচারের তেমন সম্ভাবনাই ছিল না। অবশ্য এই অবস্থায়ও যাঁহারা সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অবশ্য স্মরণীয়। বস্তুতঃ ইঁহাদের ও ইঁহাদের কৃত কার্য্যের পরিচয় না দিলে সে সময়কার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

হরগোবিন্দ গ্রন্থমধ্যে নিজ পরিচয় প্রদানে কার্পণ্য করিলেও গ্রন্থের বিষয় নির্দেশে বা আকর-গ্রন্থের উল্লেখে কোনরূপ কৃপণতা প্রদর্শন করেন নাই। প্রতি খণ্ডের প্রারম্ভে তিনি সকল খণ্ডের বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং প্রস্তুত খণ্ডের পটল বা অধ্যায় অনুসারে আলোচ্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রথম কাণ্ডে—দিব্যাচার তন্ত্র, মন্ত্রভেদ বা মধ্যভেদতন্ত্র, বিজয়মালিনী, মন্ত্রমুক্তাবলীতরঙ্গিণী, তন্ত্রসার, চিন্তামণি, কুলামৃত, পুরশ্চরণরসোল্লাস, স্বচ্ছন্দসংগ্রহ। দ্বিতীয় কাণ্ডে—কামধেনু, অন্নদাকল্প, বিশ্বাদর্শ, সারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, ভূতভৈরব, মন্ত্রকোষ, বর্ণভৈরব আগমকল্পদ্রুম, শ্যামাকল্পলতা, পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা, গণেশবিমর্শিনী, মন্ত্রভেদতন্ত্র, নটতন্ত্র, চিদম্বরনটতন্ত্র, দীক্ষাকল্প, বৃহৎশ্রীক্রম, কালিকাকুলসর্বস্ব, কালীহৃদয়, বীরভদ্রতন্ত্র। তৃতীয় কাণ্ডে—মন্ত্রপ্রকাশ, হংসতন্ত্র, তারাক্রম, গৌরীযামল, শক্তিতন্ত্র, কালীকুলামৃত, কুলসর্বস্ব, সারসমুচ্চয়, শিবাতন্ত্র, কালিকাকুল-সর্বস্বসম্পুট, বিশ্বেশ্বরকল্পদ্রুম, উত্তরখণ্ডোড্ডীশ, জ্ঞানেশ্বরসংহিতা। চতুর্থ কাণ্ডে—বীরসর্বস্ব, নিগমতত্ত্বসার, মুক্তিতন্ত্র, জ্ঞানতন্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়াগম, দিব্যাচারতন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, তত্ত্বসারতন্ত্র। পঞ্চম কাণ্ডে—জ্ঞানসঙ্কুলী, শক্তিযামল, আচারচিন্তামণি, নিগমকল্পদ্রুম, শ্যামার্চনচন্দ্রিকা, কুলসার, কুলসর্বস্ব। ষষ্ঠ কাণ্ডে—হঠদীপিকা, মুক্তিতন্ত্র, যোগচূড়ামণিতন্ত্র, তত্ত্বসার।

ষষ্ঠ কাণ্ডে উদ্ধৃত গ্রন্থের নাম খুব কম—অনেক স্থলে আদৌ কোন নাম উদ্ধৃত হয় নাই। মনে হয়, ইহাতে গ্রন্থকারের নিজের রচনা মাঝে মাঝে স্থান পাইয়াছে। অন্যান্য কাণ্ডে বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় ও বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে বিবিধ গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হইয়াছে, গ্রন্থকারের নিজস্ব রচনা তাহাতে নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থকারের নিজের উক্তিতেই ইহার আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থারম্ভে তিনি বলিয়াছেন :—

তন্ত্রাণ্যনেকানি বিচার্য যত্নাৎ সারং সমুদ্ধৃত্য মুদে বুধানাম্।
করোত্যদঃ পঞ্চমবেদসারবিনির্ণয়ং ষড়্ভিরখণ্ডখণ্ডৈঃ ॥[১৩]

উপরের তালিকায় অপরিচিত বা অল্পপরিচিত গ্রন্থের নামই প্রধানতঃ উল্লিখিত হইয়াছে।[১৪] এগুলি সমস্তই গ্রন্থকার দেখিয়াছিলেন কি না, বলিবার উপায় নাই। তবে ইহাদের কিছু কিছু নিশ্চয়ই তাঁহার নিজ সংগ্রহে ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় প্রদত্ত তাঁহার পুথিসংগ্রহের মধ্যে তাহাদের সন্ধান মিলিতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়।

১৩। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য কাণ্ডের প্রারম্ভও দ্রষ্টব্য :—

বহুতন্ত্রং সমালোক্য সারমুদ্ধৃত্য যত্নতঃ। বিধানানি বিনিশ্চিত্য সাধকানাং হিতায় বৈ।

১৪। পরিচিত গ্রন্থের মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্র ও সারদাতিলক, শাক্তানন্দতরঙ্গিণী প্রভৃতি নিবন্ধগ্রন্থের নাম লক্ষণীয়। প্রাচীন নিবন্ধগ্রন্থে মহানির্বাণতন্ত্রের উল্লেখ দুর্লভ। অথচ আলোচ্য গ্রন্থে ইহা অনেক স্থানে উদ্ধৃত হইয়াছে। একাধিক পরিচিত অপরিচিত নিবন্ধগ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার অনেক অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু সর্বাধিক প্রসিদ্ধ তন্ত্রসারের নামমাত্র উল্লেখ করেন নাই।

গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সৃষ্টিকাণ্ড ২৪ পটলে সমাপ্ত। ইহার আলোচ্য বিষয়—চতুর্যুগনিরূপণ, আগমোৎপত্তি, তন্ত্রমাহাত্ম্য, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, মনুষ্যোৎপত্তি, জীববিভাগ, স্থূলসূক্ষ্মশরীর, জীবোৎপত্তি, সোহংজ্ঞানলক্ষণ, লিঙ্গদেহনিরূপণ, চক্রসঙ্কেত, মূলপদ্ম, সগুণ শম্ভুচক্র, নির্গুণ শম্ভুচক্র, ষট্‌চক্র, ষোড়শাধার প্রভৃতি। দ্বিতীয় খণ্ড দীক্ষাকাণ্ড ৫৪ পটলে সম্পূর্ণ। ইহাতে আছে মোক্ষোপদেশ, কর্মকাণ্ডলক্ষণ, দীক্ষালক্ষণ, গুরুশিষ্যলক্ষণ, দীক্ষানিষেধবিধি, পরব্রহ্ম-নিরূপণ, মহাবিদ্যানিরূপণ, বিদ্যোৎপত্তি, মন্ত্রবিনির্ণয়, মন্ত্রার্থনির্ণয়, মন্ত্রকোষ, মন্ত্রদোষ, দীক্ষাচক্র, দীক্ষাকাল, দীক্ষাস্থান, বাস্তুযাগ, যজ্ঞভূমি, যজ্ঞকুণ্ড, অঙ্কুরার্পণ, মন্ত্রোদ্ধার, দীক্ষাধিকারী, অধিবাস, দীক্ষাক্রম, শিষ্যাচারক্রম, বর্ষান্তে গুরুপূজাবিধান, বৈরিমন্ত্রপ্রক্রিয়া, মন্ত্রচ্ছন্নপ্রক্রিয়া। তৃতীয় খণ্ড কর্মকাণ্ডে ১৩ পটল। ইহাতে দক্ষিণকালিকার উপাসনাবিধি বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উপজীব্য বিষয় এইরূপ—মন্ত্রোদ্ধার, কর্মকাল, প্রাতঃকৃত্য, বহিঃকৃত্য, স্নানবিধি, সন্ধ্যাবিধি, পূজাবিধি, স্তববিধি, কবচ, নমস্কারবিধান, নিত্যহোম, জপ, পুরশ্চরণ, শাক্তাভিষেক। চতুর্থ খণ্ড জ্ঞানকাণ্ড ২৫ পটলে সমাপ্ত। ইহাতে কুলাচারাদির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার আলোচ্য বিষয়—জ্ঞানলক্ষণ, মুক্তিতত্ত্ব, তত্ত্বনিরূপণ, কুলতত্ত্ব, কুলসঙ্কেত, সময়াচার, বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার, বৈষ্ণবপঞ্চতত্ত্ব, সর্বাচার, পশ্বাচার, বীরাচার, দিব্যাচার, চতুর্থাশ্রমীর আচার, চীনাচার, পূজাধিকারিনির্ণয়, কুলশক্তিনিরূপণ, পাত্রাসন-স্থাপনমণ্ডলাদি, হেতুদ্রব্যাদিনিরূপণ, দ্রব্যাদিশোধন, দ্রব্যানুকল্প, বিজয়াকল্প, বেদান্ত বেদমন্ত্রে শূদ্রাধিকার, দক্ষিণাচারনিশ্চয়, গৃহস্থাচার, মিশ্রাচার। পঞ্চম খণ্ড সাধনকাণ্ডে ২২ পটলে কুলাচারের বিস্তৃত বিবিরণ দেওয়া হইয়াছে। ইহার বিভিন্ন পটলে আলোচিত বিষয় এইরূপ—কুলাচারমাহাত্ম্য, কুলধর্ম, অভিষেকবিধি, গুরুক্রম, চক্রানুষ্ঠান, যন্ত্রসংস্কার, শঙ্খমালাশোধন, কোমলাসননির্ণয়, শিবাসাধন, কুমারীপূজা, দূতীযাগ, কৌল পুরশ্চরণ, স্নান সন্ধ্যা ধ্যান, অন্তর্যজন, কুমারীপূজন, পঞ্চতত্ত্বসাধন, বহুধাসাধনক্রম, মহাগুপ্তার্চন, বীরসাধনপ্রক্রিয়া। ষষ্ঠ খণ্ড যোগকাণ্ডে ২৭ পটলে যোগের বিস্তৃত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বিভিন্ন পটলে বিবৃত বিষয়গুলি এইরূপ :—যোগমাহাত্ম্য, অষ্টাঙ্গযোগলক্ষণ, আসননিরূপণ, ভক্ষ্যাদিনিয়ম, যোগযোগীশলক্ষণ, ব্রহ্মজ্ঞান, ধ্যানতত্ত্ব, প্রাণায়ামমাহাত্ম্য, প্রাণায়ামনিরূপণ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, বায়বীশক্তিসিদ্ধি, স্থিরচিত্তলক্ষণ, ষট্‌কর্মসাধন,[১৫] পঞ্চামরা-যোগ, মূলাধারাদির অন্তর্গত চক্র, ত্রিগুণাত্মক ষট্‌চক্র, বিবিধ যোগক্রম, সপ্ত স্বর্গ, কুম্ভকাষ্টক, কেবলকুম্ভক, দশমুদ্রানির্ণয়, রাজযোগ, সমাধিক্রম, যোগের অবস্থাচতুষ্টয়, মহাপ্রলয়নিরূপণ।

উপরোদ্ধৃত বিষয়তালিকা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, দক্ষিণকালিকার উপাসনা ও কুলাচারবর্ণনাই আলোচ্য গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য—অন্যান্য দেবতার, বিশেষ করিয়া পুংদেবতার প্রসঙ্গ ইহাতে নাই বলিলেই চলে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নিবন্ধগ্রন্থের মত ইহাতে তন্ত্রের কর্মকাণ্ডের কথাই আছে—দর্শনের কথা নাই।

১৫। ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলী, কপালভাতি—এই ষট্‌কর্ম। মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আভিচারিক ষট্‌কর্মের আলোচনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্যাকরণের পুরুষ

শ্রীননীগোপাল দাশ শর্ম্মা

বাঙ্গালা ভাষার যে-কোন একখানা ব্যাকরণ খুলিলেই দেখা যায়, 'আমি, আমরা' উত্তমপুরুষ, 'তুমি, তোমরা' মধ্যমপুরুষ, আর সব সর্ব্বনাম বা সাধারণ শব্দ প্রথম পুরুষ। এই সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে কাহার ও কোথা হইতে আসিল, তাহার নির্দ্দেশ এবং এই সংজ্ঞার প্রয়োজন এই প্রবন্ধে আলোচিত হইবে, আর হইবে—বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন পূর্ব্বোক্ত তিনটি সংজ্ঞাতেই সম্পন্ন হইবে, না তাহার সংখ্যা পরিবর্দ্ধন করা উচিত।

পাণিনি ব্যাকরণের সিদ্ধান্তকৌমুদী সংস্করণে দেখা যায়, ধাতুর উত্তর যে সকল বিভক্তি যুক্ত হয়, তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিয়া অর্থাৎ তিপ্‌ তস্‌ ঝি প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া তিনি সূত্র দিলেন—"তিঙস্ত্রীণি ত্রীণি প্রথম-মধ্যমোত্তমাঃ।" বৃত্তি এইরূপ, যথা—"উভয়োঃ পদয়োস্ত্রয়স্ত্রিকাঃ ক্রমাদেতৎসংজ্ঞাঃ স্যুঃ।" পরসূত্র—"তান্যেকবচনদ্বিবচনবহুবচনান্যেকশঃ।" বৃত্তি—"লব্ধপ্রথমাদিসংজ্ঞানি তিঙস্ত্রীণি ত্রীণি বচনানি প্রত্যেকম্‌ একবচনাদিসংজ্ঞানি স্যুঃ।" সূত্রদ্বয়ের দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উত্তমাদি সংজ্ঞা বিভক্তিরই করা হইয়াছে, অস্মদাদির নয়। গরুড়পুরাণের ব্যাকরণের সংজ্ঞা-প্রকরণে দেখি—

> তিপ্‌তসন্তি প্রথমো মধ্যঃ সিপ্‌থস্‌থোত্তমপুরুষঃ।
> মিপ্‌বস্‌মঃ পরস্মৈ তু পদানাঞ্চাত্মনেপদম্‌॥

অগ্নিপুরাণে—

> পূর্ব্বং নব পরস্মৈপদং তিপ্‌তসন্তীতি প্রথমঃ পুমান্‌।
> সিপ্‌থস্‌থ মধ্যমনরো মিপ্‌বস্‌মস্‌ চোত্তমঃ পুমান্‌॥

এই প্রকার মুগ্ধবোধ, সারস্বত প্রভৃতি ব্যাকরণেও বিভক্তিরই প্রথমাদি সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইগুলি কি ভাবে ব্যবহৃত হইবে, তৎসম্বন্ধে পাণিনি সূত্র করিলেন—"যুষ্মদ্যুপপদে সমানাধিকরণে স্থানিন্যপি মধ্যমঃ।" বৃত্তি—"তিঙ্‌বাচ্যকারকবাচিনি যুষ্মদি প্রযুজ্যমানেঽপ্রযুজ্যমানে চ মধ্যমঃ স্যাৎ।" যথাক্রমে অপর সূত্রদ্বয়—"অস্মদ্যুত্তমঃ।" বৃত্তি—"তথাভূতে অস্মদ্যুত্তমঃ স্যাৎ।" "শেষে প্রথমঃ।" বৃত্তি—"মধ্যমোত্তময়োরবিষয়ে প্রথমঃ স্যাৎ।"

সূত্র কয়টির অর্থ এইপ্রকার—যুষ্মদ্‌ শব্দ উক্ত হইলে অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য-পদরূপে পরিণত হইলে (ইংরাজিতে যাহাকে Nominative case বলে), ধাতুর উত্তর মধ্যমসংজ্ঞক বিভক্তি যুক্ত হয়। সেই প্রকার অস্মদ্‌ শব্দ উক্ত হইলে উত্তমসংজ্ঞক, এবং এই দুইটি ভিন্ন শব্দ উক্ত হইলে প্রথমসংজ্ঞক বিভক্তির প্রয়োগ হইবে। শব্দ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ায় যুষ্মদাদির অর্থ প্রকাশ করে, এরূপ কোনও শব্দের সহিত মধ্যম বা উত্তম বিভাগীয় বিভক্তির প্রয়োগ হইবে না। অস্মদ্‌ শব্দের সমানার্থক কোন শব্দ দেখা যায় না। তবে যুষ্মদ্‌ শব্দের সমানার্থক

"ভবৎ" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ভবৎশব্দ উক্ত হইলে, তাহার ক্রিয়াপদে প্রথম বিভাগীয় বিভক্তি যুক্ত হয়। প্রত্যেক ব্যাকরণেই এই মত উক্ত হইয়াছে।

সংস্কৃত ভাষায় উদ্দেশ্য-পদের বচন অনুসারে ক্রিয়াপদেও তিন প্রকার বিভক্তি হইয়া থাকে। গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষাতেও উদ্দেশ্য-পদের প্রয়োগ অনুসারে বচনগত পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াপদ রচিত হয়। এই সকল ভাষায় সমগ্র ক্রিয়াপদ তিন প্রকারেই সম্পূর্ণতা লাভ করে। বাঙ্গালা ভাষায় উদ্দেশ্য-পদের বচন অনুসারে একাধিক ক্রিয়াপদের ব্যবহার নাই, যেমন আমি পড়ি, আমরা পড়ি, তুমি পড়, তোমরা পড়; বালকটি পড়ে, বালকেরা পড়ে। দুই প্রকার বচনে সর্ব্বত্র একই রকম ক্রিয়াপদ।

সংস্কৃত ভাষায় বিভক্তির কালগত ভাগ দশ প্রকার। তাহাদের নাম লট্ লোট্ লঙ্ প্রভৃতি। উহাদের প্রত্যেক ভাগ উক্তপদ অর্থাৎ উদ্দেশ্য-পদ অনুসারে প্রথমাদি তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ বচন অনুসারে তিনটি ভাগে বিভক্ত। যত প্রকার ক্রিয়াপদ রচিত হউক না কেন, ইহার সীমা অতিক্রম করে না।

বাঙ্গালায় বিভক্তির কালগত ভাগ দশ প্রকার, অবশ্য সংস্কৃতের অনুকরণে নয়। যথা—বর্ত্তমানে অভ্যস্ত, নিরবচ্ছিন্ন ও অনুজ্ঞাত্মক, এই তিন প্রকার। অতীতে অভ্যস্ত, নিরবচ্ছিন্ন, ব্যবহিত, অনব্যবহিত ও অব্যবহিত, এই পাঁচ প্রকার এবং ভবিষ্যতে সাধারণ ও অনুজ্ঞাত্মক, এই দুই প্রকার। এই সকল বিভাগের প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই বাঙ্গালা ভাষায় উদ্দেশ্য-পদ অনুসারে পাঁচপ্রকার বিভক্তি হইয়া থাকে; অন্যান্য ভাষার ন্যায় মাত্র তিন প্রকার নয়। যেমন বর্ত্তমান অভ্যস্তের উত্তম "ই," মধ্যম "অ," প্রথম "এ"। এখনও দুইটি বাকী—আপনি, তিনি, ইনি, উনি ইত্যাদি। সর্ব্বনাম ও সম্মানার্থক বিশেষণবিশিষ্ট, কিম্বা সম্মানার্থক শব্দযুক্ত, অথবা পিতা, মাতা দাদা, দিদি প্রভৃতি গৌরবময় শব্দ উদ্দেশ্যপদ হইলে ধাতুর উত্তর "এন," এবং "তুই" উদ্দেশ্যপদ হইলে "ইস্," এই দুইটি বিভক্তির প্রয়োজন। কালগত প্রত্যেক বিভাগেই ইহারা পৃথক্ পৃথক্ রূপ গ্রহণ করে। সুতরাং এই দুই প্রকার বিভক্তিকে পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করার প্রবৃত্তি বুদ্ধির অগম্য। এই দুই প্রকারের বিভক্তি দ্বিতীয় ও তৃতীয় নামে পৃথক্ হওয়াই সমীচীন মনে করি।

বাঙ্গালা ব্যাকরণে দেখা যায়, মধ্যম পুরুষের তিনটি ভাগ—তুমি, আপনি, তুই এবং প্রথম পুরুষের দুইটি ভাগ। এক ভাগে যাবতীয় সাধারণ শব্দ ও অপর ভাগে 'তিনি' প্রভৃতি সম্মানার্থক শব্দ। শব্দের উপরেই উত্তমাদির আরোপ ইহার অন্যতম কারণ। এই প্রকার কারণ কোথা হইতে আসিল? এ দেশের পাণিনি হইতে আরম্ভ করিয়া কোনও বৈয়াকরণই নামবাচক বা সর্ব্বনামবাচক শব্দের উপর উত্তমাদি সংজ্ঞা স্থাপন করেন নাই, করিয়াছেন বিভক্তির উপর এবং তাহাদের উদ্দেশ্যপদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ইহার ফলে 'ভবৎ' শব্দের অর্থ 'আপনি' হইলেও তাহার ক্রিয়াপদে প্রথম বিভাগের বিভক্তি প্রযুক্ত হইবে, এইরূপ নিয়মের প্রয়োজন হয় নাই, স্বতই তাহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইংরাজী ভাষায় ব্যাকরণে I, we first Person, thou, you second Person, তদ্‌ভিন্ন যাবতীয় শব্দ third

Person, এই লেখা দেখা যায় (যদিও ইংরাজী ব্যাকরণে Person সংজ্ঞাটির কোনও প্রয়োজন নাই।) ইংরাজী ভাষায় বিদেশীগণ কর্তৃক প্রথম বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ রচিত ও মুদ্রিত হয়; ইহাই কি এই প্রকার সংজ্ঞা আরোপের কারণ নয়? তাঁহারা যদি একদিন এই প্রকার ভুল করিয়া থাকেন, আজ যে সময় বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ব্যাকরণ রচিত হইতেছে, সে সময় তাহার সংশোধন হওয়া কি উচিত নয়? সুধীগণ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিবেন। এই সংজ্ঞানির্দ্দেশের কাজে আরও একটি দোষ ঘটিয়াছে। 'আপনি'র জন্ম যে সকল বিভক্তির প্রয়োজন হইয়াছে, ঠিক সেই বিভক্তিগুলিই 'তিনি' প্রভৃতির জন্ম পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহার ফলে একই বিভক্তির দুই স্থানে উল্লেখ করিতে হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত ব্যাকরণ যে পাণিনীয় ব্যাকরণ, এ কথা বোধ হয় আজ কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সুতরাং তাঁহার - কেবল তাঁহার নহে, সকল সংস্কৃত প্রাচীন ব্যাকরণের প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন পথে চলার কালে বাঙ্গালা ভাষার বৈয়াকরণগণ কোন্ সহজ পথ আবিষ্কার করিয়াছেন? বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণে এই উৎকট পুরুষসংজ্ঞার কোন সমীচীন যুক্তি পাওয়া যায় না।

প্রত্যেক ভাষার ব্যাকরণ স্ব স্ব ভাষায় ব্যবহৃত বাক্যরচনার উপর নির্ভর করে। কতক অংশে যে-কোন ভাষার ব্যাকরণের প্রণালীর সহিত অপর ভাষার ব্যাকরণের একবাক্যতা থাকিলেও প্রত্যেক ভাষাতেই অনেক অংশে বৈশিষ্ট্য থাকিবেই। সুতরাং অধিকাংশ ভাষায় উত্তমাদি তিনটি বিভাগ স্বীকার করিলেও বাঙ্গালা ভাষাতেও তিনটি বিভাগ স্বীকার করিতে হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। পদ রচনায় যখন পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ দেখা যাইতেছে, তখন একেবারেই পাঁচ প্রকার বিভক্তির জন্ম উত্তম, মধ্যম, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিলে কোনই ক্ষতি নাই, বরং প্রাচীন ব্যাকরণসম্মত বৈজ্ঞানিক প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অনুসৃত হইবে।

অনুকরণপ্রিয়তার ফলে আজ পর্য্যন্ত নবীন ভাবাপন্ন যতগুলি বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাহির হইয়াছে, ইহাদের সবগুলিই একভাবে রচিত। কতক অংশ ইংরাজীর অনুকরণ, কতক অংশে সংস্কৃতের অনুকরণ। বাঙ্গালার যে কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে বা আছে, সে বিষয়ে ব্যাকরণ-রচয়িতাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহু বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয়ের আলোচনা এখানে করা হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক, ধাতুসূত্রবিহিত বিভক্তিগুলি কি ভাবে কোন্ সংজ্ঞায় সাজাইলে সহজ ভাবে বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে পারা যাইবে। সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত দুই চারিটি ধাতুরূপ থাকিতে পারে, তাহাদের জন্ম পৃথক্ ভাবে বিভক্তিযুক্ত রূপ রচনা করিলেই চলিবে। এক একটি মাত্র রূপের বৈশিষ্ট্যে কোন সূত্র বা নিয়মের প্রয়োজন হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণ সেই সেই স্থলে নিপাতন স্বীকার করিয়াছেন।

ধাতুত্তর বিহিত বিভক্তি

বর্ত্তমান

	উত্তম	মধ্যম	প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
অভ্যস্ত	ই	অ	এ	এন্	ইস্
নিরবচ্ছিন্ন	ইতেছি	ইতেছ	ইতেছে	ইতে ছন্	ইতেছিস্
অনুজ্ঞাত্মক	ই	অ	উক্	উন্	ধাতুস্বরূপ

অতীত

অভ্যস্ত	ইতাম্	ইতে	ইত	ইতেন্	ইতিস্
নিরবচ্ছিন্ন	ইতেছিলাম্	ইতেছিলে	ইতেছিল	ইতেছিলেন্	ইতেছিলি
ব্যবহিত	ইয়াছিলাম্	ইয়াছিলে	ইয়াছিল	ইয়াছিলেন্	ইয়াছিলি
অনব্যবহিত	ইয়াছি	ইয়াছ	ইয়াছে	ইয়াছেন্	ইয়াছিস্
অব্যবহিত	ইলাম্	ইলে	ইল	ইলেন্	ইলি

ভবিষ্যৎ

সাধারণ	ইব	ইবে	ইবে	ইবেন	ইবি
অনুজ্ঞাত্মক	×	ইও	×	ইয়েন (আপনি সহ)	ইস্

১। স্বরবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানের 'অ' 'ও' হয় এবং তৃতীয় বিভাগের ইস্ ইতিস্ ও ইবি-র ইকার লুপ্ত হয়। প্রথম বিভাগের 'এ' স্থানে 'য়' এবং দ্বিতীয় বিভাগের 'এন'এর 'এ' লুপ্ত হয়। পরের নিয়মগুলি অনুসরণ করিলে প্রত্যেক ধাতুর কথ্য ভাষায় রূপ রচনা করা থাকিবে।

২। বর্ত্তমান ও অতীতের নিরবচ্ছিন্ন বিভক্তির 'ইতে' অংশ বাদ, যথা—দেখিতেছি, দেখছি, দেখছিলাম। পড়িতেছি, পড়ছি, পড়ছিলাম।

৩। স্বরবর্ণান্ত ধাতুর উত্তর উক্ত বিভক্তি দুই প্রকারের ছএর পূর্ব্বে চ আগম হয়। যথা—খাইতেছি, খাচ্ছি, হচ্ছি, শুচ্ছি, দেখাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি।

৪। অতীত অভ্যস্ত ও অব্যবহিত এবং ভবিষ্যৎ সাধারণ, এই তিন প্রকার বিভক্তির 'ই' বাদ, যথা—পড়তাম, শুনতাম, দেখলাম, ঘুমালাম, পড়ালাম, শুলাম, হলাম। দেখব, শুনব, যাব, খাব, দেখাব, শুনাব, শিখাব, খাওয়াব।

৫। আকারান্ত একাক্ষর ধাতুর অতীত অভ্যস্ত ও অব্যবহিত বিভক্তির 'ই'কার বাদ দেওয়ার পর ধাতুর আকার একারে পরিণত হয়। যথা—খেতাম, যেতাম, খেলাম, পেলাম, গেলাম।

৬। অতীত ব্যবহিত ও অনব্যবহিতের 'ইয়া' স্থলে 'এ' হয়। যথা—পড়িয়াছিলাম, পড়েছিলাম, দেখেছিলাম। পড়েছি, শুনেছি।

৭। আকারান্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'এয়ে' হয় এবং ধাতুর আকার লুপ্ত হয়। যথা—খেয়েছিলাম, পেয়েছিলাম, খেয়েছি, পেয়েছি, গেয়েছি।

৮। আকারান্ত ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণান্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'য়ে' হয়। যথা,—শুয়েছিলাম, হয়েছিলাম, নিয়েছিলাম। শুয়েছি, হয়েছি, নিয়েছি।

৯। আকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণান্ত একাক্ষর ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'এ' হয় এবং ধাতুর আকার একারে পরিণত হয়। যথা—জানিয়াছিলাম = জেনেছিলাম, খেটেছিলাম, পেতে-ছিলাম। জেনেছি, থেকেছি, খেটেছি, পেতেছি, কেচেছি, রেখেছি।

১০। নিয়োগার্থ প্রত্যয়যুক্ত আকারান্ত ধাতু এবং একাধিক স্বরবিশিষ্ট আকারান্ত ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'ইয়ে' হয় এবং ধাতুর আকার লোপ পায়। যথা—দেখা = দেখাইয়া-ছিলাম = দেখিয়েছিলাম, শুনিয়েছিলাম, রাখিয়েছিলাম, ঘুমিয়েছিলাম, বেরিয়েছিলাম। দেখিয়েছি, শুনিয়েছি, ঘুমিয়েছি, বেড়িয়েছি।

১১। আকারান্ত ধাতুর উত্তর নিয়োগার্থ 'ওয়া' প্রত্যয়যুক্ত ধাতুর উত্তর 'ইয়া' স্থলে 'ইয়ে' হয় এবং 'ওয়া' অংশ লোপ পায়। যথা—খা + ওয়া = খাওয়া, খাওয়াইয়াছিলাম, খাইয়েছিলাম, গাইয়েছিলাম, খাইয়েছি, পাইয়েছি।

১২। ভবিষ্যৎ সাধারণের 'ই' লোপ পায়। যথা—দেখব, শুনব, দেখবেন, দেখবি। যাব, খাব, শুব, হব। শোব?

১৩। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞাত্মক 'ঐও' ও 'ইয়েন'-এর ইকার লোপ পায়। অবশিষ্ট 'ও' ধাতুর ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত না হইয়া পৃথক্ ভাবে 'ও' বা 'য়ো'রূপেও উচ্চারিত হয়। যথা—দেখ্য়ো, দেখ্ ও, শুন্য়ো, শুনও। দেখয়েন।

১৪। আকারান্ত একাক্ষর ধাতুর আকার একারে পরিণত হয়। যথা—খেও, খেয়ো, যেও, যেয়ো, খেয়েন, যেয়েন। গেয়েন।

১৫। আকারাদি ব্যঞ্জনবর্ণান্ত একাক্ষর ধাতুর আকার স্থানে একার হয়। যথা—থাকিও = থেকো, খেটো, কেট, পেতো। থেক্য়েন্, খেট্য়েন্। অথবা থেকেন, খেটেন, কেটেন।

এই প্রবন্ধে ক্রিয়াপদ কি ভাবে রচিত হয় এবং তাহার কি রূপ হয়, ইহাই আলোচিত হইল। কালের কি প্রকার অভিব্যক্তির জন্য কোন্ সংজ্ঞক বিভক্তি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার আলোচনা এখানে করা হয় নাই। কেবল মাত্র অভ্যস্তাদি সংজ্ঞার দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের

অষ্টপঞ্চাশত্তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৮শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ৫৯ বর্ষে পদার্পণ করিল। নিম্নে পরিষদের ৫৮শ বর্ষের কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে পর্য্যালোচিত হইতেছে।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছেন।—রাজা শ্রীনরসিংহ মল্লদেব বাহাদুর।

সদস্য—১৩৫৮ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এইরূপ :—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ২। শ্রীযদুনাথ সরকার, ৩। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় ও ৪। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডক্টর শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডক্টর শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজনীকান্ত দাস, ৮-৯। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তদীয় সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বীণাপাণি দেবী, ১০। শ্রীসতীশচন্দ্র বসু, ১১। শ্রীহরিহর শেঠ, ১২। ডাঃ শ্রীমেঘনাদ সাহা, ১৩। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১৪। শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়, ১৫। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৬। ডক্টর শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৭। শ্রীহিরণকুমার বসু, ১৮। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৯। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ২০। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২১। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহ রায় ও ২২। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে ৫ জন। **সহায়ক-সদস্য**—বর্ষশেষে ১০ জন।

সাধারণ-সদস্য—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী সদস্যের সংখ্যা ৬৩৫ জন।

পরলোকগত সাহিত্যসেবিগণ—কবি কাইকোবাদ, অনিলচন্দ্র রায়, ললিতমোহন গুপ্ত।

বিশিষ্ট সদস্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সাধারণসদস্য মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

অধিবেশন—আলোচ্য বর্ষে এই কয়টি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (ক) সপ্তপঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—১৫ই ভাদ্র ১৩৫৮; (খ) সারকুলার রোডস্থ সমাধিক্ষেত্রে কবিবর মধুসূদন দত্তের স্মৃতিপূজা—১৬ই আষাঢ় ১৩৫৯; (গ) প্রথম মাসিক অধিবেশন—১২ই আশ্বিন ১৩৫৮; দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৯এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮; তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২০এ পৌষ ১৩৫৮; চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—১৯এ মাঘ ১৩৫৮; পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—২৪এ ফাল্গুন ১৩৫৮; ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন—২৩এ চৈত্র ১৩৫৮; সপ্তম মাসিক অধিবেশন—২৭এ বৈশাখ ১৩৫৯; অষ্টম মাসিক অধিবেশন—১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ ও নবম মাসিক অধিবেশন—২১এ আষাঢ় ১৩৫৯; (ঘ) বিশেষ অধিবেশন: আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ

ঠাকুরের স্মৃতিপূজা—২রা পৌষ ১৩৫৮ ও ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীশচন্দ্র নন্দীর জন্য শোক-সভা—২৩এ চৈত্র ১৩৫৮।

কার্য্যালয়ঃ সভাপতি—মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী। গত ১০।১১।৫৮ তারিখে মহারাজার মৃত্যুর পর অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। **সহকারী সভাপতি**—শ্রীযদুনাথ সরকার; শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত; শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ; রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়; শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীসজনীকান্ত দাস। সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়ায় শ্রীযুক্ত দাসের শূন্য পদে শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। **সম্পাদক**—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। **সহকারী সম্পাদক**—শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; শ্রীত্রিদিবনাথ রায়; শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও শ্রীপাঁচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। **পত্রিকাধ্যক্ষ**—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য; **পুথিশালাধ্যক্ষ**—শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য; **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীগণপতি সরকার; **গ্রন্থাধ্যক্ষ**—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও **চিত্রশালাধ্যক্ষ**—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি—(ক) সদস্য-পক্ষে: ১। শ্রীঅমল হোম, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, ৩। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ৫। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৬। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৮। শ্রীনীহাররঞ্জন রায়, ৯। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১০। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১১। শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য, ১২। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৩। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৪। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৫। শ্রীবিভাস রায় চৌধুরী, ১৬। শ্রীলীলামোহন সিংহরায়, ১৭। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ১৮। শ্রীসমীরেন্দ্রনাথ সিংহরায়, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়, ২০। শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ ভদ্র, (খ) শাখা-পরিষৎ পক্ষে: ২১। শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমনীষিনাথ বসু ও ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ।

৩৩ সংখ্যক নিয়মানুযায়ী শ্রীঅমল হোম, শ্রীনীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীলীলামোহন সিংহ রায়ের পদ শূন্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় এই স্থানে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীঅতুল সেন ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার নির্ব্বাচিত হন এবং শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় অন্যতম সহকারী সভাপতির পদে নির্ব্বাচিত হইলে এই শূন্য স্থানে শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র নির্ব্বাচিত হন।

নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক ও পুরস্কার-সমিতিতে পরিষদের পক্ষে যে যে সদস্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহারা—(ক) সরোজিনী বসু স্মৃতি-পদক: শ্রীসজনীকান্ত দাস ও (খ) লীলা-বক্তৃতা: শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। দূর বার্ত্তা আদান প্রদানে বাঙ্গালা ভাষা ও লিপির মাধ্যমে কার্য্য করিবার জন্য ভারতের ডাক ও তার বিভাগের অধিকর্ত্তাকে অনুরোধ করা হয়।

৩। মনোবিদ্যা ও দর্শনের পরিভাষা সঙ্কলনের জন্য ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুকে 'জগদীশচন্দ্র বসু-স্মৃতি তহবিল' হইতে ছয় শত টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে।

৪। স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকগণের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারে অধিকতর উৎসাহ দানের জন্য এক শত টাকার একটি পুরস্কার 'ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিল' হইতে দেওয়া হইয়াছে।

৫। পরিষদের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা অনুরূপ কোন তহবিল সৃষ্টি কল্পে নিয়মাবলী প্রণয়ন করা হইয়াছে।

৬। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের পরিচালক সমিতিতে শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ অন্যতম প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

৭। পরিষদ্ ও রমেশভবনের ট্রাষ্টী নির্ব্বাচন ব্যাপারে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের উপর যাবতীয় ভার দেওয়া হইয়াছে।

৮। 'পূজাপার্ব্বণ' রচনার জন্য আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়কে 'রামপ্রাণ গুপ্ত স্মৃতি পুরস্কার' (৫০৲) দেওয়া হইয়াছে।

৯। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে Indian Historical Records Commission-এর পরিষৎপক্ষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করা হয়।

১০। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ৫৯ বর্ষের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির ২০ জনের অধিক সভ্যপদপ্রার্থীর নাম না আসায় নির্ব্বাচনের প্রয়োজন হয় নাই।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষেও সপ্তপঞ্চাশত্তম ভাগ পত্রিকা দুইটি যুগ্ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুথিশালা—বর্ষশেষে মোট পুথির সংখ্যা ৫৯৩২। এতদ্ব্যতীত গত বৎসরে প্রাপ্ত নটবর দত্তের গ্রন্থসংগ্রহের পুথিগুলি বাছাই করিয়া ১৫ খানি বাংলা ও ৯ খানি সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়াছে।

বহু অনুসন্ধিৎসু প্রাচীন সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য পুথিশালা ব্যবহার করিয়াছেন।

রমেশ-ভবন—ইহার সম্পূর্ণ দ্বিতলটি রেশনিং আপিসরূপে এবং নিম্নতলের দক্ষিণ দিকস্থ বারান্দা সাহিত্য-পরিষৎ পোষ্ট আপিসরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। নিম্নতলের হল-ঘরটিতে চিত্রশালার দ্রব্যাদি যথাসম্ভব সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছে।

পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের বদান্যতা—"Journals" প্রকাশ বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য বার্ষিক সাহায্য ১২০০৲ টাকাও পাওয়া গিয়াছে।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ৪৭৩ খানি পুস্তক ও পত্রিকা (ক্রীত ১৪৮ ও উপহারপ্রাপ্ত ৩২৫) সংযোজিত হইয়াছে।

পরিষদ্-গ্রন্থাগারের পুস্তক-পত্রিকা সঙ্কলনের কার্য্য অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আশা করা যায়, পশ্চিম-বঙ্গ-সরকারের বদান্যতায় এই কার্য্য শীঘ্র সুসম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

আলোচ্য বর্ষেও বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠককে পরিষদ্-গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িক-পত্র আলোচনা করিবার সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

গ্রন্থপ্রকাশ—সাধারণ তহবিলের অর্থে (ক) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্কলিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ৮৪ হইতে ৯০ সংখ্যক পুস্তকে ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র বটব্যাল বিদ্যালঙ্কার, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শিশিরকুমার ঘোষ, অধরলাল সেন, ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ক্যাপ্টেন জেম্‌স ষ্টিওয়ার্ট, ফেলিক্স কেরী, চতুষ্পাঠীর যুগে বিদুষী বঙ্গনারী : হটী বিদ্যালঙ্কার, হটু বিদ্যালঙ্কার, দ্রবময়ী; কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার, দীনেশচন্দ্র সেন, সখারাম গণেশ দেউস্করের জীবনী (খ) 'বাংলা সাময়িক পত্র' দ্বিতীয় খণ্ড; (গ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' (ঘ) রাজনারায়ণ বসুর 'সে কাল আর এ কাল,' (ঙ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঝাড়গ্রাম গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে (ক) মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র চতুর্থ সংস্করণ ও লালগোলা গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে (ক) শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য-সঙ্কলিত 'বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান; বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চ্চা' প্রকাশিত হইয়াছে। বিনয়কুমার সরকার গ্রন্থ-প্রকাশ তহবিলের অর্থে শ্রীসুধাকান্ত দে অনূদিত 'রিকার্ডোর ধনবিজ্ঞানে'র মুদ্রণ এখনও শেষ হয় নাই।

পরিষৎ-প্রকাশিত সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার একটি সুলভ সংস্করণ পরিবেশনের ভার কমলা বুক ডিপোর উপর দেওয়া হইয়াছে।

কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠান—পূর্ব্ববৎ এবারও কলিকাতা-পৌর-প্রতিষ্ঠান ১৯৪৯-৫০ ও ১৯৫০-৫১ এই দুই বৎসরের জন্য পরিষদ্-মন্দিরের ট্যাক্স রেহাই দিয়াছেন। পরিষৎ এ জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯৪৭-৪৮ বর্ষের গ্রন্থাগারের সাহায্য প্রাপ্তির পর আর কোন সাহায্য এ যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ১৯৫১-৫২ বর্ষে ট্যাক্স মকুবের জন্য পশ্চিমবঙ্গ-সরকারকে এই প্রতিষ্ঠানকে জনহিতকর দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করিবার জন্য পত্র দেওয়া হইয়াছে।

দুঃস্থ-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে চারি জন সাহিত্যিকের বিধবা পত্নী ও একজন মহিলা সাহিত্যিককে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হয়।

বঙ্কিম-ভবন—পরিষদের এই সম্পত্তি এ যাবৎ নৈহাটী শাখা-পরিষদের তত্ত্বাবধানে ছিল। উপযুক্ত রক্ষণ ও সংস্কারের অভাবে এই ভবন ক্রমশঃ জীর্ণ হওয়ায়, পরিষদের সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস ও নৈহাটী শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্নের অক্লান্ত চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ইহাকে Ancient Monument Preservation Act অনুযায়ী গ্রহণ করিয়াছেন। গত ২৩।৩।৫৯ তারিখে পরিষদের সভাপতি শ্রীসজনীকা

দাস নৈহাটী শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে এই ভবন পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের তদানীন্তন মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহের নিকট অর্পণ করেন। এই উৎসব প্রধানত শ্রীঅতুল্য-চরণ দে পুরাণরত্নের উৎসাহে সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শাখা-পরিষৎ—আলোচ্য বর্ষে শিলিগুড়িতে একটি শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক শ্রীকালীব্রহ্ম মুখোপাধ্যায়।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা—মহিলা সাহিত্যিক লীলা দেবীর একটি তৈল-চিত্র গত বার্ষিক অধিবেশনে (১৫।৫।৫৮) প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল—এই তহবিলে শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক বারে মোট ৩৪৩৮০ ও জনৈক সভ্য ।০ দান করিয়াছেন।

নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন :—৩৬ (ক) পরিষদের বেতন-ভোগী কর্ম্মচারিগণের জন্য প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বা অনুরূপ কোন তহবিল সৃষ্টিকল্পে কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি ব্যবস্থাদি করিতে পারিবেন।

সম্পাদকের নিবেদন :—

আমরা কয়েক বৎসর হইতেই বার্ষিক অধিবেশনে নিবেদন করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছি যে, পরিষৎ নিজস্ব স্থায়ী অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর এই দুর্দ্দিনেও দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। সদস্যসংখ্যা আশানুরূপ হয় নাই, বাহিরের এককালীন দানও নগণ্য। কেবলমাত্র পরিষদের গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ সুপরিচালিত হওয়াতেই আমরা বিলুপ্তিবিপদের সম্মুখীন হই নাই। সদস্যদের সহযোগিতায় ও বদান্যতায় মাত্র যদি পরিষৎ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইত, তাহা হইলে আমরা সত্যই আনন্দিত হইতাম, আমরা সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই সদস্যবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছি এবং নূতন নূতন কর্ম্মীদের ব্যাকুলভাবে আহ্বান করিতেছি। বর্ত্তমানে সকলের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। পরিষৎ-মন্দির জীর্ণ হইয়াছে, ইহার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। যদি সহৃদয় পশ্চিমবঙ্গ-সরকার অচিরাৎ এই দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, দেশবাসীকে এই ভার লইতে হইবে। নতুবা ইহার বিলুপ্তির আশঙ্কা আছে।

নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, বর্ত্তমান বর্ষে আমরা আমাদের সভাপতি মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীকে হারাইয়াছি। তাঁহাদের বংশগত বদান্যতায় পরিষৎ বহু ভাবে উপকৃত, মহারাজা শ্রীশচন্দ্রও আপৎকালে পরিষদ্‌কে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার অকালমৃত্যু আমাদের পক্ষে শুধু মর্ম্মস্পর্শী নয়, ক্ষতিকর হইয়াছে। পরিষদের ইতিহাসে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে।

পরিশেষে আমি সদস্যদের এবং আমার সহকর্ম্মীদের উদার সাহায্য ও নিরলস সহযোগিতার জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

২৯এ ভাদ্র ১৩৫৯

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদক, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

ঊনষষ্টিতম ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

প্রবন্ধ-সূচী

(১৩৫৯ ভাগ)

৫৭ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা
শনিরঞ্জন প্রেস হইতে শ্রীরঞ্জনকুমার দাস কর্তৃক মুদ্রিত